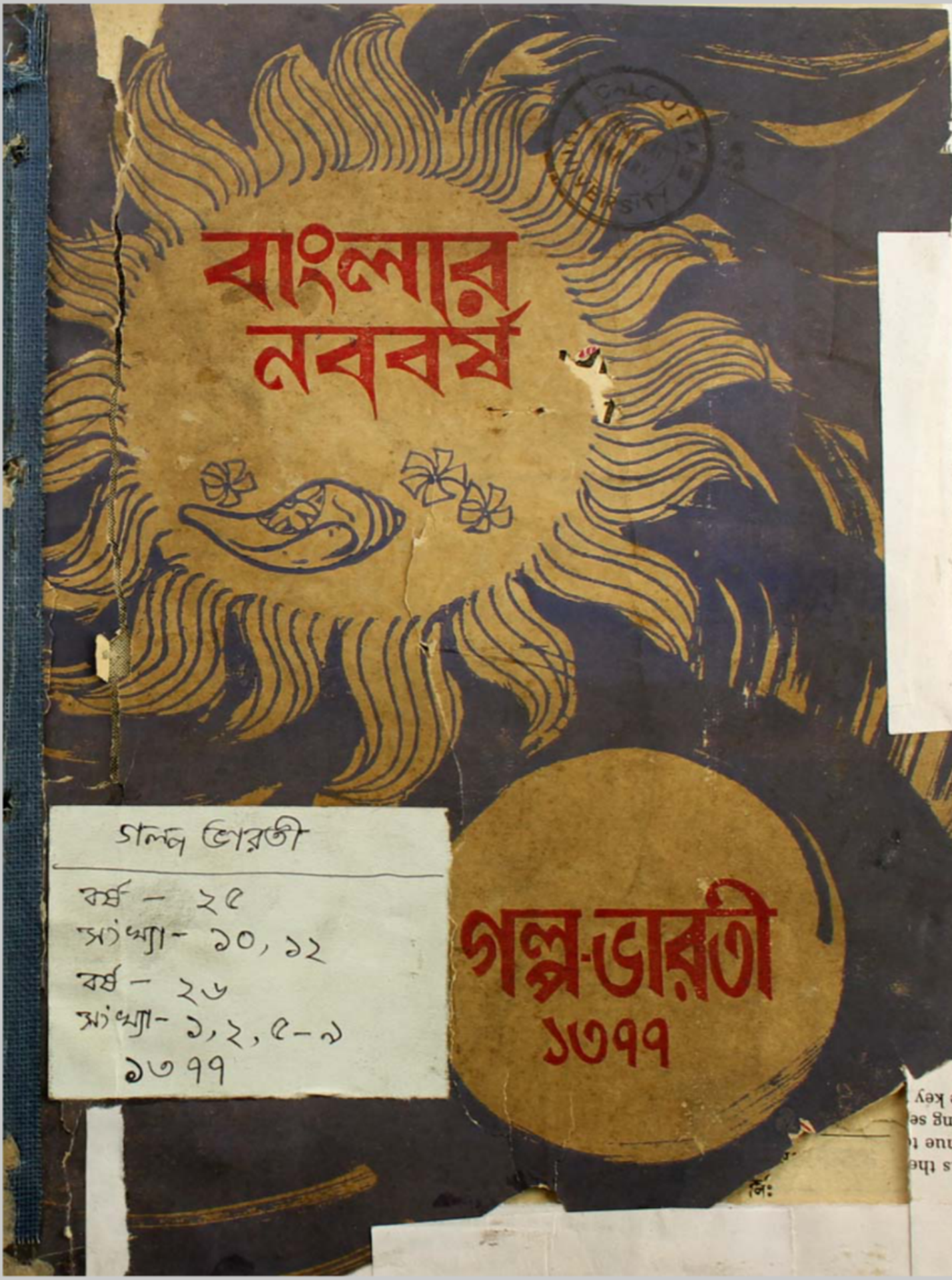

গল্প ভারতী

বর্ষ – ২৫
সংখ্যা – ১০, ১২
বর্ষ – ২৬
সংখ্যা – ১, ২, ৫–৯
১৩৭৭

দিনের শেষে আপনি যখন কাজ করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন

এক গ্লাস টাটকা লিলি বার্লি খেলে
অনেক আরাম ও আনন্দ পাবেন

লিলি ব্র্যান্ড বার্লি
বলে চাইবেন

আধুনিক
বিজ্ঞানসম্মত
প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

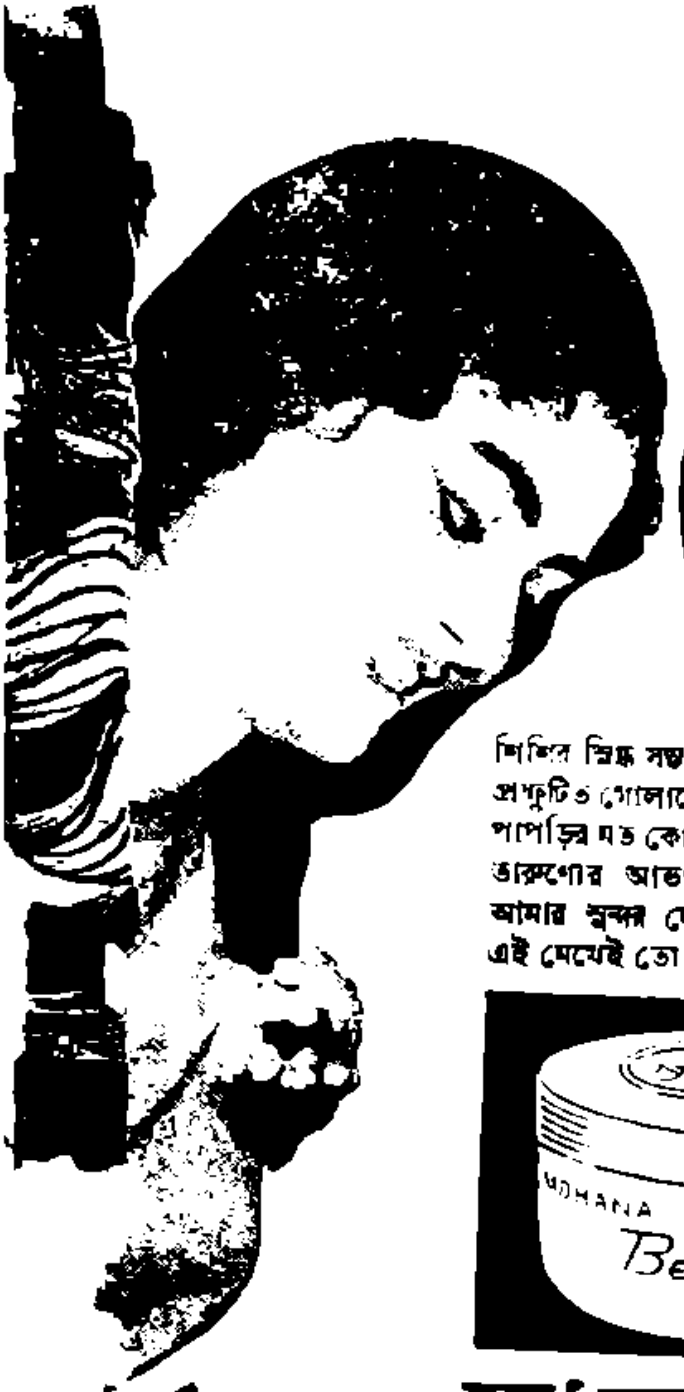

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেয়েই তো।

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

লক্ষাধিক প্রচারিত
নির্ভীক, নিরপেক্ষ,
স্বাধীন, সংবাদপত্র

—

যুগান্তর

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের
স্বচ্ছ দর্পণ।

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

বৈশাখ ১৩৭৭, APRIL 1970

৪৩২-৪৩৩ বর্ষ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহ: সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
৫১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও বসুধা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অস্বাস্থ্যকর মাড়ীই
দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধের কারণ

মাড়ীর সুস্থতার জন্য
নিমের উপকারিতা
হাজার হাজার বছরের
পরীক্ষিত

নিম টুথ পেস্ট-এ
নিমের সমস্ত গুণই
রয়েছে

ক্যালকাটা কেমিক্যালস-এর তৈরী

CNF-15-6981

গরমে চলুন হালকা পায়ে

বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি। পরলেই ভালো লেগে যাবে চমৎকার নমনীয় আরাম। সুঠাম তলি চলায় ছন্দ হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চপ্পলের যেন মেলা ব'সে গেছে—এখানে তার মাত্র কয়েকটি নকশাই দেখছেন। আসুন না, একবার প'রে দেখুন।

দাম ২.৫০
সাইজ ৪–১০

দাম ৬.৮০
সাইজ ১–৭

দাম ৮.১৫
সাইজ ২–৩

দাম ১৪.৫০
সাইজ ২–৭

দাম ১৮.৯৫
সাইজ ৪–১০

Bata

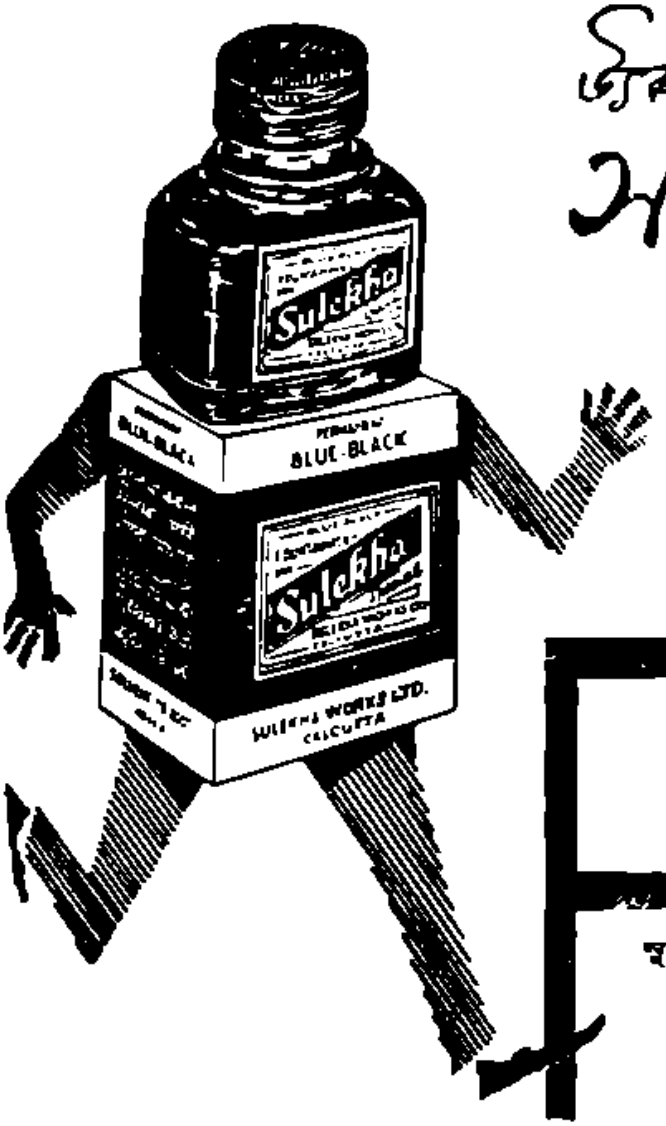

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে
৩০, ৬০, ১২০, ৩০০ ও ১২০০ এম-এল. শিশিতে
পাওয়া যায়।

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষতায়
সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশে-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে :
'অ্যাডমাল' পেস্ট এবং গাম,
'লিব্রারিটি' সিলিং ওয়াক্স,
'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৫২
ভারত।

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

জেইন • জেনাসীস • জেমী • লাভলি • পাইওনীয়ার গ্লব • নাইট আই • সিলভার আই • 'নাইটেক্স' • সিক্সটন • ডলা বাল্টিক • ইস্টারলক • ইজি-টেক্স • 'পাইওটেক্স' ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রেডএর পাওয়া যায়।

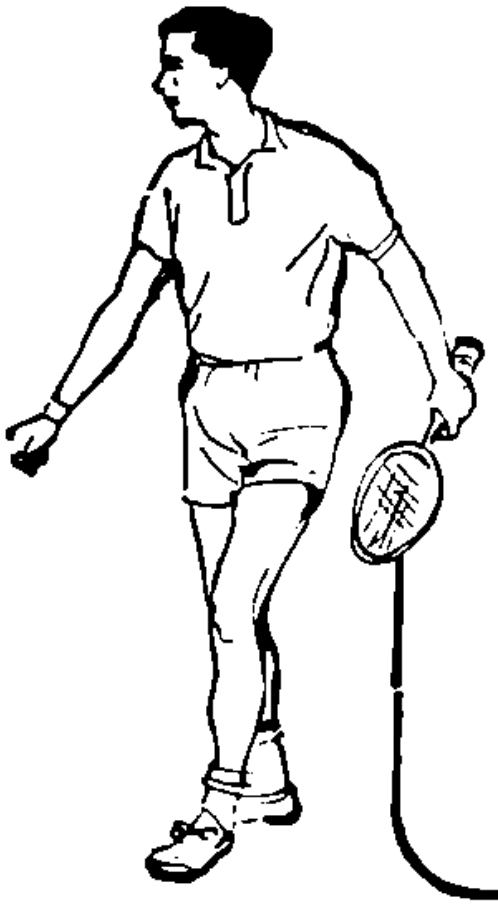

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেবিস সার্ট • চেন সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন: ৫৮-২১৮১

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এক নতুন যুগ-এক নতুন প্রতীক

আট বছর আগে এদেশে তামাকশিল্পের প্রবর্তক আই-টি-সি। আই-টি-সির ইতিহাসই তামাকশিল্পের ইতিহাস।

ভার্জিনিয়া তামাকপাতার চাষআবাদ করা এবং রপ্তানিযোগ্য একটি প্রধান ফসল হিসেবে তাকে তুলে ধরা, তামাকজাত উৎকৃষ্ট জিনিস তৈরি করা, গ্রামাঞ্চলের বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া, আনুষঙ্গিক শিল্পাদির বিকাশ ঘটানো, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা—সব ক্ষেত্রেই সবার আগে থেকেছে আই-টি-সি।

অতীতের সেরা ঐতিহ্যকে মূলধন ক'রে আই-টি-সি সমানে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ঘরিদ্দারের পয়সা খরচ যাতে সার্থক হয় তার জন্যে সুপ্রশিক্ষিত হওয়া, উৎকৃষ্ট জিনিস তৈরির প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করা, গবেষণা আর উন্নয়ন খাতেও নব নব উদ্যোগের আয়োজন করা, সেইসঙ্গে ক্রমাগত নিজের তুলনায় উন্নত করার জন্যে সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে কোম্পানির অক্লান্ত প্রয়াস—এই যে অগ্রণী ভূমিকা, তারই দ্যোতক হল এই নতুন প্রতীক।

দি ইম্পীরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কালকের পথিকৃৎ—আজকের অগ্রণী ১৯১০-১৯৭০

ITC/PA-1 [illegible]

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ'ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

পোড়া ···· কাটা ···· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

হাতের কাছে
রাখুন

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

শ্রেষ্ঠ লেখক । শ্রেষ্ঠ রচনা

। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ।

ভাগবতী তনু ১০৲ গৌরাঙ্গ পরিজন ১০৲ কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৷ ভক্ত বিবেকানন্দ ৪৷

। অবধূত ।

। আশাপূর্ণা দেবী ।

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮৷ হিংলোজের পরে ৫৲ নয় ছয় ৫৷ বিজয়ী বসন্ত ৬৲ একাল সেকাল অন্তকাল ১০৲

। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।

বিদেশিনী ৪৲ নগর পারে রূপনগর ১৮৲ স্বয়ংবৃতা ৬৲ সাত পাকে বাঁধা ৫৲ কাল, তুমি আলেয়া ১২৷

। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।

। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ।

মণিমহেশ ৬৷ হিমালয়ের পথে পথে ৭৲ ঈশ্বরের আবাস ৬৲ ইস্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮৲

। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ।

আমি কান পেতে রই ১৪৲ রমণীর মন ৫৷ দহন দীপ্তি ৬৲ একদা কী করিয়া ১৩৲ উপকণ্ঠে ১০৲

। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।

শুকসারীকথা ৮৷ গন্ধাবেগম ৮৲ রাধা ৮৲ উপচ্ছায়া ৫৲ শ্বেতসজীব ৩৷ মিশ্ররাগ ৪৷

। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় ।

। নকুল চট্টোপাধ্যায় ।

কঙ্কাবতী ৫৷ রচনাসম্ভার ১২৲ তিন শতকের কলকাতা ৬৲ চিরকুমারী সভা ৪৲

। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।

। প্রফুল্ল রায় ।

নতুন ভোরণ ৪৷৷ কলধ্বনি ৪৷ বাতাসে প্রতিধ্বনি ৮৷ পূর্বপার্বতী ১১৲ কিন্নরী ৪৷

। নীহাররঞ্জন গুপ্ত ।

সেই মরুপ্রান্তে ১১৲ রাত্রি নিশীথে ৭৲ সূর্যতপস্যা ১০৲ স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯৲ অপারেশন ৭৷

। প্রবোধকুমার সান্যাল ।

গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী ৩৷৷ উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲ মনে রেখো ৮৲ নগরে অনেক রাত ৪৷৷

। প্রমথনাথ বিশী ।

বঙ্কিম সরণী ১০৲ রবীন্দ্র সরণী ১০৲ লালকেল্লা ১৪৲ কেরী সাহেবের মুন্সী ১০৲ নিকৃষ্ট গল্প ৫৲

। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।

ভদ্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৮৲ ২য় ৮৲ পা বাড়ালে রাস্তা ৫৷ স্বপ্নতনু ৪৷৷

। বাসুদেব বসু ।

। বাণী রায় ।

। বীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ।

মেকা—সুন্দরী মেকা ৪৷৷ সকাল সন্ধ্যা রাত্রি ১০৲ বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲

। প্রশান্ত চৌধুরী ।

। বিমল কর ।

আলোকের বন্দরে ৪৷৷ গোধূলি লগ্ন ৫৲ সঙ্গিনী ৪৲ সীমারেখা ৪৷৷ বাড়িবদল ৪৲

। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

দৃষ্টিপ্রদীপ ৭৲ দেবযান ৬৲ অথৈজল ৫৷৷ আরণ্যক ৬৷৷ ইছামতী ৯৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৷

। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

একই পথের দুই প্রান্তে ৪৲ আর এক সাবিত্রী ৫৲ স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম ৫৲ ২য় ৫৷৷ ৩য় ৬৲

। বিমল মিত্র ।

একক দশক শতক ১৪৲ কলকাতা থেকে বলছি ৬৲ সখী সমাচার ৬৲ কুমারী ব্রত ৫৲ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲

। মনোজ বসু । । মহাশ্বেতা দেবী । । রমাপদ চৌধুরী । । লীলা মজুমদার ।

সাজঘরদল ৫৷৷ আঁধার মানিক ১২৷৷ জরির আঁচল ৪৲ আর কোনখানে ৫৲

। শচু মহারাজ । । শরদিন্দু । । সুবোধকুমার ঘোষ ।

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲ গিরিকান্তার ৯৲ লৌহকপাট ২০৲ ছবি ৪৲ বনরাজীলীলা ৭৲ জলছিত্তরঙ্গ ৫৲

। সৈয়দ মুজতবা আলী । । স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় । । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাঙাউজীর ৮৲ বড়বাবু ৭৲ আঁধি ৭৷৷ দ্বিধা ৭৲ মধুমৈমনাক ৪৷৷

। সৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । । হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ।

নিবেদনমিদং ৭৲ শ্রীমান শ্রীমতী ৭৲ ক্লান্তবিহঙ্গী ১১৲ পূর্বাচল ১১৲ মুক্তসম্ভবা ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

॥ প্রকাশিত হল ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে লোকযাত্রায় বিচিত্র-কর্মা অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম পরিচয় নাট্যকাররূপে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা কম নয়। এই সব নাটক একত্র প্রকাশিত হল।

মূল্য শোভন ১৮·০০

॥ সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩॥ ১৫·০০, ১৮·০০
রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬॥ ১৫·০০, ১৮·০০
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪॥ ১৫·০০, ১৮·০০
সোনার তরী ॥ ৩·০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

পল্লী-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোস্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

পল্লী-ভারতী

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা—৬
ফোন : ৫৫-৩২৯৪

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—

ফিরে ফিরে চাই : শান্তিনিকেতনের স্মৃতি —প্রভাত মুখোপাধ্যায়

কার্টুন

পুরাতন পাতা

বন্যা কন্যা (উপন্যাস) —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আদর্শনিষ্ঠ চিত্রশিল্পী : মেসনেয়ার —অনিমেষ রুদ্র

আবার সেই জেল —দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

যে কাহিনী চিরকালের

মেঘনাদ বধ : —সুজন রায়

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী

সন্দেশ বিক্রেতা

সিমলার বিখ্যাত

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

হেড অফিস : ৫৬/২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

UCO-3170

"কাজ-ই হলো সত্যিকার সাধনা"
—এ বিশ্বাস যদি আপনার থাকে

তাহলে দেখবেন,
ইউকোব্যাঙ্ক প্রকৃত
বন্ধুর মতো
আপনাকে আর্থিক
সহায়তা দেবার
জন্য তৈরী।

ইউকোব্যাঙ্ক
উন্নতির পথ
সুগম করে

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা
তত্ত্বাবধায়ক : ম্যা, বি, লাহা

এই সংখ্যায়

গল্পভারতীর পাতা থেকে

'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গলা ভাষা —হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গল্পের নৈবেদ্য

পুতুল নিয়ে	—ভবানী মুখোপাধ্যায়	১০১৭
পুরাণোক্ত সেই দৈত্য	—বাণী রায়	১০২৩
আয়-ব্যয়	—সুবোধ বসু	১০২৯
কমলকুমারী	—কবিতা সিংহ	১০৩২
আপনি আচরি ধর্ম্ম	—বিভূতিভূষণ গুপ্ত	১ ৪৫
কল্লোল ও কালিকলম	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০৫১
রবীন্দ্র-যুগ	—ডঃ কালিদাস নাগ	১০৫৯
বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ		১০৬০
বাঘা যতীন : একটি স্মরণীয় নাম	—অনিল ভট্টাচার্য	১০৬৬

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায় কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি।

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চট্‌চটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল...রাখা ছোট্ট হবে জন্য

কেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS

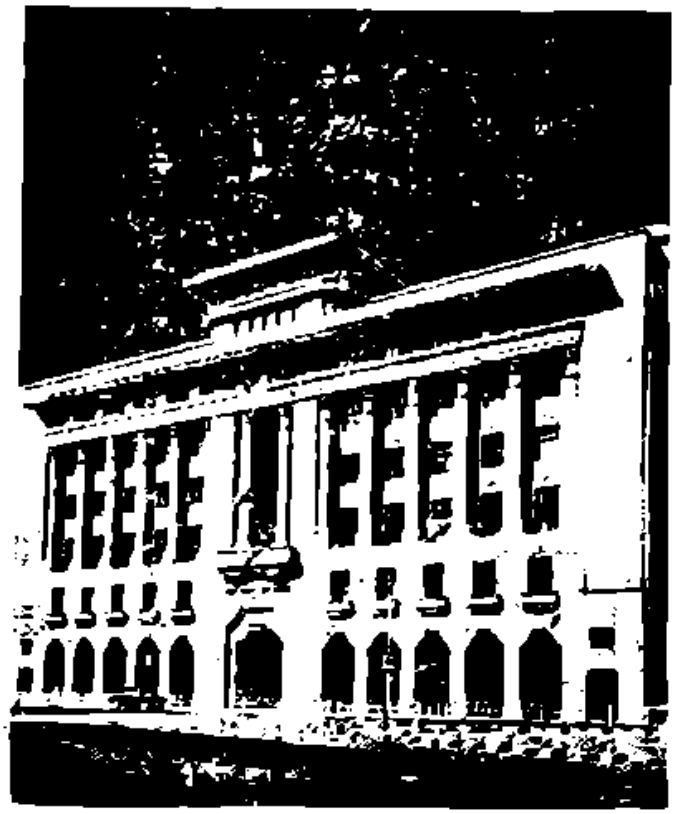

If you bank well with the Bank of India, you can well bank on the Bank of India.

BANK OF INDIA

RAAS/P/32 B

এই সংখ্যায়

নাটমঞ্চ —অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

খেলাধূলা —জ্যোতির্ময়

এই প্রথম

মরীচিকা (গল্প) —ডাঃ কেশব দে

অপরাহ্নবতী (উপন্যাস) —সুবোধ সিংহ

ক্রোড়পত্র

মেয়ে মজলিশ

বাংলার উৎসব —বেলা দে

আমন্ত্রণ লিপি —শ্রীহেমন্তবালা দেবী

হাতের কাজ —রূপা নন্দী

দেহশ্রী : রূপ ও স্বাস্থ্য —শকুন্তলা ৮

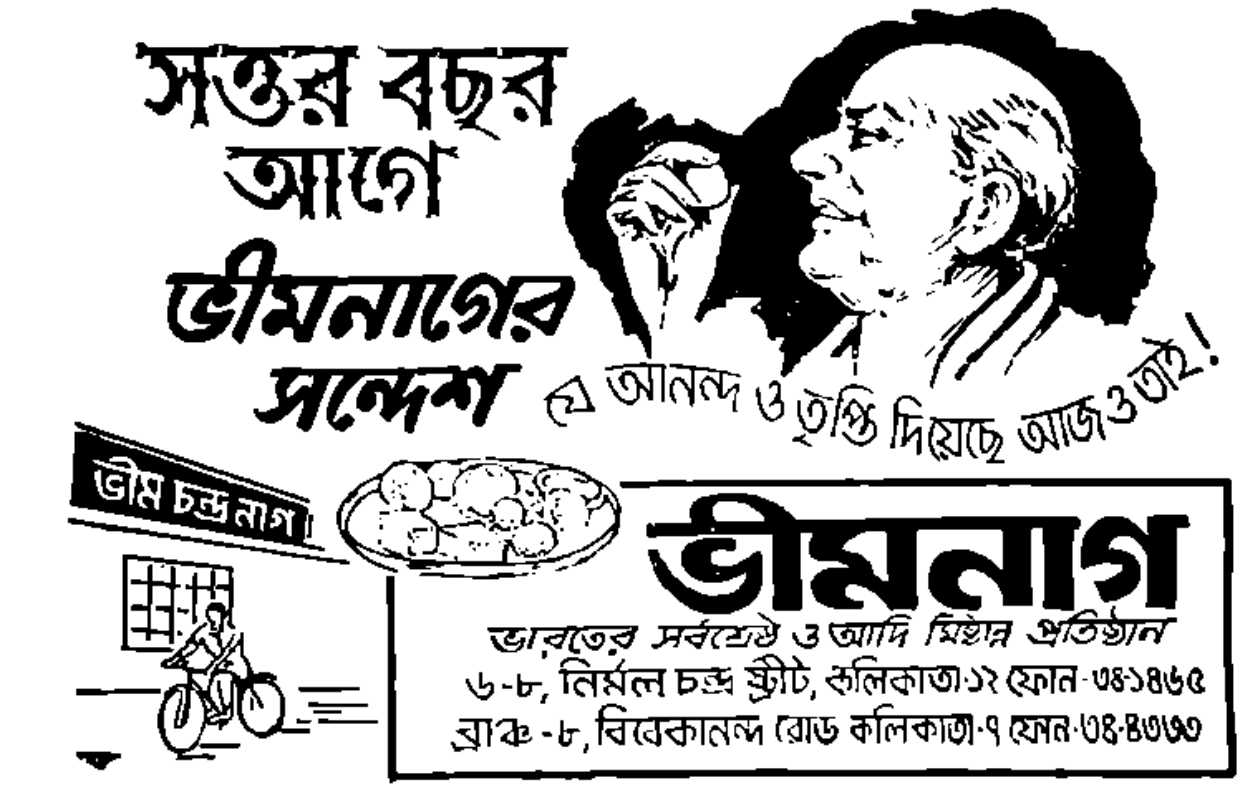

রূপচর্চ্চায়

কে. হোড়ের

প্রসাধনী

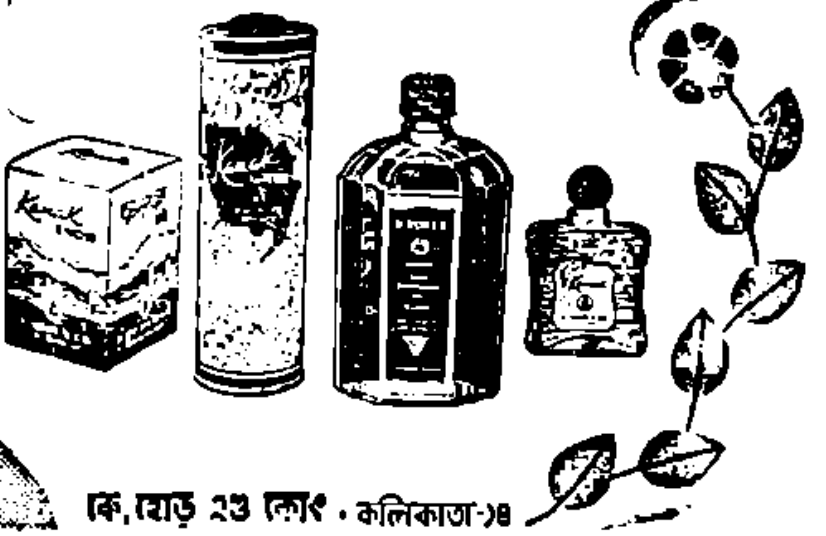

কে. হোড় এণ্ড কোং • কলিকাতা-১৪

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশ-কোষগুলি হবে কালো চুলের কোষগুলি ও চুলগুলি অকুল থাকবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

*

সুষমা

প্রসাধন সামগ্রী

সুষমা ফাউণ্ডেসন ক্রীম
সুষমা স্নো (শকুন্তলা)
সুষমা টয়লেট পাউডার
সুষমা ট্যালকম পাউডার

লি লি কেমিক্যাল ওয়ার্কস - কলিকাতা-৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের হার

তৃতীয় প্রচ্ছদ	২০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭৫ টাকা

বিজ্ঞাপন প্রকাশের শর্তাবলী সম্পর্কে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বিজনেস্ ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১

প. ব., (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ১৪১৪।৭০

মাথা ঠাণ্ডা রাখার কাজে
"মহাভৃঙ্গরাজ" অদ্বিতীয়।

ভৃঙ্গল মহাভৃঙ্গরাজ মাথার তেল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদমতে ক্যালকাটা
কেমিক্যালের আধুনিক কারখানায় তৈরি।

ভৃঙ্গল মাথার তেলে আছে
ভৃঙ্গরাজ পাতার রস, তিল তেল
এবং আরো ১২টি গাছগাছড়ার নির্যাস।
এ-সমস্তই মাথা ঠাণ্ডা
রাখে। চুল আরো
সজীব করে।

বিশুদ্ধ
আয়ুর্বেদমতে তৈরি
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি
মহাভৃঙ্গরাজ
মাথার তেল

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

রজত জয়ন্তী বর্ষ

পঞ্চবিংশতি বর্ষ, দশম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ

শুভ বৈশাখে আমাদের বৎসরারম্ভ। অনেক পুণ্যকর্মের সূচনা হয় এই বৈশাখে। বৈশাখকে আমরা তাই পুণ্যমাস বলে থাকি।

আশ্চর্য প্রতিভাধর যুগন্ধর কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ।

রবীন্দ্র প্রতিভা অতলস্পর্শী। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অনেক হয়েছে। অনেক হবে। এর আর শেষ নেই। আজ আমরা সেই বিশ্বকবির দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেই রবীন্দ্রপূজা করতে চাই।

১৯০৫ সালে পিছিয়ে চলুন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধের প্রবল বন্যা প্লাবিত করেছে সারা দেশকে। এর সর্বপ্রধান পুরোধা হলেন মহাত্মা গান্ধী।

মহাত্মার হাতিয়ার ছিল অসহযোগ আন্দোলন।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় মহাত্মা গান্ধীকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন।

লিখেছিলেন—

'আমি সর্বদাই মনে করিয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি—কোনও জাতি দানরূপে স্বাধীনতার বিরাট সম্পদ লাভ করিতে পারে না। উহা সম্ভোগ করিবার পূর্বে আমাদিগকে উহা অর্জন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ যেদিন প্রতিপন্ন করিতে পারিবে যে, কেবল বাহুবলে আধিপত্য বিস্তারের অধিকারে যাহারা এই দেশ শাসন করিতেছে, নীতির দিক হইতে তাহাদিগের তুলনায় ভারতবাসী অনেক বেশি উন্নত—সেইদিনই তাহার স্বাধীনতা লাভের সুযোগ আসিবে।

দুঃখ ভোগের কৃচ্ছ্রতা তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে হইবে।

সেই দুঃখ ভোগই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জয়মুকুট।

যাহারা আজ দম্ভভরে আত্মিক শক্তিকে উপহাস করিতেছে, অবিচলিত বিশ্বাস আর অপরাজিত মনুষ্যত্বের বর্মে আবৃত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।'

কবির এই উদাত্ত আহ্বানে শুধু মহাত্মাগান্ধী ন'ন, সেই সঙ্গে সমস্ত দেশবাসী অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে সশরীরে দণ্ডায়মান না হয়েও তিনি তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত এবং কর্মশক্তিকে সেই দিকে পরিচালিত করেছিলেন।

মহাত্মা-গান্ধী ছিলেন কর্মী এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই আন্দোলনের চারণ কবি এবং একমাত্র প্রচারক।

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক কবিতা এবং গানের ফলশ্রুতি এবং প্রতিক্রিয়া যে কত বেশি ব্যাপক তা আমরা বুঝতে পারলাম তখন—যখন সারা দেশের যুবশক্তির হৃদয়ে আত্মস্থানের চেতনা জেগে উঠলো। বাংলার আবালবৃদ্ধ বনিতা দুঃখকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করলে না। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

'ওই অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে,
সময় এসেছে নিকট, এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

বঙ্গ জননীর মাতৃমূর্তিকে কল্যাণীরূপে রবীন্দ্রনাথ তাদের সুমুখে তুলে ধরলেন—

'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ-হাতে করে শঙ্খাহরণ।
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাটনেত্র আগুন বরণ।'

রাজশক্তি যখন অত্যাচারের তীব্র কষাঘাতে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করলো, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকেই বজ্রাগ্নি উচ্চারিত হলো।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে।
মোদের ততই বাঁধন টুটবে—
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে—
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

তারপর সরকারী নিষেধের রক্তচক্ষুকে অবহেলা করে বাংলার রাখীবন্ধনের পুণ্যদিন অনুষ্ঠিত হলো। এই পুণ্যদিনের পুরোহিত হলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। যে গান তিনি রচনা করলেন বাংলাদেশের পথে পথে তরুণের দল সেই গান গেয়ে বেড়াতে লাগলো।

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান!

তার সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন ১৯১৯ সালে—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে। ইংরাজ শাসকের দেওয়া সম্মানের মুকুট (নাইটহুড্) ঘৃণাভরে ঘড়লাটের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতে রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলেন না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ফিরে ফিরে চাই

(ভূমিকা)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ মাস রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস।

গল্প-ভারতীর শুভ বৈশাখ সংখ্যা থেকে—রবীন্দ্র জীবনীকার তাঁর একান্ত অনুরাগী ভক্ত একদা প্রাক্তন শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা স্মৃতিচারণ 'ফিরে ফিরে চাই—' প্রতিমাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। প্রিয় প্রভাতদার শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্মমূর্তি শ্রীমতী আমার পড়ার ঘরে ঢুকে বললেন, "কেবলই তো লিখছো। শোনাবে না? বৃদ্ধ বয়সে পুরনো কথা বলতে ও শুনতে ভালো লাগে। কেন জানিনে।" আমি বললাম, "মানুষ প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাই সে তাকায় সামনের দিকে। প্রতিদিন একটা কিছু ঘটবে, তারই প্রতীক্ষায় থাকে। দেখতে দেখতে সময় যায় চলে, তখন যার জন্য প্রতীক্ষা তা তখন বর্তমান হয়ে চলে গেছে অতীতে।···সামনে তো আর কিছু হবার নেই আর কিছু পাবার নেই, তাই সে 'ফিরে ফিরে চায়' অতীতের দিকে।"

"বেশ তো ফিরে ফিরে চেয়ে লিখবে এখন। দুই একটা গল্প বলো—শুনি।"

বুঝলাম—সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন টেবিল থেকে আমাকে উঠিয়ে বাইরের বারান্দায় নিয়ে যাবার জন্য এই অনুরোধ। আমার বিলাস-গৃহ আমার এই লাইব্রেরী। এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করে না। তবুও উঠতে হলো।

বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে পা এলিয়ে বসলাম। শ্রীমতী তাঁর ইজি-চেয়ারে আশ্রয় নিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মনে আছে সেই যেবার আমরা সবাই মিলে দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম—সেজো কাকার মেয়ের বিয়েতে? তখন একটা কথা শুনি গ্রাম-বৃদ্ধাদের কাছে। তোমায় বলেছিলাম কি?'

আমি বললাম, 'দেশে যাবার পূর্বে এবং দেশ থেকে ফিরে আসার পর এই ত্রিশ বৎসর—অর্থাৎ যৌবনারম্ভের সুরু থেকে অবসরপর হবার মুখ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ধরে এতো কথা শুনিয়েছ এবং এতো কথা শুনেছ সব কথা মনে রাখতে হলে রাবণের দশমুণ্ডের প্রয়োজন—এই এক মাথায় সব ধরে রাখতে পারা শক্ত। এখন কোন্ কথাটা বল, শুনি।'

শ্রীমতী বললেন, "তোমার মুখে কি শাদা কথা হয় না? কথা বলতে গেলেই কি 'সাহিত্য' করে তুলতে হবে?"

আমি বলি, 'রসাত্মক বাক্যই সাহিত্য—এটা বুঝতে পার নিশ্চয়ই! কিন্তু রসের কথা বলবার বয়স পেরিয়েছে—অতএব থাক।"

শ্রীমতী বললেন, "পুরনো কথা 'রোমন্থন' করছ বলেই-না কথাটা পেড়েছিলাম।"

সেজো কাকার মেয়ের বিয়ে, জজসাহেবের কন্যার সঙ্গে হাইকোর্টের উদীয়মান তরুণ অ্যাডভোকেটের বিবাহ। আয়োজনটা রাজসিক হয়েছিল। গৃহিণীকে কে এক গ্রাম-বৃদ্ধা এসে অনেক তনিতা করে বলেছিলেন, 'জানো মা, এই যে সব বাড়িঘর দেখছো এসবই তোমার ঠাকুরের (শ্বশুর অর্থাৎ আমার পিতার) ঘরবাড়ি—এসবই ওঁর তৈরী। ছেলেরা তো এসব ভোগ করবার জন্য এলো না, হাবী-দাওয়া করলে না—এখন সবই ভোগ করছেন এঁরা।'

ওঁর বক্তব্য শুনে আমি বললাম, "এসব গ্রাম্যতা। কাকাদের অবস্থা ফিরেছে—এটা ওদের ভাল লাগছে না। অথচ নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে,—পেটভরে খেলো, আঁচল ভরে নিলো, আর তোমার কাছে নিন্দে ছড়িয়ে গেলো।"...একটু চুপ করে থেকে বললাম, "ভাগ্যে বাবা দেশ ছেড়েছিলেন, ভাগ্যে দেশে ফেরবার সুবুদ্ধি আমাদের মনে আসেনি, তা না হলে কি করতাম? হয় ওখানকার হাইস্কুলের মাস্টারি না-হয় আদালতে ওকালতী। তা না জুটলে কলকাতায় চাকরি করে ভেলিপ্যাসেঞ্জারী! মাস্টারি যদি করতাম, শিশু ও বালকদের সঙ্গে থাকতে থাকতে মনটা তাদের বয়সের মধ্যেই থেকে যেতো—মানসিক বামন-অবতার হয়ে থাকতাম। আর উকিল হলে মিথ্যাবাদী, অসৎ লোকের মামলা নিয়ে সত্যকে মিথ্যা, অথবা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করতাম—নিজের বিবেককে বলি দিতাম কয়েকটা টাকার জন্যে। দুনিয়াটার সবকিছুই দেখতাম উকিলের পয়লা পয়ে। মুক্তি পেয়েছি এসব ছেড়ে। এখন তুমি গান শোনালে পারতে—

'বাহির করেছে পাগল মোরে—
যাব না যাব না যাব না ঘরে।'

যাক্ ওসব কথা। পাণ্ডুলিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনাই তা হলে, কি বলো? শ্রীমতী খুশি হলেন।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার কথা। বাঙলাদেশ তখন মুঘল-মুসলমানী শাসনমুক্ত হয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সৌভাগ্য সুখের দিন দেখা দেয়নি। সেই আলো আঁধারি কালে দেশে অরাজকতা বা বহুরাজকতার বাধাহীন উপদ্রব চলছে। সেই সময়ে গঙ্গাতীরে চাকদহের অদূরে জঙ্গড়া গ্রামে দুই ভাই বাস করতেন। অভিশপ্ত চষলের মানুষগুলি যেমন করে জীবিকা অর্জন করতেন, সে-যুগের অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থও ছিলেন সেই স্বভাবের মানুষ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীকুমার ভেসে যান এই বন্ধনহীন অ-সামাজিক জীবনস্রোতের টানে। জঙ্গড়ার ঘাটে চোলাই মদের হাঁড়ি ও নীচ জাতের লেঠেল্ নিয়ে বসে থাকতেন শিকারের সন্ধানে। কালীকুমার ভাগ্যে সংসারী হন নি; তা না হ'লে তার বিষাক্ত রক্তে রক্তবীজের ঝাড় সব-কিছুকে বিপর্যস্ত করে তুলতো।

জ্যেষ্ঠ রামকুমার নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে চাকদহের কাছে এক গ্রামে এসে দুই-কুঠরির একটি ছোট বাড়ি তৈরী করেন। ইংরেজি শিক্ষার নূতন চাহিদা দেখে রামকুমার তাঁর পুত্রদের মধ্যে বড়টিকে কৃষ্ণনগরে পাঠালেন লেখাপড়া শেখার জন্য। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যচরিত্র মানুষটির কথায় আসবো পরে। রামকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার পিতার 'জ্যেঠামহাশয়'। ইনি দুনিয়ার পরীক্ষোত্তীর্ণ। তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সিনিয়র ও জুনিয়র দুই শ্রেণীর পরীক্ষা ছিল। ছেলের

সেই দুই-কুঠরির ঘরের একটিতে বিরাট এক কাঠের আলমারীতে দেখতাম ইংরেজি বই ঠাসা। ছোটবেলা থেকেই বই ঘাঁটা আমার বাতিক। দেখতাম সেগুলো। বুঝতাম না এক বর্ণও, তবুও দেখতাম। সেসব বই-এর নাম-ঠিকানা কিছুই মনে নেই, কেবল মনে আছে মেকানিক্যাল ও সিভিল ইন্‌জিনীয়ারের হিজিবিজি ড্রয়িং।

রামকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র আমার পিতামহ—ব্রহ্মতেজের সাধনা না করে ক্ষাত্রতেজের সাধক হন। ঘোড়ায় চড়া, লাঠিখেলা, কুস্তি করা, বন্দুক ছোড়ায় হলেন ওস্তাদ।

দুই ভাই-এর চেষ্টায় একদিন লক্ষ্মীঠাকুরাণীর দেখা মিললো তাঁদের সংসারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরাণীর সতীন-ভগ্নী অলক্ষ্মী দেবী যে খিড়কী দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, তা তাঁরা জানতে পারেননি।

ঊনবিংশ শতকের পাঁচ দশকের শেষদিকে ভারতে রেল লাইন পাতা সুরু হয়েছে। আমাদের অঞ্চলে রেলপথ এলো। ১৮৬২ সালের মধ্যে শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। এই রেল-পথ নির্মাণকালে বহু ঠিকাদার কাজ করে বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হন। আমাদের ঠাকুরদাদা দুই ভাই মিলে সেই কাজে লেগে গেলেন। জ্যেষ্ঠ তাঁর বিদ্যাবলে বাইরেটা সামলাতেন, অর্থাৎ ইংরেজ উপরওয়ালাদের মন জুগিয়ে কাজ আদায় করতেন; আর কনিষ্ঠ তাঁর ক্ষাত্রবলে কাজকর্ম তদারক করে তা সকল করে তুলতেন। লক্ষ্মী এলেন। সৈতৃক দুই কুঠরি বাড়ির সামনে নির্মিত হলো পূজার দালান, পুকুর কাটা হলো, ইট পোড়ানো হলো জঙ্গলের কাঠ দিয়ে। কুমোর পাড়া বসলো—বোধহয় ইটের যোগান দেবার জন্য। ঘুঘুরী নামে একজাতের লোক এনে বসানো হলো। তারা চুন তৈরী করবে। পদ্মা নদী বেয়ে শামুক ঝিনুক জলঙ্গার ঘাটে এসে লাগে। সেই শামুক পুড়িয়ে চুন তৈরী হলো। —সিলেট কাটনীর চুন অজ্ঞাত তখন। তিন মহলা বাড়ি—প্রবেশমুখে বিরাট সিংহদ্বার—তার দু'পাশে দুটি বৈঠকখানা ঘর। সিংহদ্বার দিয়ে হাতী যেতে পারে এমন উঁচু। সেটা বন্ধই থাকতো—মানুষ চলাচলের জন্য ছিল ছোট একটা দরজা—মাথা নিচু করে ঢুকতে হতো। ঠাকুর দালানের সামনে অদূরে ছিল গরুর গাড়ি, পালকি প্রভৃতি রাখবার জায়গা। ছোটবেলায় দু-একবার গিয়েছি গ্রামে। তখন—লক্ষ্মী অন্তর্হিতা। ঠিকেদারীর অর্থে ঘরের পর ঘর নির্মিত হয়েছিল। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ঠিকরে পড়ছিলি সবদিকে। শুনেছি চৌষট্টি (৬৪) খানা ঘর ছিল। কিন্তু অদৃষ্টে এতো সুখ সইলো না। একটা রেলসেতুর কন্ট্রাকটে এত বেশি খেলেন, যে তা সামলাতে পারলেন না। বন্যার জল বন্যায় টেনে নিয়ে গেল—বোধহয় পাপের ধন—সইলো না। তাছাড়া ঠাকুরদার মেজাজটা ছিল সাহেবী—বেশভূষা চাল চলনেও সাহেবদের মতো। একটা অবাধ্য কুলিকে এমনভাবে প্রহার করেন যে, লোকটা নাকি পরে মারা যায়। তা নিয়েও অনেক হয়রানি ও অপব্যয় হয়—অর্থ জলের মতো ব্যয় করে উদ্ধার পান কোনো রকমে। শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে দুইকুঠরি ঘরে আশ্রয় নিতে হলো। প্রাসাদোপম অট্টালিকার অনেকটা অসমাপ্ত থেকে গেল—অবশিষ্টাংশ মহাকালের স্পর্শে ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো।

এইটুকু পড়ে শোনালাম পাণ্ডুলিপি থেকে। শ্রীমতী বললেন, 'কালের কী পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা চিরকাল রাজধানীতে ভাড়াবাড়িতে বাস করেছিলাম। নিজের বাড়ি দেখলাম তোমার ঘরে এসে।' দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকি। অর্ধশতাব্দীর ছবি মনের গহনে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে শ্রীমতী বললেন, 'দেশের বাড়িতে যাকে তোমরা ঠাকুমা বলতে তিনি কে?'

"তিনি আমার বাবার জেঠা-মহাশয়ের স্ত্রী বা জেঠিমা—তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। দুই দুইবার স্ত্রী

যারা গেলে আত্মীয়রা ঠিক করলেন আমার ঠাকুরদার জন্ত সুন্দরী বউ সংগ্রহ করবেন না। বোধহয় তাঁদের ধারণা ছিল বয়ের টান সুন্দরীর দিকে। তাই আমার ঠাকুরদার জন্ত কালো বউ আনা হলো। গ্রাম বৃদ্ধরা ঠাকুরদাকে শুধোয়, 'হাঁরে যাদু, তুই নিজে এমন কার্তিকপানা - তুই আনলি কালো বউ?' ঠাকুরদা উত্তরে বলেন, 'পাখা বুড়িতে কালো পাত্র মানায় ভালো।'

দু'জনেই হাসলাম। তারপর হাসি থামলে আমি আবার আরম্ভ করলাম—'বাবা পড়তে আসেন কলকাতায় চোদ্দ বৎসর বয়সে চাকদহের এক মাইনর স্কুল থেকে পাশ করে। রাণাঘাটে হাইস্কুল হয়েছে কয়েক বৎসর পূর্বে। তাছাড়া এ-দিগন্তে কোনো স্কুল ছিলনা। সুতরাং কলকাতায় আসতে হলো। সে কালে বাঙালী ছাত্রদের জন্ত হস্টেল, বোর্ডিং ছিলনা; মফঃস্বলের ছাত্রদের থাকতে হতো হয় কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নয় বন্ধুর সঙ্গে 'মেস বাড়ী'তে—বামুন চাকর রেখে। গ্রামের কয়েকজন যুবকের এক মেসে বাবা থাকলেন। কিন্তু বালককে দেখাশুনা করবে কে? জ্যেঠামশায় ভাইপোর ভার দিলেন তাঁর কলেজপড়ুয়া বন্ধু রামতনু লাহিড়ীর উপর।

রামতনুর ন্যায় মানুষ ইদানিং দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজে এসে তিনিই সর্বপ্রথম উপবীত ত্যাগ করেছিলেন, বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্ত, যজ্ঞহীন জীবনে 'সূত্র' ধারণ নিরর্থক। তিনি এই গ্রাম্য বালকটিকে তাঁর আত্মীয় ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত পরিচিত করে দেন। রামতনুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী—একজন কুমারী খৃষ্টান হয়ে যান ও বেথুন স্কুলের শিক্ষিকার কাজ করতেন। অপর জন বিধবা—তাঁর বিবাহ হয়, কলকাতার বুনিয়াদী এক কায়স্থ বংশের যুবকের সঙ্গে। বাবা এই পরিবারে পুত্রবৎ হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্ম-বাড়িতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতে দেখে জ্যেঠামশায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন বোধহয়। এই পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা বলা যায়না। যাইহোক কর্তৃপক্ষ এক শুভদিন দেখে ভাইপোকে গ্রামে ডেকে বিবাহ দিলেন—এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার সঙ্গে। বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—সেকালের ঘটিবাম ডেপুটি নিজ বুদ্ধিবলে সামান্ত কর্মচারী থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। তিনি বি-এ পাশ জামাতা পেয়ে খুশি,—তাঁর আশা—আইন পাশ করলেই জামাতাকে মুন্সেফি পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। জ্যেঠামশায় ভাবলেন সুন্দরী বধূ পাওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ থেকে ভাইপো নিবৃত্ত হবে। বাবা মুন্সেফীর কাজ নেবার জন্ত কোনো আগ্রহ দেখালেন না, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের জন্ত কোনো মানসিক বা আধ্যাত্মিক আকুতি বোধ করলেন না। কাজে আমি সরকারী বিদ্যা লাভের আশা জলাঞ্জলি দিলাম পিতার জীবনকালে; আর তাঁর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নিলাম। একেই বলে জীবনের পরিহাস—আমরা যা চাই তা পাইনা, আর যা পাই, তা চাইনা।

'দেখা নয়, দেখা নয়, দেখা নয়, অন্ত কোনখানে।' সামনের জন্ত প্রতীক্ষা আর পিছনদিকে 'ফিরে ফিরে চাওয়া।'

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ পদে যার জন্ম, বিংশ শতাব্দের সাত দশকের শেষ ভাগের কাছে এসে, সে আজ দেখতে চাইছে তার অতীত জগতকে, সে আজ খুঁজতে বসেছে তার হারানো দিনগুলিকে। যে শহরে সে জন্মেছিল, খেলেছিল, পড়েছিল—সাতপাকে বাঁধা ছিল যার জীবনের প্রথম পনেরো বৎসর, সে শহর আজ তাকে জানে না, আজ শহরবাসীরা জানে তার খ্যাতির বুদ্বুদকে। সেদিনকার ছোট ছেলেটির পুরানো সঙ্গীদের খোঁজ করতে গিয়ে কাউকে পেলোনা সে। যে দুই-একজনের দেখা পেলো শরীর মনে জীর্ণ তারা—তাদের কাছে হারিয়ে গেছে সে-অতীতকাল, বস্তুতান্ত্রিক জড়জগতের নিগড়ে বাঁধা তাদের চেতনা।

শহরটি এখন খণ্ডিত বাঙলা দেশের সুপরিচিত সমস্যা-কণ্টকিত দীমান্ত জনপদ। শহরের রূপ তখন সম্পূর্ণ শহরে হয়ে ওঠেনি—গ্রাম সবেমাত্র 'সত্তা' হচ্ছে। যে সত্তাটা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক তা হয়ে আসছে নগরমুখী। মধ্যযুগের গ্রামীন অর্থনীতি ধ্বংস পেয়েছে। গ্রামে জীবিকার অভাব, চিকিৎসার অভাব, শিক্ষার অভাব নিদারুণ। যার শক্তি আছে বুদ্ধি আছে বিদ্যা আছে সেই চলেছে নিকটের শহরে বা রাজধানী কলকাতায়। আমার বাবাও আইন পাশ করে (১৮৯১) শহরে এলেন ওকালতী করবার জন্য। কালে টাকা হলো, মান হলো—কিন্তু শহরে বাড়ি করলেন না। জীবনভর ভাড়া বাড়িতে কাটালেন। বাড়ী করলেন গ্রামে—deserted village। যে বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, তার দশমাংশও যদি শহরে করতেন, তবে শেষজীবনটা হয়তো অর্থাভাবে ভুগতে হতো না। সবাই গ্রাম ছাড়ে, বাবা গ্রামের উন্নতির জন্য সেখানে ঘর গড়লেন। কিন্তু অবশেষে সেই আদর্শবাদের বলি হলেন তিনি। সে কাহিনী বলা যাবে পরে।

সেবার এই শহরে এসেছি যে-শহরের সঙ্গে জন্মাবধি পনেরো বৎসরের স্মৃতি জড়িত। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম সেই বাড়ির সামনে,—যেখানে জন্মেছিলাম বলে শুনেছি। সে বাড়ির আশে-পাশে কত সৌধ উঠেছে চেনা যায় না আজ। তবুও চিনতে পারলাম।

মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি সেকালের কত ছবি। কোথা থেকে কিভাবে তারা দেখা দেয় জানিনা। তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখছি যা চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না।

স্মৃতির আধার কোথায় জানিনে। আড়াই তিন বৎসর বয়সের দুই একটা ছবি,দুই একটা কথা—পঁচাত্তর বৎসর পরে কেমন করে মনের মধ্যে এসে লেখনীর মুখে রূপান্তরিত হচ্ছে তার কারণ কে বলতে পারবে?

বাড়ির সামনে রাস্তার ও-পারে ছোট একটি খড়ের ঘরে বাস করে একঘর 'বোষ্টম'। ছোট দোকান তাদের সামনে। ঝাঁপ তুলে দেয় দিনমানে, রাতে ফেলে দিলেই ঘর—আজকালকার রোলিং শাটারের আদি সংস্করণ। দোকানে সামান্য মালপত্র, নানারকম কাঠের ঘালা, ঘুন্সি, মাদুলি, তাগা, তাবিজ, লোহার বালা বা 'খাড়ু' 'মোয়া' বলে লোকে। শিশুদের জন্য কাজললতা, কাঠের ঝুমঝুমি, মেয়েদের জন্য আলতা-পাতা। ছোট আয়না, কাঠের চিরুনী বা কাঁকুই। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকে জেম্ বিস্কুট আর লোমেন্স, যার বাংলা হয়েছিল 'ল্যাবেনচুস'—মটরের মতো গোল-গোল, মাঝে থাকতো একটা 'ঘনিয়ার চাল'। খেলনার মধ্যে ছিল মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, টিনের গাড়ি। প্লাস্টিকের পুতুল, খেলনা অজ্ঞাত। সন্ধ্যার পর দোকানে 'পিদীম' (প্রদীপ) দেখিয়ে ধুনোর ধোঁয়া ঘুরিয়ে নিয়ে বোষ্টম বসে খোল নিয়ে গান করতো, বোষ্টমী খঞ্জনি বাজিয়ে গানে 'দোহার' দিত।

মা'র কাছে শুনেছি বোষ্টমীর ছেলেপুলে ছিল না। তাই আমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের দোকানের এককোণে রঙীন 'ঘাটাটোপ' ঢেকে শুইয়ে রাখতো। আমাকে নিয়ে খেলা করতে করতে বোষ্টমীর কোলে এল শিশু। হরেকেষ্ট। সে হয় আমার খেলার সাথী। নূতন বাসাবাড়িতে গেলেও হরেকেষ্ট বহুকাল ছিল বন্ধু ও খেলার সঙ্গী। তাকে আজও ভুলিনি।

নূতন বাসা-বাড়িতে এসেছি—ভুলে যাই, পুরানো বাড়ির পাশ দিয়ে পথ। দেখতাম বাড়ির মালিক হারান সেন তাঁর বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন জলচৌকিতে; আদুল গা, নাভির নিচে বস্ত্র, দুই হাত চৌকিতে রেখে হাঁপ টানছেন—তাঁর হাঁপের ব্যারাম। গলায় হাতে তাগা তাবিজ, মাদুলি ছোট বড়ো অনেক রকমের। এমন বর্মাবৃত হয়েও হাঁপের টান কমছে না—ডাক্তারি ঔষধ, অবধূতের চিকিৎসা, সন্ন্যাসীর জড়ি-বড়ি সবই চলছে তবু হাঁপানি কমে না।

নূতন বাসা-বাড়ির মালিক ত্রিলোচন উকিল। মাসিক ছয় টাকা ভাড়া। ত্রিলোচন সংস্কৃতিবান পুরুষ ছিলেন বলেই মনে হয়। বাড়ির ছাদে যাবার সিঁড়ির পাঁকে একটা ধাপে ছিল একটা টিনের বাক্স। তার মধ্যে ছিল 'বামা-বোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মনদর্পন' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ। মনে আছে বিবিধার্থ সংগ্রহের কথা, বড় বড় বই—কাঠের ছাপা ছবি আছে মাঝে মাঝে। কিন্তু তার মূল্য কি! না জানতেন পিতা-মাতারা, না জানতাম আমরা। আমাদের সে বয়স হয়নি। তাই অনেক সময় বড় উঠলে সেই বই-এর পাতা ছিঁড়ে ছাদের উপরে গিয়ে উড়িয়ে দিতাম! পাতার পর পাতা উড়তে উড়তে চলে যেতো—খুব মজা লাগতো!

সোয়ালাপাড়ার মধ্যে ছিল এই একটি মাত্র পাকাবাড়ি। আশেপাশের সব বাড়িই খড়ের অর্থাৎ মাটির দেয়াল, বাঁশের কাঠামোর উপর খড় বা ছন্ দিয়ে ছাওয়া। ধানের বিচালি দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়—তা দেখলাম বীরভূমে এসে। পূর্ববঙ্গে দেখেছি। দেখেছি ছনের ছাওয়া ঘরে।

বাসাবাড়ির পাশেই গলির মোড়ে বাস করতো কাস্ত সোয়ালা। তার চেহারা এখনো মনে আছে। হারকিউলিসের মতোন। বোঝাই ধানের গাড়ি কাদায় আটকে গেছে গলির মোড়ে। ঠেলছে কাস্ত ও তার ছেলে—কাস্তর দেহশক্তি ফুলে উঠেছে। কাদাথেকে গাড়ি পেরিয়ে গেল। এ আর্য্য দেখতে পাইনি তাদের বংশধরদের মধ্যে।

এককালে হাঢ় অঞ্চলে ভোমরা ছিল সৈনিক, ষোড়শওয়ার—

আগে ভোম, পাছে ভোম,
ঘোড়ায় ভোম সাজে—

আজ সেই ভোমের বংশধরেরা নিজের বাড়ির মাটির প্রাচীর মেরামতী করবার জন্য দাঁওতাল মাঝি মেজেনদের ডাকে। তাদের সে আর্য্য গেল কোথায়?

জ্বালানি কাঠের জন্য গরুরগাড়িতে বোঝাই হয়ে আমগাছের গুঁড়ি, ডাল ইত্যাদি আসে বিক্রীর জন্য। গাড়িকে গাড়ি কাঠ কিনে বাইরের উঠানে স্তূপ করে ফেলে রাখে। তাই দেখে আসে ভবঘুরেরা। তাদের কাজ কাঠ কেড়ে উনোনে জ্বাল দেবার মতো টুকরো করা। এরা মুসলমান—নিকটের গ্রামের বাসিন্দা। পাথরে খোদাই করা দেহ—কাঁধে কুড়ুল। দেখতে দেখতে সেই ভারী কুড়ুলের ঘায়ে ঘায়ে চেলাকাঠ তৈরী হয়ে যায়। বসে বসে দেখতে খুব ভাল লাগে। চেলাকাঠ বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবার ভুলে রাখা হয়, বাইরে পড়ে থাকে গুঁড়ির গাঁট অংশগুলো—তাদের কাটা যায়না। সেগুলো শুকিয়ে গেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়—চিমিয়ে চিমিয়ে পোড়ে, কিন্তু জ্বলে ওঠেনা। বাবার মজেনদের সে কয়দিন তামাক খাবার খুব সুবিধা হয়।

টুকরো টুকরো স্মৃতিকণা অজ্ঞাত উৎসপ্রবাহের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে উঠছে লেখনীর মুখে।

বারো মাসে তেরো পার্বণ হোতো সেকালে। উৎসব হতো বারোয়ারি। এখন বারোমাসে বত্রিশ রকমের 'ফাংশান', বারোয়ারি বলে হয়েছে 'সার্বজনীন'। বারোয়ারি উৎসব হতো একটা অথবা দুই পাড়ার দুটো, এখন একই পাড়ায়—বাবার এমুড়োয়, ওমুড়োয়, একই পার্কের এদিকে ওদিকে সার্বজনীন দুর্গাউৎসব, সরস্বতীপূজা।

সেকালে পূজাপার্বণের কথা মনে পড়ছে। চৈত্রমাসের শেষ। পাড়ার সোয়ালাদের জোয়ানরা গাজনের 'সন্ন্যাসী' হয়েছে,—রুক্ষমাথা, পরনে গেরুয়া রঙের ধুতি কোমরবেঁধে পরা গলায় কদমফুলের মালা।

এই গাজনের সন্ন্যাসীরা—চলেছে কলসি কাঁধে জল ভরতে। সেটা পূজার জন্য প্রয়োজন। হাঁকছে 'ভব বাবা তারকনাথ'। 'শিব ভোলানাথ'। সেকালের রাস্তার জানমুরগিতে তাদের অঙ্গ হয়ে গেছে লাল।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন চড়কতলার উৎসব শেষ হতো। চড়কতলা ছিল রেলের ওপারে—ছোটবেলায় গেছি—ঝাপসা হয়ে গেছে সে ছবি। তবুও মনে আছে পাতার ভেঁপু কিনে ফুঁ দেওয়া। আমাদের গোয়ালাপাড়ার একটি খালি জায়গাকে বলা হতো চড়কডাঙা। সেখানে দেখতাম সন্ন্যাসীদের কসরৎ। একটা মোটা খোঁটার উপর লম্বা বাঁশ বাঁধা। তার দুইদিকে দুইজন লোককে কোমর থেকে ঝুলিয়ে রাখা। লম্বা বাঁশটা খোঁটার সঙ্গে এমন ভাবে লাগানো হয় যেটাকে নিচে থেকে ঘড়ি দিয়ে ঘোরানো যায়। কত কথা শুনতাম। পিঠের চামড়া বিঁধে সুতো ঝুলছে তারা! নিচে নাকি কাঁটা, লোকদুটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ঝুপ করে পড়লো বটে, তবে কাঁটার উপর পড়লো কিনা জানিনা। সঙ্গে ছিলেন বড়কাকা। বললেন, আগে এসবে অনেক নিষ্ঠুরতা ছিল, বৃটিশ সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে।

বহুকাল পরে বৃদ্ধ বয়সে কলকাতার পঞ্চপুকুর-পাড়ার শহরে চড়কপূজা দেখেছিলাম। বেচাকেনা রঙ-তামাশার দিকেই জনতার মনোযোগটা চোখে পড়েছিল—অবশ্য বাঁশে লোক ঝুলছিল, ঘুরছিলও। আমাদের গ্রাম্য লোকে তেমন নড়া হয়নি তখনো, তাই ভয়ে ভক্তিতে সবকিছু পালন করাকেই 'ধর্ম বলে মনে করতো।

গাজনের সন্ন্যাসীরা যখন নাচতে নাচতে পথ দিয়ে ধুলায় ধূসর হয়ে চলতো, তখন মুগ্ধনেত্রে দেখতাম তাদের।

পরদিন নববর্ষ। আজ নববর্ষে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয় শান্তিনিকেতনে।

[ক্রমশঃ

"ভগবানের নিকট কি চাহিব তাহা আমরা জানি না। আমরা কি প্রার্থনা করিব তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কি চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি কিন্তু আসলে আর কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আমার প্রার্থনা কি তাহাই জানি না।

যাঁহারা অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাঁহারা বলেন—একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—

"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও! হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও! হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর!"

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা ঘুচাবো মা তোর দৈন্য

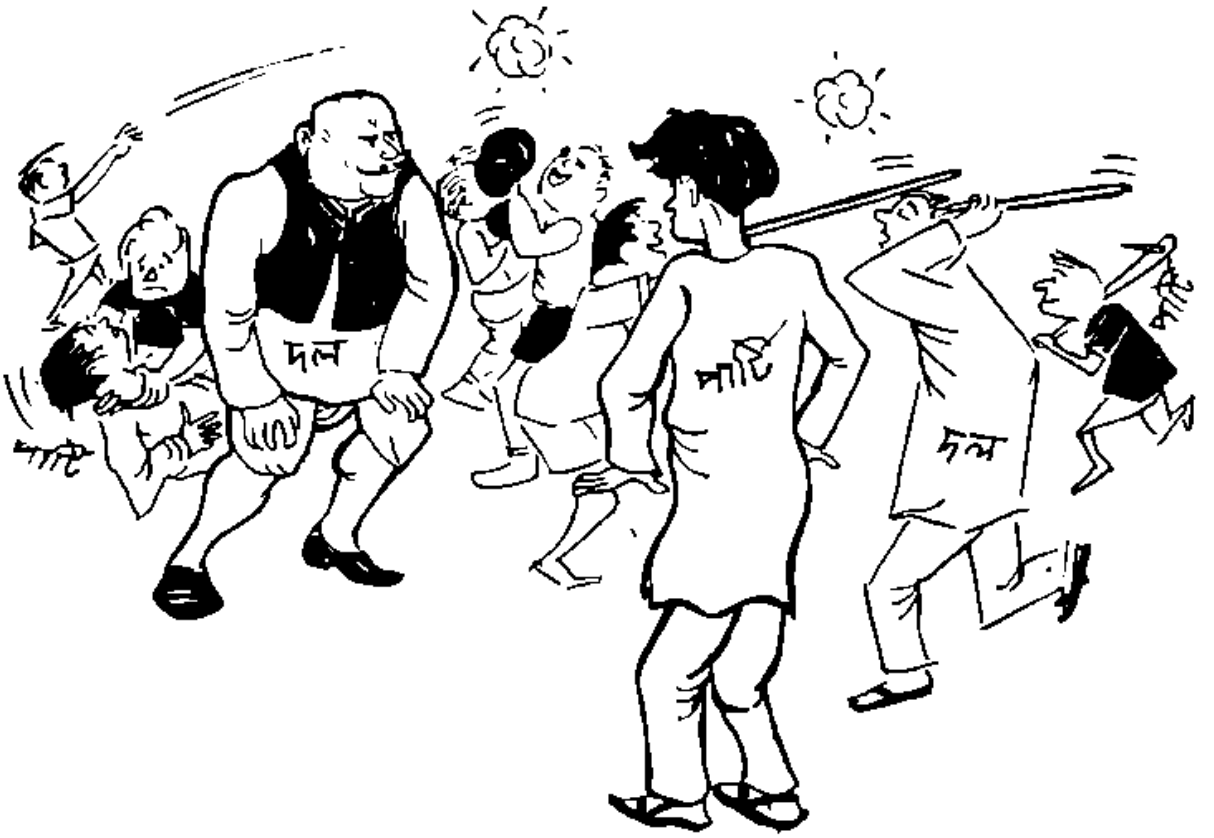

মানুষ আমরা নহি তো মেষ·····

পুরাতন পাতা

স্বদেশী আন্দোলনের কালেই কবি বঙ্কিমচন্দ্রের অমোঘ "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইতে থাকে এবং "বন্দে মাতরম্" জাতীয় জয়ধ্বনিরূপে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে। অল্পকাল মধ্যে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত এবং "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি সমাদর লাভ করিতে লাগিল বাংলার বাহিরে অপরাপর প্রদেশে পর্যন্ত। স্বদেশী আন্দোলনের বেগবান প্রবাহ বর্ষার পার্বত্য নদীর স্রোতের মতো দ্রুতগতিতে সমগ্র বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়া দিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বরের সরকারী ঘোষণায় বিজ্ঞাপিত হইল যে, পরবর্তী মাসের ১৬ই তারিখে বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব কার্যকর হইবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি নেতৃবর্গ এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে,—১৬ই অক্টোবর জাতীয় শোক-দিবসরূপে পালন করা হইবে। সেই দিনের কর্মসূচীতে ছিল—সমস্ত দিবস কর্মবিরতি, অরন্ধন, জনসভায় বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং রাখীবন্ধন। ইহাও স্থির হইল যে,—ওই দিন কলিকাতায় ফেডারেশন হল বা অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া অর্থসংগ্রহ করা হইবে। স্থিরীকৃত কার্যক্রম অনুসারে সমগ্র বঙ্গদেশে ১৬ই অক্টোবর জাতীয় শোক-দিবসরূপে পালন করা হইল। কলিকাতার যান-বাহন চলাচল, হাট-বাজার, দোকানপাট, কাজ-কারবার ইত্যাদি সমস্তই বন্ধ ছিল। সহর ও সহরতলীতে কলকারখানাগুলির কাজ চলে নাই কুলি-মজুরেরা অনুপস্থিত ছিল বলিয়া। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় "ফেডারেশন হল" এর ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল,—আপার সার্কুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও মূক-বধির বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী ময়দানে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র নরনারীর এক বিরাট সমাবেশে। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁহাকে একখানি আরাম-কেদারায় শোয়াইয়া সভাস্থলে বহিয়া আনা হইল। সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুঃখের বিষয় যে,—অখণ্ড বঙ্গভবনের নির্মাণকার্য পরিকল্পনা অনুসারে যথা সময়ে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। নানা কারণে বহু বৎসর পর্যন্ত সেই কার্যটি হাতে নিতে পারেন নাই ফেডারেশন হল সোসাইটির পরিচালকবর্গ। স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ-জয়ন্তীর বৎসর (১৯৫৫ খ্রীঃ) ফেডারেশন হল-এর (২৯-২-১ আপার সার্কুলার রোডে) নির্মাণ-কার্য শেষ করাইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করা হইয়াছে।

ভিত্তি-স্থাপন অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পরে বিশাল জনতা বাগবাজারে পণ্ডপতি বসুর বাড়ীর দিকে যায়। সেই বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে "জাতীয় ধন-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক নরনারীসমবেত হইয়াছিল। মহানগরীর আকাশ-বাতাস মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইতেছিল সম্মিলিত কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে। বিকাল প্রায় পাঁচটা হইতে রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত ধন-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ-সংগ্রহের কার্য চলিল। সেই সময়ের মধ্যে সংগৃহীত হইল পঁচিশ হাজার টাকা। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইবে বলিয়া নেতৃবর্গ বুঝিতে পারেন নাই। অর্থ-সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সহস্র দানেচ্ছু ব্যক্তিকে নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পঁচিশ হাজার টাকার প্রায় সমস্তই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভেই বাংলার জনগণ-চিত্তে স্বদেশ-প্রেমের কি উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল! স্বদেশী আন্দোলনের আদি পর্বের কাহিনী এইখানেই সংক্ষেপে শেষ করিলাম।

বনছায়া কন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : পরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুধীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। যে কিনা বড়লোকের মেয়ে দরিদ্রকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুধীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। পরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুধীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর পরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কাছে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুধীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুধীরকে চাকরি দিল। সুধীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুধীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুধীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। পরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুধীরের সঙ্গে তার বিয়ের ফলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুধীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন পরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুধীরের ঘরে গিয়ে উঠল।

যাবার আগে ছোটবৌদি শাশুড়ীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে সধবা, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক শীযুষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ঘর্ষিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপট্যেরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আসক্ত হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মধ্যে সুকঠিন কাঠকার্যে —অবধারিত হত টুঁটি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর রাজি হল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্বাসন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে ছদ্ম লুকোই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ।

বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিলনা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের ঘষা থেকে ফুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের সর্ত পালন করল না। বিরোধ ঘুমায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হলনা। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার ফি বাবদ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশিকরে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবনি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার ফলে চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে

অনুরোধ করল হিমাংশুকে ঘরে তাকে খেতে উচ্চতর পদে বহাল করিয়েদিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্ধীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্ধীপের অন্তরলোকে ঝড় শুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শান্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় রুদ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্ধীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল— এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা তালা লাগাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্ধীপেরই দ্বারস্থ হল। দেখল সন্ধীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্ধীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্ধীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবচেতনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুবীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযূষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযূষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুবীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুবীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। নেহাৎপক্ষে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের না বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবজ্যোতি তাকে নিউডন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে। দেবজ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুবীরকে খবর দিল। সুবীর উদাসীন রইল। তার বিতৃষ্ণার কারণ পীযূষ দত্তের কাছে গিয়েছিল 'অবচেতনা'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে আর পীযূষ তাতে রাজি হয়নি যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার ঝগড়া হয় আর সুবীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্ধীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে হিমাংশু গিয়ে শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু সন্তানের সন্ধান বেঁচে নেই।]

তিন

নিউ ইয়র্ক মার্সি হোমে যে ডাক্তার বনছায়ার ভার নিল সে কমলেশ চ্যাটার্জি।

'কী, চিনতে পারেন?'

এখন একমাত্র যাকে বনছায়া চিনতে সে হচ্ছে যন্ত্রণা। আতীব্র অভিশাপ। ডাক্তারের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে শুধু বললে, 'আমাকে বাঁচান।'

'সব ঠিক করে দিচ্ছি।' প্রগাঢ় কণ্ঠে বলিষ্ঠ আশ্বাস দিল কমলেশ। বললে, 'এবার আর আমার হাত থেকে আপনার ত্রাণ নেই।'

'আমি তো শুধু যন্ত্রণার থেকে ত্রাণ চাই। আপনি তো যন্ত্রণা নন।'

'কি জানি কী। কিন্তু আপনার সিঁথিতে সিঁদুর দেখছি, তা হলে সেই ভাগ্যবান ভদ্রলোককে বিয়ে করতে পেরেছেন?'

'না, না, বিয়ে নয়'—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল বনছায়া : আমার শরীরের এই অবস্থায় ঐ ছলনার দরকার ছিল।'

'ছলনা!'

'কিন্তু বুঝতে পাচ্ছেন আমার এই যন্ত্রণা ছলনা নয়। এর বিহিত করুন।'

তা আর বলে দিতে হবেনা। এমনিতে আর যাই হোক, ডাক্তার ডাক্তার। মৃত্যুর মুখে পড়া অসহায় মানুষের সে পরিত্রাতা। কন্যার চরিত্র না দেখে সে রোগের চরিত্র দেখে। আহত ডাকাতকে নিরাময় করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজ আরাম পেল কিনা তা তার দেখবার নয়, রুগী আরাম পেলেই সে কৃতার্থ। ডাকাত তো তুচ্ছ, যে খুনী ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে, সে যদি ধরা পড়তে গিয়ে আহত হয় তার সেই ক্ষতকেই মৃত্যুর কারণ করে তোলা হয় না, তাকে আপ্রাণ চেষ্টায় ও চিকিৎসায় সুস্থ করে তুলতে হয় যাতে তাকে নির্বিঘ্নে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতেই ঝোলানো চলে।

তাই সর্বপ্রযত্নে বনছায়াকে খালাস করতে তৎপর হল কমলেশ।

কিন্তু মনে হচ্ছে গর্ভের সন্তান মৃত। সেই অনুমানের কথা আগে থেকে প্রচার করা বিপজ্জনক। রুগিণী চরম হতাশায় তলিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ডাক্তারি অনুমানের বাইরে অলৌকিক কিছু ঘটে যেতে পারেনা এমনও কিছু অসম্ভব নয়। এদিকে রুগিণী টেঁসে গেল, ওদিকে জলজীয়ন্ত ছেলে।

স্বাভাবিক ভাবে প্রসব যখন হচ্ছে না তখন ঠিক হল অপারেশন করা হবে।

বনছায়া নার্সকে বলল, 'অপারেশানের আগে ডাক্তার চ্যাটার্জিকে একটা কথা বলতে চাই।'

নার্স কমলেশকে ডেকে দিল। বুঝল কথাটা শুধু ডাক্তারকেই, নার্সকে নয়। তাই নার্স ইচ্ছে করে ঘুরে রইল। কান পাতল না।

কমলেশ ঘরে ঢুকেই বললে, 'আর ভয় কী! এই তো সব রেডি করে ফেলছি।'

বনছায়া অস্ফুট স্বরে বললে, 'একটু কাছে আসুন।'

এতক্ষণে বুঝি কমলেশই ভয় পেল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী হয়েছে?'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।'

'কী, বলুন।'

'বলুন থাকবেন।' সজল চোখে মিনতি ভরে তাকাল বনছায়া। দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও হাসির একটি ক্ষীণ রেখা ফোটাল : 'আমি তার জন্যে আপনাকে একটা কি দেব।'

কি-র কথা শুনে কমলেশ আশ্বস্ত হল—তা হলে নেহাৎ চিকিৎসার কথা। কি পেয়ে চিকিৎসাতে কোন ডাক্তার কবে কোথায় অসম্মত হয়েছে।

'কেন, আর কাউকে দেখতে হবে? আর কোনো অপারেশান?'

'আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমিই একমাত্র ক্লী।'

কমলেশের কেমন যেন ঘোর লাগল। বললে, 'আপনাকে আবার কী করতে হবে?'

'কী করতে হবে তা আমি জানিনা। আপনার হাতে ছুরি, আপনি জানেন, আপনি করবেন।'

'কী করব?'

'তাই করবেন যাতে আমাকে পেটে আর সন্তান ধরতে না হয়। যাতে আমি বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারি।'

'কী সর্বনাশ!'

'বহু সন্তানের মায়া মা, তাদের তো এমনি আকছার অপারেশন হচ্ছে। আমার এক সন্তানই এক সন্তানই যথেষ্ট। আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে। আমার আর দরকার নেই।'

'কিন্তু আপনার এই এক সন্তানই যদি বেঁচে না থাকে।' কমলেশ চাইল ব্যাপারটা বুঝতে।

তাতেও ভ্রূক্ষেপ করল না বনছায়া। বললে, 'না থাক। আমি তো থাকব। আমার কাজ, আমার কেরিয়র, আমার স্বাধীনতা তো থাকবে।' বলেই আবার স্বর অন্যরকম করল : 'আমার সমস্যা আপনি বুঝবেন না, এখন পারবও না বোঝাতে। আপনি শুধু আমাকে মুক্ত করে দিন, শুধু এই বন্ধন থেকে মুক্ত নয়, চিরকালের দাসত্ব থেকে মুক্তি—'

'কিন্তু—আমার—'

'আপনি একদিন আমার কাছে ভবন কি চেয়েছিলেন। সে দিন তা দিতে পারিনি। এখন অপারেশনের পর অনায়াসে দিতে পারব।'

যন্ত্রণার না অনুভবের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ভুল বকছে রুগিণী! কমলেশ ছটফট করে উঠল। বললে, 'কি-এর জন্যে ভাববেন না। আপনাকে যেন মুক্ত করে। আপনি প্রস্তুত হোন।'

এত বড় একটা রুগী, মৃত্যুর দুয়ারের কাছে এসে বসেছে, অথচ কেউ একটা আত্মজন নেই। যে লোকটা এই দুষ্কৃতের কর্তা সে বুঝি পলাতক! কিন্তু নার্স যে বলছে, মহিলা বিবাহিত, তবে তার স্বামী কই? তার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? স্বামী কি বিরূপ, বীতশ্রদ্ধ? স্ত্রীর সঙ্গে কী এমন ঝামেলা যে এই বিপদের মুহূর্তে এক পা এগিয়ে আসবে না? বাপের বাড়িই বা কোথায়? চার দিকে কেন এত সব নিষ্ঠুরতার দেয়াল?

ডাক্তারের অত ইতিহাসে দরকার নেই। তার সামনে এক প্রত্যক্ষ সত্য যন্ত্রণাবিদ্ধ বিপন্নাপন্ন মানুষ আর তার কর্তব্য সঙ্কটমোচন।

কমলেশের কেমন মায়া হল। ঠিক করল মেয়েটাকে সে ষোল আনা মুক্ত করে দেবে।

নার্সকেও ইশারায় ডাকল বনছায়া।

একটা ফোন-নম্বর দিয়ে বললে, 'দয়া করে এই নম্বরে একটা ফোন করে দেবেন।'

'আপনার বাড়ি ?'

'না। একজনের অফিস।'

'কী নাম বলব ?

'বলবেন সন্দীপ সেন।'

'ঐ বুঝি আপনার স্বামী ?'

হাঁ-না কিছু বললে না বনছায়া। বললে, 'শুধু বলবেন মিউ ডুনে আমি ভর্তি হয়েছি, আমার অবস্থা ভালো নয়।'

টেলিফোনে সন্দীপ সেনকে পাওয়া গেল।

'আপনি মিউডুন নার্সিং হোমে এখুনি চলে আসুন। বনছায়া বসুমজুমদার আপনাকে ডাকছেন।'

'আমাকে ?' সন্দীপের মর্মমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠল : 'কেন ?'

'তাঁর অবস্থা ভালো নয়। তাঁর অপারেশন হবে। রক্ত লাগতে পারে। আপনি তৈরি হয়ে চলে যেরি করবেন না।'

রক্তের নদী উত্তাল হয়ে উঠল। তখুনি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সন্দীপ। বাড়ি গিয়ে একমুঠ টাকা নিল পকেট ভরে। মিউডুনের দিকে যাওয়া করলে।

বনছায়ার প্রতিষ্ঠার জন্যে সে যতটুকু পারে তার শক্তি ও শ্রম নিবেদন করবে তা আর বেশি কথা কী। তাকে যে ডেকেছে তাকে যে বিশ্বাস করেছে এই তো তার চরম সাফল্য।

বাড়িতে দেবজ্যোতিই ফোন করেছিলেন।

ধরল বড়দা, কৌশিক।

'কে বনছায়া ?'

'আপনাদের বাড়ির মেয়ে।'

'সে একদিন ছিল, এখন আর নেই। কেন, তার কী হয়েছে ?'

খবরটা সংক্ষেপে জানালেন দেবজ্যোতি।

'তাতে আমরা কী করব ?'

'কিছু করবেন না। মরে গেলেও শোক করতে বলছি না। শুধু মানবিকতার খাতিরে জানানো দরকার বলে জানালাম।'

'কেন তার কীর্তিমান স্বামী কী করছে ?'

'তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'বা, খাসা ! তাই বুঝি এ বাড়ির দিকে নজর পড়েছে ? বলবেন, এ বাড়ির দরজা বন্ধ।'

'বলব। কিন্তু বাড়ির যিনি সত্যিকার মালিক সেই সরসিজবাবুকে যদি খবরটা দেন—'

'আপনি কে ?'

রিসিভার রেখে দিলেন দেবজ্যোতি।

সরসিজ, কেন কে জানে, অতটা নির্মম হবার মত জোর পেলেন না। ছোট বউকে ডাকলেন, যদি সম্ভব হয় একবার গিয়ে দেখে এস। আর যদি এখানে আসতে চায় আপত্তি কোরো না। বোলো আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি।

শাশ্বতী এক ফাঁকে বেরিয়ে গেল সৌভদ্রকে নিয়ে।

'চলো, বাবা বলেছেন ঠাকুরঝিকে নিয়ে আসতে—' উৎসাহে উজ্জ্বল হল শাশ্বতী।

'আগে সুস্থ হোক, ছাড়া পাক, তবে তো আসবে।' সৌভদ্র দুর্বল কণ্ঠে বললে।

'তা তো বটেই। চলো বুকে আসি কোন তারিখ আন্দাজ আসতে পারবে।'

নার্সিং হোমে পৌঁছে খবর পেল, অপারেশন ঠিকমত হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান এখনো ফিরে আসেনি।

আর সন্তান?

ছেলে হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্ট শিশু। কিন্তু অসাড়। মৃত।

শাশ্বতী দেখল শিশুকে। বুক ঠেলে বিরাট একটা কান্না চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল। তাবল এ দুঃখ বনছায়া সহ্য করবে কী করে?

তারপর এক সময় ভোরের দিকে বনছায়ার জ্ঞান এল। উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলে শুনতে ও কান পেতে দেখতে চাইল চারপাশে। কিন্তু চারপাশে মনে হল অন্ধ স্তব্ধতা, বধির অন্ধকার।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল নার্সের দিকে।

নার্স দুঃসংবাদটা জানাল মৃদুভাবে, স্নেহ মিশিয়ে। পরে দীপ্তকণ্ঠে বললে, 'আপনাকে যে বাঁচানো গিয়েছে এটাই ডাক্তার চ্যাটার্জির কৃতিত্ব, আর সকল কৃতিত্বের মূল কারণ, ভগবানের আশীর্বাদ।'

চোখ বুজল বনছায়া। ক্লান্তিতে? না শান্তিতে? হতাশায়? না কৃতজ্ঞতায়?

'একবারটি দেখবেন?'

'দরকার নেই।'

কিন্তু আইনঘটিত দরকার আছে। প্রসূতির নিঃসংশয় হওয়া দরকার সে কী বস্তু প্রসব করেছে—জীবিত না মৃত, পুত্র না কন্যা! শেষে এমন কোনো প্রশ্ন না হয় যে ছলচাতুরী হয়েছে, বদলাবদলি হয়েছে।

'এই যে দেখুন—'

চোখ না খুলে থাকতে পারল না বনছায়া। দেখল নার্সের দুবাহুর বেষ্টনীর মধ্যে বুকের উপর কাপড়ে জড়ানো সুন্দর একটি শিশু। কেমন বড়সড় হয়েছিল দেখতে, মাথাভরা কালো কুচকুচে চুল, কপাল নাক চিবুকের ছাঁদটি কেমন অপরূপ! কিন্তু চোখ দুটি বোজা। সমস্ত মিলিয়ে একটা করুণ শূন্য।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও কান্নাকে আটকাতে পারল না বনছায়া।

একবার ইচ্ছে করল স্পর্শ করে। হয়তো সেই স্পর্শেই, সেই একটুমাত্র স্পর্শেই ছেলে বেঁচে উঠবে, চোখ চাইবে, জীবনের প্রথম অভ্যর্থনায় কেঁদে উঠবে আনন্দে।

দুর্বল হাত বাড়াবে-বাড়াবে করেও বাড়াল না বনছায়া। তার স্পর্শের মধ্যে সেই ইচ্ছা ছিল কই? কোথায় ছিল সেই প্রার্থনা, সেই প্রাণের আরাধনা? আসলে সেই তো অপরাধী। সেই তো হত্যাকারী। তার ইচ্ছাকৃতভাই তো অনপনেয় অপরাধ। আর তার জন্যেই তো এই শাস্তি।

শুধু সে একাই এই হত্যার প্রণেতা? আর কারু সহকারিতা ছিল না? সে দুর্বৃত্ত কোথায়? তার শাস্তির ব্যবস্থা কী?

সে তো উঁকি মেরে একবার দেখতেও এল না। দেখতেও এল না কত আশায় কত যত্নে পাঁজরে পাঁজরে সে নিজের হাতে ছিঁড়ে দিয়েছে!

'যাও, ওকে সরিয়ে নাও—' চেঁচিয়েউঠল বনছায়া: 'যাহোক ওর গতি করো। ডাক্তারবাবু কোথায়?

হঠাৎ কখন কপালে কার স্নেহস্পর্শের আভাস পেল বনছায়া। স্বপ্নের মত মনে হল। মনে হল বুঝি বৃষ্টি নেমেছে, তারই ছোঁয়া নিয়ে বাতাস এসে লাগছে তার কপালে। বনছায়া চোখ মেলল। 'এ কী, তুমি? ছোট বউদি? তুমি কী করে খবর পেলে?'

'বাড়িতে কে কোন করেছিল—'

'তবু এলে যে বড়?'

'বাবা পাঠিয়ে দিলেন।'

'বাবা?'

'হ্যাঁ, বললেন, তোমাকে যেন বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।'

স্তব্ধ হয়ে একটু কী ভাবল বনছায়া। বললে, 'আমার আর ফেরা নেই।'

'কেন?'

'ভেবেছিলাম ছেলে কোলে নিয়ে জয়ীর মত ফিরব।' কিন্তু, চোখের উদ্গত অশ্রু সবলে ঠেকাল বনছায়া: 'নিয়তি অন্যরকম ভেবেছে। তাই ব্যর্থ হয়ে সর্বস্বান্তের চেহারা নিয়ে ফিরতে পারব না।'

'আহা, সর্বস্বান্ত হতে যাবে কেন?' শাশ্বতী সান্ত্বনা দিতে চাইল: 'কত মেয়েরই তো ডেলিভারিতে প্রথম সন্তান মারা যায়, তারপর আবার তাদের ছেলে হয়—'

'আমার আর হবে না।'

'তা তুমি বলো কী করে? সব ভগবানের হাত।'

ক্ষীণ রেখায় বনছায়া একটু হাসল। মনে-মনে বললে, সব ডাক্তারের হাত।

'আচ্ছা সুবীরবাবু কোথায়? তাঁকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।' শাশ্বতী উদ্বেগ প্রকাশ করল।

'তাঁর এসব ব্যাপারে কোনো ইন্টারেস্ট নেই।'

'সে কী,' শাশ্বতী চমকে উঠল: 'তোমাদের মধ্যে কোনো চিড় ধরল নাকি?'

'এত বড় প্রেম—' নিজেই নিজেকে বাধা করল বনছায়া: 'এর মধ্যে কি কোনো চিড় ধরতে পারে? এ একেবারে স্বর্গের জিনিস।'

'তাহলে ছাড়া পাবার পর যাবে কোথায়?' শাশ্বতীর কণ্ঠে আবার উদ্বেগ ফুটল।

'সে যেখানে হোক চলে যাব। আমার জন্যে ভেবো না। আমি সমস্ত তার থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, আমি একেবারে একা—আমি এখন যেখানে খুশি না কেন চলে যাই।'

এরপর শাশ্বতী আর কী বলবে? হাতখানি ধীরে তুলে নিল কপাল থেকে। মুখখানি ম্লান করে পাশ থেকে সরে গেল। গৌতম তো ঘরেই ঢোকেনি। নিচে গিয়ে গৌতমকে বললে, 'ঠাকুরঝির ছাড়া পেতে এখনো ঢের দেরি আছে।'

মনের গভীরে আতঙ্কে শিউরে উঠল শাশ্বতী। ভাবলে এবার নাজানি আরো কী ভয়াবহ দুঃসংবাদ আসে।

তা যাই আসুক, তোমরা চঞ্চল হয়ো না। আমাকে ছেড়ে দিয়েছ, আমাকে ছাড়া-ই থাকতে দাও। কী ভাগ্যিস ছেলেটা বাঁচেনি। বেঁচে থাকলে কী ভীষণ সমস্যায় পড়ত বনছায়া! চাকরি, সাহিত্য, শিশুপালন—নিদারুণ নাজেহাল হয়ে যেত, মাঝখান থেকে সাহিত্য বাদ পড়ে যেত। আর স্বামী যেখানে

প্রতিকূল সেখানে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাও দুঃসাধ্য হত। তারপর কত যে পার্টনি বাড়ত, কত যে বচসা, কত যে কোলাহল, তার লেখাজোকা নেই। নিদ্রা যেত, স্বাস্থ্য যেত, শান্তি যেত—জীবনের প্রতি আর কোন তত্ত্ব আগ্রহই থাকত না। এই যা হয়েছে, বেশ হয়েছে। বেশের চেয়েও বেশি হয়েছে।

এখনবহুদূরবিস্তৃত মুক্ত রাজপথ। এখন কত দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা। আর কে না জানে শুধু সম্ভাবনাতেই জীবন রোমাঞ্চময়।

সেদিন সন্দীপ এসে বনছায়া স্পষ্ট তার হাত ধরল। বললে, 'এখান থেকে ছাড়া পেয়ে আমি কিন্তু তোমার ওখানে গিয়ে থাকব।'

'সে তো আমার আগে থেকেই জানা।' সন্দীপ উদার ভঙ্গি করে বললে, 'তোমার জন্যে সময় উন্মুক্ত থাকবে।'

'কিন্তু আইন বাঁচাতে গিয়ে আমি তোমার টেনান্ট হয়ে থাকব। এক ঘরের ভাড়াটে।' বেশ শব্দ করে হাসল বনছায়া : 'যেন সেলামি দিয়ে ভাড়া নিয়েছি, তুমি আমার নামে রসিদ কাটবে।'

'তারপর একদিন তুমিই নিজের হাতে সে রসিদ ছিঁড়ে ফেলে দেবে।'

'কিন্তু এবার আর ছিন্ন পাণ্ডুলিপি পুনঃনির্মাণ করা যাবে না।'

কী অর্থে বনছায়া কথাটা বলল তা বোঝবার চেষ্টা না করেই সন্দীপ নিজের স্বাভিপ্রায়ে বললে, 'আর পুনঃনির্মাণ নয়, এবার থেকে প্রত্যেহই নবীন রচনা।'

ছাড়া পাবার আগের দিন ডাক্তার চ্যাটার্জির সঙ্গে বনছায়ার নিভৃতে দেখা হল।

হাসি মুখে বনছায়া জিজ্ঞেস করলে, 'আমি ফ্রি তো?'

কমলেশ বললে, 'র‍্যাবসলিউটলি ফ্রি।'

পর মুহূর্তেই করুণ মুখ করে বনছায়া বললে, 'কিন্তু এই রোগা শরীর সারবে কবে?'

'দেখবেন এখন থেকে আস্তে আস্তে একটু-একটু করে মোটা হতে থাকবেন।'

'তারপর আপনার সেই হেভি বিউটি হয়ে যাব। তাই না? তখন—'

'হ্যাঁ, তখন।' কমলেশ সায় দিল।

পর দিন সন্দীপ ট্যাক্সি ডেকে এনে বনছায়াকে তার বাড়ি নিয়ে গেল।

তাদের যাবার সময় কমলেশ দাঁড়িয়েছিল একটুক্ষণ। ট্যাক্সিটা চলে যেতেই সে নার্সকে জিজ্ঞেস করল, 'ঐ ভদ্রলোকই কি পেশেন্টের স্বামী?'

'হবে হয়তো। আর কাউকে তো দেখিনি যাওয়া-আসা করতে। খরচ-খরচাই তো ওই করলে। রক্তের বেলায়ও ওই। তবে নামে যেন কী একটু গোলমাল আছে। অফিস থেকে স্বামীর নাম যা পাওয়া গিয়েছিল এ ভদ্রলোকের সে নাম নয়। তা নাম মানুষের দুটো তিনটে থাকতে পারে।' নার্স নিজের মনেই হাসল এক লহর।

কমলেশ নিস্পৃহের মত বললে, 'থাক গে, মরুক গে। আমরা ডাক্তার, আমাদের তত্ত্বকথায় নীতিকথায় কাজ কী।'

[ক্রমশঃ]

আদর্শনিষ্ঠ চিত্রশিল্পী ঃ মেসনেয়ার

অমিয়েব রুদ্র

বাপের সামনে এসে দাঁড়ালো ছেলেটি। বয়স বছর আঠারো। দু'চোখে যেন স্বপ্নের ঘোর। মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের রেখা। বাপের দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে বললে, আমায় তিনশো টাকা দাও। আমি আর কখনো তোমার কাছে কিছু চাইব না। আর যতদিন না, নাম করতে পারি, টাকা রোজগার করতে পারি, ততদিন এ বাড়ীর চৌকাঠ আর মাড়াবো না।

ছেলের কথা শুনে বাপ তো স্তম্ভিত! বলে কি ছেলে! তিনশো টাকা নিয়ে সে কোথায় যাবে, কি করবে, ঐ সামান্য টাকায় কত দিনই বা তার চলবে?

বাপ ছেলেটিকে ধমক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। ছেলেটিকে বিলক্ষণ চিনেছেন তিনি। যেমন জেদী, তেমনি একরোখা। যা ধরবে তা না করে ছাড়বে না। বাধা দিলে অনর্থ করবে। কাঁদবে। মাথার চুল ছিঁড়বে। খাবে না, উপোস করে থাকবে। ঐ একটিমাত্র ছেলে। বাপ মায়ের আদুরে দুলাল যাকে বলে। কিন্তু লেখাপড়ায় মন নেই। খালি ছবি আঁকে। এ ছেলেকে নিয়ে হবে কি? অনেকদিন পরে একটু যেমন ধমক ধামক করেছেন, ব্যস, ছেলে এসে বললে, দাও তিনশো টাকা, বাড়ী ছেড়ে চললাম!

বাপ জানতেন ছেলে তাঁর নির্বোধ নয়, আর তার ছবির আঁকার হাতও রীতিমতো ভাল। তাই তিনি ছেলের প্রেরণাকে রোধ না করে একটি সর্ত দিলেন। বললেন, ছেলে যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোন বড় শিল্পীর কাছে শিক্ষানবিশী জোটাতে পারে তাহলে তার বাবা বুঝবেন যে হ্যাঁ ছেলের এলেম আছে আর তখন তিনি তাকে ঐ টাকাটা দিতে এক মুহূর্ত দেরী করবেন না।

ছেলে বললে, বেশ, তাই হবে। আমি এখন চললাম।

এই বলে বেরিয়ে গেল!

ফ্রান্সের এক অসাধারণ চিত্রশিল্পীর এই হল জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় ঘটনা।

উনিশ শতকে এই শিল্পীর নাম শুধু নিজের দেশে নয়, সারা পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ। দুই আর্নেস্ট মেসনেয়ার চিত্রশিল্পীরূপে অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু এই খ্যাতি সহজে আসেনি। তাঁর শিল্পীজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কঠোর সংগ্রাম আর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে, অন্য কোন সাধারণ মানুষ হলে হয়ত সে অবস্থার সামনে বেশি দিন দাঁড়াতে পারতো না। কিন্তু মেসনেয়ারের মনোবল ছিল অসীম, সাহস ছিল দুর্জয়, অধ্যবসায়

ছিল অদম্য, আর ছিল অপ্রতিরোধ্য প্রতিভার দীপ্তি, যার বলে তিনি শেষ পর্যন্ত সকল বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে জগতের কাছে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন।

১৮১৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী লিয়নস শহরে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনো না করে ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর বাবার কাছে রিপোর্ট পাঠালেন, ছাত্রটি এমনিতে সবদিকেই ভাল, কিন্তু লেখাপড়ায় মন নেই। বসে বসে খাতার পাতায় হিজিবিজি ছবি আঁকে, ছাত্রটিকে নিয়ে তিনি কিছু মুসকিলেই পড়েছেন।

বেসনেয়ারের মা ছিলেন ভাল পটুয়া, আর্টের সমঝদার ছিলেন তিনি। তিনি ছেলেকে উৎসাহ দিলেন। সেই সময় মায়ের কাছ থেকে সেই স্নেহশীল সহানুভূতি না পেলে বেসনেয়ারের জীবন বোধ হয় অন্য পথে প্রবাহিত হত। কিন্তু অকস্মাৎ সেই মা মারা গেলেন।

চোখে অন্ধকার দেখলেন বেসনেয়ার। বাপ ছেলেকে এক আত্মীয়ের কাছে প্যারিসে পাঠিয়ে দিলেন। আর শিল্পচর্চার বিলাস নয়। লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে, চাকরি বাকরি করে টাকা রোজগার করতে হবে।

কিন্তু নতুন জীবনের আবহাওয়ায় তাঁর মন বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল। কিছুদিন পরে বাড়ী ফিরে এলেন। মনের মধ্যে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, শিল্পী তিনি হবেনই, মায়ের আশা আর আশীর্বাদকে ব্যর্থ হোতে দেবেন না।

ছবি আঁকতে লাগলেন। একটা একটা ক'রে অনেকগুলি ছবি জমা হ'ল। শিল্পকর্ম হিসাবে সেগুলি যে কতখানি উঁচুদরের হয়েছিল সে জ্ঞান তাঁর ছিল না। ছবিগুলি বেচবার ইচ্ছায় তিনি একদিন সেগুলি নিয়ে এক নামকরা স্টুডিওর হাজির হলেন। স্টুডিওর কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে খুব অল্প পয়সায় সেগুলি কিনে নিল। নিজের নাকল্যে চরিতার্থবোধ করে বেসনেয়ার সেই খবর তার বাবাকে জানালেন এবং তারপর যে কথা বললেন, তা এই রচনার শুরুতে দেওয়া হয়েছে।

বাপের মর্ম শুনে শিক্ষকের খোঁজে তো বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথায় সেই শিক্ষক, সেই গুরু, যিনি এক উন্মেষউন্মুখ প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবেন?

সে-সময়ে শহরের সবচেয়ে নামকরা শিল্পী ছিলেন জুলস পশিয়ে। বেসনেয়ার তাঁর কাছে গেলেন। পশিয়ে বললেন, ছবি এঁকে জীবিকা অর্জন করতে চাও? আমার কোন ছেলে থাকলে তাকে জুতো সেলাইএর কাজ করতে বলতাম, তবু ছবি আঁকতে বলতাম না।

কিন্তু বেসনেয়ার নাছোড়বান্দা। তাঁর কাজগুলো একবার দেখুন না পশিয়ে!

পশিয়ে দেখলেন! মুখ তুলে বললেন, সত্যিই এসব ছবি তোমার আঁকা?

উত্তরে বেসনেয়ার সেইখানে বসে সদ্য সদ্য একটি ছবি এঁকে দেখালেন। তাঁর পিঠ চাপড়ে পশিয়ে বললেন, আজ থেকে তুমি আমার ছাত্র হলে। ছাত্রের কাছে গুরু যে শিগগিরই কাৎ হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। তোমার বাবাকে বলে যাও গে যাও।

এমনি নাটকীয় ভাবেই বেসনেয়ারের শিল্পীজীবন আরম্ভ হয়েছিল।

পশিয়ের কাছে কাজ নিয়ে বিপুল উৎসাহে তিনি তাঁর শিল্পসাধনায় মগ্ন হলেন। গুরু আর শিষ্য যেন হরিহর আত্মা। গুরুর উদার দাক্ষিণ্যে শিষ্যের কাজ দিন দিন লাভ উৎকর্ষ করতে লাগল। তাঁর ছবির চাহিদা বাড়তে শুরু করল। যে স্টুডিওর তিনি তাঁর প্রথম ছবিগুলি বিক্রী করেছিলেন তারা তাঁকে ডেকে

পাঠিয়ে আরও ছবির অর্ডার দিল। একটি ছোট প্রদর্শনীতে তিনি যেসব ছবি দিয়েছিলেন তার সবগুলিই বিক্রী হয়ে গেল, চারিদিকে তাঁর নাম শোনা যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে মেসনেয়ারের বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে যে নূতন সংসার পেতে ছিলেন সেখানে মেসনেয়ারের জায়গা হল না। তাঁর বাবা ছেলের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে দিলেন এবং একটি মাসিক বৃত্তি দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। সেদিক থেকে মেসনেয়ারের বাবা অবিবেচক ছিলেন না তা মানতেই হবে এবং মেসনেয়ার নিজেও তা স্বীকার করেছেন।

১৮৩৮ সালে তিনি বিবাহ করলেন। এক সতীর্থের ভগ্নীর সঙ্গে তাঁর ভাব হয়েছিল। তাকেই তাঁর দরিদ্র ঘরের ঘরণী করে নিয়ে এলেন। পিতৃদত্ত সামান্য কিছু মাসোহারা আর ছবি বিক্রীর অনিশ্চিত আয়—তারই উপর নির্ভর করে নবদম্পতী তাঁদের যে নীড় রচনা করলেন, তার মধ্যে না ছিল কোন বিলাস-ব্যসনের আয়োজন, না বা কোন আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ। প্রতিদিন উদয়াস্ত কঠোর সংগ্রামের জীবন।

কিন্তু সেই সংগ্রামের মধ্যে, সেই অবিচ্ছিন্ন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে মেসনেয়ার তাঁর শিল্পীজীবনের আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। শত প্রলোভনেও শিল্পের মর্যাদাকে কখনো ক্ষুণ্ন করেন নি। আত্মসম্মান অটুট রেখে এমনভাবে দারিদ্রকে মহিমান্বিত করে তোলার দৃষ্টান্ত খুব কম মানুষের জীবনেই দেখা গেছে, যেমন দেখা গেছে এই শিল্পী দম্পতীর জীবনে। আদর্শ সহধর্মিনী পেয়েছিলেন মেসনেয়ার।

শেষ পর্যন্ত ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজার তুল্য সম্মান আর অনেক অর্থও সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন। তাঁর নানা রকমের নতুন ধরণের অলংকরণ, বইএর প্রচ্ছদ, অশ্বসজ্জা, নিসর্গ দৃশ্য, মানুষ আর জন্তুর ছবি, সে সময়ে ফরাসী চিত্রশিল্পজগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

যাকে বলে ছবির অ্যানাটমি, অর্থাৎ ছবির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পেশীর সুবিন্যস্ত সমতা—তা তাঁর শিল্প কর্মে আশ্চর্য সঙ্গতির সঙ্গে ফুটে উঠতো। সেজন্যে তিনি যে পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় স্বীকার করতেন তা বড় কম নয়।

ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি আঁকবেন। ছবি নিখুঁত করবার জন্যে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন। একটা যন্ত্রচালিত ট্রলির উপর বসে সেই ট্রলি চালাতে লাগলেন আর তাঁর সহিসকে বললেন, সেই চলন্ত ট্রলির পাশ দিয়ে একটি ঘোড়াকে দৌড় করাতে। ট্রলির পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটতে লাগল, আর ট্রলির উপর বসে মেসনেয়ার সেই ধাবমান ঘোড়ার ছবি আঁকতে লাগলেন।

১৮৭৯ সালে ইতালীর সঙ্গে ফ্রান্সের যখন যুদ্ধ বাধলো তখন রণক্ষেত্রে চলে গেলেন তিনি। যুদ্ধের ছবি আঁকতে হবে। পদে পদে বিপদ। প্রাণহানির আশংকা! কিন্তু সংকল্পে বিচ্যুত হলেন না মেসনেয়ার। রণস্থলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে কয়েকটি অতুলনীয় এবং বিস্ময়কর যুদ্ধের ছবি আঁকলেন। ছবি দেখে সবাই ধন্য ধন্য করল। কিন্তু তারা জানলো না, এই ছবিগুলি আঁকার জন্যে শিল্পী কীভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন এবং কী ভাবে একাধিকবার অতি অল্পের জন্যেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি একটি ছোট জমিদারি খরিদ করেন এবং নিজের নতুন বাড়ির বড় ঘরে নানা পুরনো জিনিষ, ছবি, আসবাব, বাসন এবং ঐতিহাসিক মূল্যসমৃদ্ধ জিনিষের সমাবেশ করেন। শুধু চিত্রশিল্পীই ছিলেন না তিনি। ছিলেন জীবন-রসিক, ছিলেন বন্ধু ও অতিথি বৎসল, উদার প্রাণ, সর্বজন প্রিয়। ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। চৌকস অভিনেতা ছিলেন। বিভিন্ন ধরণের ভূমিকায় তিনি তাঁর অভিনয়-ক্ষমতার যে পরিচয় দিতেন তা দর্শকদের [illegible] বিস্মিত করত।

কাজ পাগল মানুষ ছিলেন তিনি। ছবি আঁকার কাজ যখন থাকতো না, তখন নিজের লাইব্রেরীতে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের বই, ইতিহাস আর শিল্পের গবেষণা-মূলক রচনা পড়ে তা থেকে নোট লিখতেন, প্রবন্ধ রচনা করতেন।

১৮৭৫ সালে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি কাজে অপটু হয়ে পড়লেন। অসুস্থতার মধ্যেও বন্ধু ও হিতৈষীদের সঙ্গে ছবি ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না। আক্ষেপ করে বলতেন, কত কাজ বাকী রয়ে গেল, আরও কত বড় বড় ছবি আঁকার সাধ মিটলো না।

শেষ সময়ে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলেন। সে-সময়কার সর্বোচ্চ উপাধি "নাইট অফ অনার" তাঁকে দেওয়া হল। তার কিছুদিন পরেই ১৮৯১ সালে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত, আদর্শনিষ্ঠ, বহুৎ জীবনের অবসান ঘটল!

আমার ছবি আঁকা

"আমাদের এই চলমান জীবনের চারপাশে সব কিছুই ঘটেছে, কিন্তু তার সবটাই আমাদের মনে ধরে না, মনে কেবল তা-ই ধরে, যা আমাদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে। তার প্রতিক্রিয়া হয় বিচিত্র। একই রাস্তা দিয়ে বারবার হেঁটে গেলে, একই জিনিষ বারবার চোখে পড়ে না। একটি বিশেষ মুহূর্তের খেয়ায় যা দৃশ্যমান, সেই বিশেষ মুহূর্তের সঙ্গে নিবিড় তাৎপর্যে তা গাঁথা হয়ে যায়—তাকে আর কখনো আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সব চঞ্চল অথচ ধ্রুব মুহূর্তগুলিই শিল্পের অন্তঃসার। সেই বিশেষ মুহূর্তটিকে মনে গেঁথে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। হাতে তুলি তুলে নিলে তারও আবার রূপান্তর ঘটে। তার সার্বজনীন রূপটি ঘুচে যায়, পরিবেশ এবং প্রতিবেশ থেকে তার বিচ্ছেদ ঘটে—নতুন অভিধা, নতুন ব্যঞ্জনায় তা অভিনব রূপ পায়; আমার মনের চোখ তাকে আগাগোড়া বদলে নেয়। তার আদি রূপ নতুন আধার পায়। কিন্তু আটঘাট বেঁধে, সচেতনভাবে এসব কিছুই হয় না, এসব যেন কিরকম ক'রে ঘ'টে যায়, বাস্তবিক তা এক নিগূঢ় রহস্যময় ব্যাপার।

—গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ড

আবার সেই জেল

—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(চার)

পরদিনই বেলা এগারোটায় সোজা গিয়ে হাজির হলাম আমাদের চীফ প্রবেশন অফিসার বি. কে. দাশগুপ্তের অফিসে।

চেম্বারের বাইরেই অঞ্জনের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা। আবেগের আতিশয্যে কোন কথা না বলে শ্রীমান একটা প্রণামই করে ফেলল, তারপর সহাস্যে বলল, দাদা, কাল আলীপুরে থাকবেন ত? চারটে সাড়ে চারটের সময় যাব। মোগলাই পরোটা আর চিকেনকারি কিন্তু, বুঝলেন?

বলেই হন হন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমি চেম্বারে ঢুকলাম।

দাশগুপ্ত বললেন, সংবাদ সত্য। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারী ফোন করে আই-জিকে বলেছেন, ওরা আপনাকেই সিলেক্ট করেছেন, দু তিন দিনের মধ্যেই চিঠি দিচ্ছেন। এইত, একটু আগে অঞ্জনবাবু থাকতে আই. জি আবার ফোন করেছিলেন।

আবার ফোন কেন?

দাশগুপ্ত মৃদু হাসলেন, আমায় একবার তাঁর অফিসে যেতে বললেন। সমস্যা হচ্ছে, আলীপুরে আপনার জায়গায় কোন্ প্রবেশন অফিসারকে দেয়া হবে। ওখানে কাজকর্ম আপনি যে রকম জমিয়ে তুলেছেন, এমন লোককে দিতে হবে, যিনি সেটা বজায় রাখতে পারবেন। দু নম্বর প্রবেশন অফিসার অবশ্য অঞ্জনবাবুকেই করা হবে, কিন্তু এক নম্বর? তাই আলোচনার জন্য যেতে বললেন। তবে হ্যাঁ, আপনার সিলেকশনের খবরটা এখনই প্রচার করে দেবেন না যেন।

বললাম, ওটা ত ওপেন সিক্রেট হয়েই গেছে। কাল সুধীর বাড়ীতে গিয়ে সংবাদ দিয়ে এসেছে, মিসেস তাকে বখশিস্ পর্য্যন্ত দিয়েছেন। আপনিই নাকি খবর দিতে বলেছিলেন?

তা দিয়েছিলাম। দাশগুপ্ত জবাব দিলেন, তারপর হেসেটা টিপে বললেন, যাক, ভালই হল। অনেক কাল জেলে ছিলেন বন্ধী হয়ে, এবার আবার সেই জেলেই যাবেন বন্ধীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে।

পিয়ন এল, দাশগুপ্ত চা আর বিস্কুট আনতে বললেন।

তবে সেক্রেটেড পোষ্ট, ডাঃগুপ্ত আবার বলতে লাগলেন, তাই আবার আপনার মেডিক্যাল এক্সামিনেশন হবে, আবার পুলিশের এনকোয়ারি—

কেন? ওসব আবার কেন, বাধা দিয়ে বললাম, প্রায় দু বছরের এই চাকরিতে আমার কোনদিন অসুখ হতে দেখেছেন? মেডিক্যাল এক্সামিন ত তার আগেই হয়ে গেছে। পুলিশের এনকোয়ারিও ত হয়ে গেছে। সে ত জানেনই, যা একবার নয়, দু দুবার করার ফলে একসঙ্গে আটজন প্রবেশন অফিসার সিলেক্ট হয়ে আমার জয়েন করতে দুটি মাস দেরী হয়ে গেল।

তাহলে কি হবে, ডাঃগুপ্ত বললেন, এটা নন সেক্রেটেড ছোট চাকরি, আপনাকে পরীক্ষা করেছেন নীলরতন সরকার হাসপাতালের ডাঃ বি. বি. ডাঃগুপ্ত, এবার আপনাকে পরীক্ষা করবে মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল বোর্ড। স্পেশালিস্টরা আপনাকে খরোলি চেক আপ করে যদি বলেন, আন ফাইট, তাহলেই ক্যানকাটা সেক্রেটে আপনার চাকরির নোটিফিকেশন বেরোবে। সেক্রেটেড পোষ্টের তাইই নিয়ম। তবে পুলিশ এনকোয়ারিটা আবার না-ও হতে পারে।

দেখা গেল, সত্যিই তাই। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে হোম (জেনস) ডিপার্টমেন্টের একখানা চিঠি পেলাম। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী জিরেক্টার অব হেলথ সার্ভিসকে একখানা চিঠি লিখেছেন, এখানা তারই অনুলিপি। মর্মার্থ এই: পাবলিক সার্ভিস কমিশন শ্রীবিজেন্দ্র লাল গাঙ্গুলীকে ডিসট্রিক্ট জেল সুপারিনটেনডেন্ট/সেনট্রাল জেল ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। অতএব, এই পদে নিযুক্ত হইবার ব্যাপারে স্বাস্থ্যের দিক হইতে তিনি উপযুক্ত কিনা, মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করাইয়া একটি রিপোর্ট এই বিভাগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।'

সোজা গিয়ে প্রাক্তন রাজবন্দী অন্যতম সুহৃদ চোখের ডাক্তার মণী ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করলাম। সব বললাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মেডিক্যাল কলেজের আই ডিপার্টমেন্টের হেড ডাঃ বিরাজ দত্তের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

পরিচয়! বলেন কি মণীবাবু, বিস্ময় প্রকাশ করলাম, এতখানি বয়স পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও কোনও ডাক্তারের কাছে আমায় যেতে হয়নি। বিরাজ দত্তের নামই শুনিনি কোনদিন। হ্যাঁ যাবে যেতে মেডিক্যাল কলেজের বাড়ীগুলি দেখি বটে, কিন্তু কোনদিন ওতে প্রবেশের সৌভাগ্য হয়নি।

হুঁ মণীবাবু গম্ভীর হলেন, কি ভাবলেন, তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এখনকার চাকরির জন্য কোন্ ডাক্তার দেখেছিলেন?

এন. আর. হাসপাতালের ডাঃ বি. বি. ডাঃগুপ্ত।

হুঁ। মণীবাবু যেন আরও গম্ভীর হলেন। তারপর বলতে লাগলেন, ওঁর নাম বিরাজ দত্ত। আপনার চশমাটাই যদি ঠিক ফিট না করে, তাহলে রিপোর্টে এমনি একটি বেয়াড়া কথা হয়ত জুড়ে দিয়ে বসে থাকবেন, যে সেরো খুলতে আপনাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তারপর সহসা বলে উঠলেন, আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

বলেই বেরিয়ে চলে গেলেন পাশেই ডাঃ সেনগুপ্তের চেম্বারে। দুজনে কি শলাপরামর্শ হল জানিনা। ফিরে এসে বললেন, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে, বি. বি. ডাঃগুপ্ত যে আপনাকে পরীক্ষা করেছিলেন, সে কথা বিরাজ দত্তকে বলবেন না।

যদি জিজ্ঞেস করে বসেন ?

বলে দেবেন, ডাক্তারের নাম মনে নেই।

বললাম, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, মণীবাবু!

মণীবাবু হাসলেন, ডাক্তারদের ব্যাপার, ওটা আর বুঝে কাজ নেই। শুধু মনে রাখবেন, বিরাজ দত্ত যদি ধাপগুপ্তের নাম জানতে পারেন, তাহলেই গোলমাল বাধতে পারে।

তিন পনেরোর মধ্যেই হেলথ ডিপার্টমেন্টের চিঠি এসে গেল: ২৭ জানুয়ারী বেলা দশ ঘটিকায় তুমি মেডিক্যাল কলেজের আই টনসারমারিতে মেডিক্যাল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হইবে। প্রকাশ থাকে যে তোমার যাতায়াতের ব্যয় তোমাকেই বহন করিতে হইবে।

সরকারী চাকরির গেজেটেড পোস্টে যাঁরা ঢুকেছেন, তাঁদেরই মর্মে মর্মে জানা আছে, মেডিক্যাল বোর্ডের পরীক্ষা কাকে বলে! মনে হবে, যেন আপনাকে ধারা যাবার জন্যই একদল স্পেশ্যালিষ্ট ওৎ পেতে অপেক্ষায় আছেন। হাতের রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া মাত্র যেন আপনাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে খেয়ে ফেলবেন।

শুরুতেই একজন বলবেন, এই নিন টেষ্ট টিউব, ঐ বাথরুমে যান, খানিকটা ইউরিন কালেক্ট করে নিয়ে আসুন। আর একজন আপনার পরিহিত সন্ত পাট-ভাঙা সার্ট হাফসার্ট বা বুশ সার্ট খুলিয়ে, আপনার পেন্সি তুলিয়ে আপনার নগ্ন বুকে ও পিঠে সেই পরিচিত চোঙটি লাগিয়ে শুনবেন আপনার হার্ট আছে, না আপনি হার্টলেস, আপনার ফুসফুস ফুটোতে প্লুরিসি, ব্রোঙ্কাইটিস অথবা টি-বির কোনো প্যাচ আছে কিনা, মুখের মধ্যে চামচে ঢুকিয়ে এ্যা-এ্যা করিয়ে দেখবেন, আপনার টনসিল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে কিনা। আর একজন আপনার হাতে রবার ব্যাণ্ড জড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন, আপনার ব্লাড প্রেসার এক্স রাস নাইনটি কিনা। আর একজন আপনার প্যাণ্টের বেল্ট খুলিয়ে বোতাম খুলিয়ে পেট নগ্ন করে এদিক ওদিকে হাত দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখবেন আপনার স্প্লিন ও লিভারের সাইজ কত বড় কিংবা আপনার এ্যাপেণ্ডিকস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কিনা। আর একজন নিয়ে যাবেন তাঁর কক্ষে, আপনার দু কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে বিড় বিড় করে আওড়াবেন, বলুন কি বলছি. ফরটি এইট, সিকসটি নাইন, এইটি ফাইভ, অর্থাৎ আপনি কালা কিনা, তারই পরীক্ষা; তারপর দেখবেন আপনার দাঁতগুলো আসল, না নকল, হাসিটি ঠিক কোরহ্যাম্পের হাসির সঙ্গে তুলনীয় কিনা, আপনার জিভ পরিষ্কার কিনা।

তারপর প্রবেশ করতে হবে স্বনামধন্য ডাঃ বিরাজ দত্তের কক্ষে।

চশমা থাকলে কি হবে, তার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্ব দেখতে পেলে কি হবে, সেটা আবার উনি নিজের হাতে যাচাই করবেন। কবে চশমা নিয়েছেন, কত পাওয়ার, কোন্ ডাক্তার একজামিন করেছিলেন, কোন দোকানের চশমা, প্রথম যা পাওয়ার ছিল, তাই আছে, না বেড়েছে কমেছে, এমনি সব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আপনার মনে হতে পারে ভদ্র বোধ হয় আপনাকে আরেকটা চশমা দেবেন। আজ্ঞে না, তা নয়। এসব হচ্ছে মামুলি প্রশ্ন। এর পরই সুরু হবে আসল পরীক্ষা। ভদ্র আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন দেয়ালের প্রতি। না, না, চোখের ডাক্তারের ওখানে ইংরেজী বর্ণমালা ছাপানো যে বোর্ডখানি দেখতে পাওয়া যায়, তা নয়। দেখতে পাবেন প্রলম্বিত একটি বৃত্তাকার কাঠ, যেন বড় সাইজের ওয়াল ক্লকের তারেল শুধু ঘণ্টা ও মিনিট নির্দেশক দাগগুলি অনুপস্থিত আর কাঠের কাঁটা আছে মাত্র একটি। চশমা যখন নিয়েছেন, তখন চোখের ডাক্তারের ওখানে নিশ্চয়ই সেই বোর্ডখানা পড়তে হয়েছে। যদি বর্ণগুলো আপনি কণ্ঠস্থ করে এসে

এখানেও সেই বোড পেয়ে চান করে না ফেরতে পেরেও গড় গড় করে মুখস্থ বলে যান, তাহলে যে ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করে যাবেন ! সেই ফাঁকির ফাঁক বন্ধ করে রাখবার জন্যই ঐ কাঠের চাকার ব্যবস্থা। জেনেছিলাম, এটা ডাঃ বিরাজ দত্তেরই মৌলিক আবিষ্কার।

এবার দত্ত বার বার কাঁটাটা এদিক ওদিক নানা দিক ঘুরিয়ে ঘরে জিজ্ঞেস করবেন, হইচ ওয়ে? আপনিও তার হাতের তর্জনী কাঁটাটির মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জবাব দেবেন, দিস ওয়ে। দিস ওয়ে।

কিন্তু এর পরেও আপনার নিষ্কৃতি নেই। ফিনিশিং টাচ দেবার জন্য যে স্পেশ্যালিষ্ট মহোদয় এতক্ষণ শুধু পেতে অপেক্ষা করছিলেন, এবার তিনি এগিয়ে আসবেন। হাতে কোন যন্ত্র নেই, এমন কি, কণ্ঠে ঝোলানো ষ্টেথেসকোপের সেই মালাখানিও নেই। কপালকুণ্ডলাকে কাপালিক যেমন পুরুষ কণ্ঠে আদেশ জানিয়েছিল, আমাকে অনুসরণ কর, কতকটা তেমনি ধরণেই আপনাকে বলবেন, আসুন আমার সঙ্গে।

এসে প্রবেশ করলেন একটি পার্টিশনের আড়ালে। টেবিলের মত উঁচু, বেঞ্চির মত চওড়া অথচ দুধে ধোওয়া বালিশবিহীন একখানা তক্তপোষ। উনি বললেন, শুয়ে পড়ুন। আপনি শুয়ে পড়লেন। তারপর উনি বেশ সহজভাবেই বলবেন, এটা খুলুন। ওটা খুলুন। খুললেন। ওটাও খুলতে হবে। খুললেন। হ্যাঁ, ওটাও বাদ চলবে না। বেশ, তাও খুলে ফেললেন। এমনি করে খুলতে খুলতে খুলতে খুলতে অবশেষে দেখতে পাবেন, খোলেন নি শুধু একটি আবরণ, আপনার জন্মদিনের পোষাকটি। তারপর উনি আপনাকে এপাশ ওপাশ ফিরিয়ে, চিৎ করে, উপুড় করে, পা দুটো মুড়ে, ছড়িয়ে, ফাঁক করে আপনার শরীরের নানা নিভৃত স্থান টিপে-টুপে পরীক্ষা করবেন। আপনি হয়ত চোখ বুঁজে ইষ্ট নাম জপ করছেন, আপনার কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আপনার বুক হাপরের মত ওঠা-নামা করছে, কিন্তু আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত স্পেশ্যালিষ্টের নির্লজ্জ হাতখানিতে অনুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচের আভাস পাবেন না।

তারপর এক সময় পরীক্ষা শেষ হবে। স্পেশ্যালিষ্ট প্রস্থান করবেন এবং আপনি আদমের স্বর্গরাজ্য থেকে আবার ধূলার ধরণীতে ফিরে আসবার সুযোগ পাবেন।

আমিও পেলাম, যেমন করে প্রত্যেকটি গেজেটেড অফিসার পেয়েছেন।

ডাক্তারী পরীক্ষার গনগনে আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এও এক ধরণের হার্ডল রেস বলা যায়।

প্রথম হার্ডল, আমার বেশী বয়স।

দ্বিতীয় হার্ডল, পাবলিক সর্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ।

তৃতীয় হার্ডল, মেডিক্যাল বোর্ডের পরীক্ষা।

তিনটি হার্ডলই পেরোতে পেরেছি কিনা, এখনও বলতে পারি না। দুটো ক্লিয়ার করেছি সত্য, তৃতীয়টির ফলাফল জানা যাবে ডাঃ বিরাজ দত্তের গোপন রিপোর্ট আসবার পর।

কিন্তু এরই মধ্যে দাবানলের মত ছেলে ছেলে এই সংবাদ রটে গেছে, আসছেন, একজন আসছেন।

সোজা কথা নয়, সরাসরি সুপারিনটেনডেন্ট ! প্রমোশন পেয়ে যাঁরা সুপার হতে পারতেন, তাঁদের সুযোগ দেওয়া হল না এবং এই প্রথম সরাসরি সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হচ্ছে। স্বভাবতঃই তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ ঘুমায়িত হয়ে উঠল এবং অনেক বৈঠক ও সলাপরামর্শের পর অনন্তই অফিসারদের মুখপাত্র-

অপর একজন ডিস্ট্রিক্ট জেলের সুপার ও একজন সেন্ট্রাল জেলের জেলার, তদানীন্তন কারামন্ত্রী পুরবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। একখানি দৈনিক পত্রিকায় তাঁদের দাবী সমর্থন করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। কিন্তু কোন ফল হল না। মন্ত্রী মহোদয়া জানিয়ে দিলেন, নিউ ব্লাড ট্রান্সফিউশনই মন্ত্রীসভার অনড় সিদ্ধান্ত।

আমিই সেই প্রথম নিউ ব্লাড!

একদিন গিয়েছিলাম আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। সঙ্গে ছিলেন প্রবেশন অফিসার সুশীল বাগচী। আমার শূন্য স্থানে তাঁকেই নিয়োগ করা হবে স্থির হয়েছে। তাই আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাজ বুঝে নিচ্ছেন। সুশীল বাবু দীর্ঘদিন বহরমপুর বোর্ষ্টাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। জেলের কর্মচারীরা তাঁর পরিচিত।

জেল অফিসে এক ঘর লোকের মধ্যে উৎসাহের আতিশয্যে বলে উঠলেন, ও মশয়, শুনতে আছেন? এবার সুপার হইয়া যিনি আসতে আছেন না, ইনিই সেই ডি. এল. গাঙ্গুলী। চিন্ রাখেন।

কেউ কোন রা করলেন না।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, সরাসরি নিয়োগে আমার আগমন তাঁদের কারুরই পছন্দ নয়। আগন্তুককে তাঁরা সন্দেহের ও বিরক্তির চোখে দেখছেন। আমি অবশ্য এসব ভ্রূক্ষেপ করিনা। কাজ যদি নিরপেক্ষভাবে করতে পারি, নির্ভুল সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে পারি, নিষ্ঠা ও সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি, তাহলে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই সংশয়াকুল নীরব সহকর্মীরাই তখন আনন্দমুখর হয়ে উঠবেন, খুশী মনে স্বীকার করবেন যে, তাঁদের আশঙ্কা অমূলক, তাঁদের দ্বিধা ভিত্তিহীন।

সেই অনাগত সুদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলাম।

অবশেষে ১৯৫৮ সালের ২১শে মার্চ পেলাম সেই বহুপ্রত্যাশিত নিয়োগলিপি। ২০শে মার্চের আদেশে বলা হয়েছে যে, আমায় ডিস্ট্রিক্ট জেল সুপারিন্টেনডেন্ট নিয়োগ করা হল। তবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত আমায় বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্টের পদে কাজ করতে হবে। আমি যেন যথাসম্ভব সত্বর চাকরিতে যোগদান করে জয়েনিং রিপোর্ট পাঠাই।

আমার বেশী বয়সের প্রথম হার্ডলটি অনায়াসে পার হয়ে এলাম ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, শেষ পর্যন্ত এই সহজ ধাপটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। প্রায় বারো বছর চাকরি করবার পর রিটায়ার করে যখন পেন্সনের জন্য আবেদন জানালাম, এ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল তখন এই সরকারী ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, নিয়োগের সময় আমার এক বছর তিন মাস বেশী বয়সটা 'মাপ' করে দেয়া হয়নি। যা নিয়োগের পূর্বে বা অব্যবহিত পরেই করা প্রয়োজন ছিল, গভর্ণমেন্ট সেটা করলেন তেরো বৎসর পর অর্থাৎ আমার রিটায়ারেরও এক বৎসর পর। ফলে, আমার পেন্সন চালু হতে বৎসরাধিক কাল দেরী হয়ে গেল।

শাসনযন্ত্র চলে না কে বলে? চলে, অবশ্যই চলে, তবে তার গতি গরুর গাড়ির মতও নয়, শম্বুকের মত।

আই. জি. ডাঃ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে আমার প্রবেশন অফিসারের চাকরি থেকে সত্বর রিলিফ করে দেবার অনুরোধ জানালাম। তিনি পাঠালেন চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বললেন যে, আমি আলীপুরে কাজ করছি বলে তিনিই রিলিফ করে দেবার মালিক।

গেলাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তিনি টুরে গেছেন, তাই দেখা করলাম অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কে. জি. বোসের সঙ্গে। নিয়োগপত্র পাবার পর তখন কয়েক দিন পার হয়ে গেছে। শুনে তিনি তখনই অফিস সুপারকে আদেশ দিলেন যে, পরদিন পুলাকেই যেন আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

১৯৫৮ সালের ২রা এপ্রিল অপরাহ্নে আমার রিলিফ করা হল।

লোজা গেলাম তখনই হুমহুম সেন্ট্রাল জেলে।

সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই বলাতে গেটের সিপাই রিপ দিল। আমার পরিচয় তখনও ওদের জানা ছিল না। ভাবল, বাইরের লোক, বড় সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ এস. সি. মজুমদার ডেকে পাঠালেন।

বড় গেট নয়, সিপাই ছোট উইকেট গেটটা খুলে দিল। নিয়ম হচ্ছে, সেরেস্টেড্ অফিসারের জন্য বড় গেট খুলতে হবে। কিন্তু ওরা আমার পরিচয় পায়নি।

গেটে একখানা রেজিষ্টার আছে, যাওয়া ও আসার সময় টাকরা তাতে স্বাক্ষর করেন সময় উল্লেখ তা দেখে গেট সিপাই তার রেজিষ্টারেও লিখে রাখে কে কখন এল, কখন গেল।

রেজিষ্টারে আমি নামের পরে আমার নতুন ডেজিগ্নেশনটা জুড়ে দিলাম, ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট হুমহুম সেন্ট্রাল জেল। তারপর সুপারের কক্ষে ঢুকলাম।

মজুমদার সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, অফিস আওয়ার্স সকাল সাতটা থেকে একটা। আপনার বিকেল চারটা থেকে যতক্ষণ প্রয়োজন। তবে আমি যে ক'দিন টালিগঞ্জ থেকে আসব, সে ক'দিন আর বিকেলে না এলেও চলবে। আমার কোয়ার্টারে ডেপুটি সুপার রজনীবাবু আছেন। আগামী মাসের ৪ তারিখ রিটায়ার করছেন। বিরাট দোতলা বাড়ি, ইচ্ছে করলে আমি এখনই এসে নীচের তলায় অনায়াসে থাকতে পারি।

মজুমদারের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তার মধ্যেই গেট সিপাই রেজিষ্টারে লেখা আমার ডেজিগ্নেশনটা দেখেছে এবং উইকেট গেট খোলার জন্য ভিড় কেটে তৎক্ষণাৎ সংবাদটি চালু করে দিয়েছে। তাই সুপারের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, অমনি গেটে কর্তব্যরত সিপাই ও জমাদারেরা খট করে বুটের আওয়াজ তুলে স্যালুট করল এবং ডেপুটি সুপারের অফিসে যখন ঢুকলাম, সমস্ত স্টাফ উঠে দাঁড়াল। আমি কারুর দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে ঢুকলাম ডেপুটি সুপারের চেম্বারে।

দেখি, আমার চেয়ার দখল করে বসে আছেন অত্যন্ত সুপুরুষ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বুঝতে দেরী হল না যে ইনিই রজনী চক্রবর্তী।

আমায় অভ্যর্থনা জানিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আসুন, আপনার চেয়ারে আসুন।

বাধা দিলাম, না না, আপনিই বসুন। আপনি যতদিন আছেন, ঐ চেয়ারেই বসবেন আর আমি বসব এপাশে, আপনার কাজ দেখব ও শিখে নোব।

নানা আলাপ আলোচনা হতে লাগল। রজনীবাবু আমায় জেল ও জেল প্রশাসন সম্বন্ধে নানা তথ্য বিবৃত করে জ্ঞান দান করতে লাগলেন।

অকস্মাৎ ঐ হাতে ভৃত্য প্রবেশ করল। সুদৃশ্য ট্রের ওপর সাদা ধবধবে ডিমার ডিস, ডিসের ওপর সাজানো লুচির পাহাড়। রীতিমত মজবুত লুচি। ট্রেনিং সেপাইয়ের মত পাতলা, তাদের গায়ে তখনও

জবজবে ঘি। পাশেই খুরীকৃত আলুর চচ্চড়ি। চমৎকার পেঁয়াজের গন্ধ পাচ্ছি। দুখানা চাপটা গোলাকৃতি বাদামী রংয়ের বেগুণ ভাজা। কাপের সরসার সঙ্গে সরপা মেলানো টিপট, দুধার পট ও মিল্ক পট।

রজনীবাবু চা ঢালতে লাগলেন।

হেসে বললেন, চলে আসুন না নীচের তলায়। সেই টালিগঞ্জ থেকে রোজ অফিস করতে আপনার ভারী কষ্ট হবে। আর না হয় আমিই নীচে নেমে যাচ্ছি, আপনি দোতলায় আসুন। আমি আর কদিন, মাসখানেক। তবে তারপরেও কয়েক দিন থাকতে হতে পারে। বাড়ীটা শেষ হতে মাস দুয়েক লাগবে বোধহয়।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বাড়ী করছেন ?

এই ত, রাস্তার ওপারেই, রজনীবাবু জবাব দিলেন. যে দোতলাটা কিনেছি, তার ভাড়াটেকে তুলতে পারছি না। মাদ্রাজী অফিসার, বেশী রেটে ভাড়া দেয়, তাই আর বেশী জোর করতেও ইচ্ছে করে না। ওর পাশের জমিতে তাই নিজের পছন্দমত বাড়ী তৈরী করছি।

হেসে বললাম, তাহলে আপনার দুখানা বাড়ী বলুন।

রজনীবাবুও হাসলেন, তা একরকম বলতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গেট সিপাই স্যালুট করে হুড় হুড় শব্দে প্রকাণ্ড গেটটা খুলে দাঁড়াল।

আমি রেজিষ্টারে প্রস্থানের সময় লিখে সই করে গেটের বাইরে এলাম।

গেটের বাইরে সঙ্গীন-চড়ানো বন্দুক কাঁধে ফল-ইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরো রিজার্ভ গার্ড, পনেরো জন সিপাই, দুজন জমাদার আর তাদের সম্মুখে খোলা তরবারি হাতে চীফ হেড ওয়ার্ডার।

চীফ হেড ওয়ার্ডারের মুখোমুখি দাঁড়াতেই সে আদেশ দিল, রিজার্ভ গার্ডস, প্রেজেন্ট—আর্মস।

তরবারি কপালে ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ তা মাটির দিকে নীচু করে ধরল। এক পা এগিয়ে এসে বলল, সব ঠিক হ্যায়, হুজৌর।

আমি বললাম, ঠিক হ্যায়। সব ব্রেক অফ কর দেও।

চীফ হেড ওয়ার্ডারের আদেশ শোনা গেল, রিজার্ভ গার্ডস, ব্রেক-অফ।

সবাই রাইট টার্ণ করল, আমায় স্যালুট করল, তারপর লাইন ভেঙ্গে চলে গেল।

ছুটে এল একজন সিপাই, হুজৌর, আপকো লিয়ে রিকশা লায়া।

সাইকেল রিকশায় উঠে বসলাম।

রিকশা যশোহর রোডের দিকে ছুটল।

[ক্রমশঃ

যে কাহিনী চিরকালের

মেঘনাথ বধ : মাইকেল মধুসূদন

শুভঙ্কর রায়

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন এক আশ্চর্য প্রতিভা। যেমন বিস্ময়কর তাঁর কাব্যশক্তি তেমনি বিচিত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিদ্রোহী তিনি জীবনে, বিদ্রোহী তিনি তাঁর রচনায়। মেঘনাদ বধ কাব্যের মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহী মনের পরিচয় প্রতিভাত. এই কাব্যে তিনি রামায়ণের মুখ্য চরিত্রগুলির নতুন মূল্যায়ন করেছেন। মেঘনাদ বধ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রূপে পরিগণিত, সেই কাব্যের অন্তর্গত কাহিনীকে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল।

। এক ।

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে !"

রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কাপুরী আক্রমণ করেছেন। ঘোর যুদ্ধ বেধেছে। রাজসভায় স্বর্ণ সিংহাসনে লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ বসে আছেন। দ্বারদেশে রক্ষী স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বহু পাত্র মিত্র নতমস্তকে বসে আছেন। সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে কিংকরীরগণ চামর ঢোলাচ্ছে। ছত্রধর রাজার মাথায় হেমছত্র ধরে আছে।

রাজার সামনে জরজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে মকরাক্ষ নামে একজন ভয়দূত। সে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ এনেছে। রাবণের বীরপুত্র বীরবাহু যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

এই সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রাবণ বললেন, রে দূত ! তোর সংবাদ যেন রাত্রের স্বপ্নের মতো ! যার বিক্রমে দেবতারা পর্যন্ত পরাস্ত হোত, তাকে ভিখারী রাম যুদ্ধে বধ করল !

রাবণের মনে হল, এই কাল-মহাসমরে বুঝি রক্ষা নেই. বুঝি রাম তাঁকে শেষ পর্যন্ত সবংশে নিধন করবেন !

তা নাহলে, কুম্ভকর্ণের মতো অপরাজেয় বীরশ্রেষ্ঠ তাই কি মারা পড়ত ?

রাবণের আরও মনে হল, অগ্নিশিখারূপিনী সীতার জন্যই আজ সোনার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হোয়ে যাচ্ছে, একে একে দীপমালা নিভছে, সব অন্ধকার হোয়ে আসছে।

রাবণের বুক চিরে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। তাঁর ইচ্ছা করতে লাগল, কনকলঙ্কা ছেড়ে নিবিড় অরণ্যে গিয়ে বিরলে বসে তিনি মনের জ্বালা জুড়োবেন।

মহাবলী রাবণের অবোধ প্রাণ আজ আর কোন সান্ত্বনাই মানছে না। মন বারবার মৃত পুত্রের কথা শোনবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠছে।

ভগ্নদূত যুদ্ধের বর্ণনা দিতে লাগল। কী অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গেই না বীরবাহু যুদ্ধ করেছে। কেউই তার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। সবাই তার বিক্রমে রণে ভঙ্গ দিচ্ছিল। অবশেষে স্বয়ং রামচন্দ্র তাকে আক্রমণ করলেন। সেই প্রচণ্ড আক্রমণ বীরবাহু প্রতিরোধ করতে পারল না। সম্মুখ-যুদ্ধে অশেষ বীরত্বের সঙ্গে রাবণ-তনয় বীরবাহু সৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছে।

ক্ষাত্র গর্বে রাবণের বুক ফুলে উঠল। অমাত্যদের নিয়ে প্রাসাদ শিখরে উঠে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দর্শন করলেন। দেখলেন রামচন্দ্রের অসংখ্য সৈন্য লঙ্কাপুরী ঘিরে ফেলেছে। পূর্বপ্রান্তে নীল, দক্ষিণে অঙ্গদ, উত্তরে সুগ্রীব এবং পশ্চিম দিকে স্বয়ং রামচন্দ্র। তাঁর পাশে লক্ষ্মণ, হনুমান এবং বিভীষণ।

গভীর অরণ্যে ব্যাধেরা যেমন সকলে মিলে সিংহীকে বেড়াজালে আবদ্ধ করে তেমনি ভীষণ শত্রুর দল আজ লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের চারধারে অগণিত মৃতদেহ।

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখে রাক্ষসরাজ বিচলিত বোধ করলেন। ধীরে ধীরে প্রাসাদ শিখর থেকে নেমে আবার সভাগৃহে এসে বসলেন। মহাশোকে সারা সভাতল স্তব্ধ।

সহসা সেই স্তব্ধতার বুক ভেদ করে শোনা গেল এক মায়ের করুণ কান্না।

আলুথালু বেশে সভায় এসে দাঁড়ালেন বীরবাহুর মা, রাণী চিত্রাঙ্গদা! রাবণের কাছে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, বিধাতা আমায় একটি মাত্র রত্ন দিয়েছিলেন, আমি জানি, সেই রত্নটিকে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। বল, সে কোথায়?

রাবণ কি উত্তর দেবেন? শুধু বললেন, রাণী, আজ লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করবার জন্যে স্বয়ং বিধাতা বুঝি তাঁর হাত বাড়িয়েছেন।

চিত্রাঙ্গদা বললেন, কেন এই যুদ্ধ? কেন এই সর্বনাশ? রামচন্দ্র তো সাধ করে যুদ্ধ করতে আসেন নি।

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।

শোকে, ক্ষোভে, অভিমানে রাবণের অন্তর দুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, তিনি নিজেই যুদ্ধে যাবেন। বললেন, এ পৃথিবীতে রাম এবং রাবণ দু'জনের স্থান নেই। সুতরাং আজ এই পৃথিবী অ-রাবণ বা অ-রাম হবে।

ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে নিজের হাতে বধ করেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ মহানন্দে প্রমোদ কাননে গিয়েছেন।

কিন্তু সহসা এ কী দুঃসংবাদ!

রাম মরেন নি? তিনিই তাঁর প্রিয় ভাই বীরবাহুকে হত্যা করেছেন?

এই সংবাদ শুনে ইন্দ্রজিৎ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। স্ত্রী প্রমীলা কাতর হোয়ে পড়েছিলেন

তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তিনি এখনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবেন। শত্রুকে বিনাশ করে শিগগিরই আবার ফিরে আসবেন।

প্রমোদ কানন থেকে ইন্দ্রজিৎ গেলেন পিতার কাছে এবং যুদ্ধে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

কণেকের জন্যে রাবণের বুক কেঁপে উঠল। তবুও পুত্রের প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করলেন। বললেন, যদি তোমার যুদ্ধে যেতে একান্ত ইচ্ছা, তাহলে যুদ্ধে যাও। কিন্তু তার আগে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, ইষ্টদেবের পূজা কর। তোমাকে আমি সেনাপতি পদে বরণ করলাম। সন্ধ্যা হোয়ে এলো। কাল সকালে তুমি যুদ্ধ যাত্রা করো।

। দুই।

প্রমোদ কাননে বসে প্রমীলা ইন্দ্রজিতের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হোয়ে উঠেছেন। রাত হল, এখনো তিনি ফিরছেন না কেন? সখীদের বললেন, চল, সকলে মিলে গিয়ে দেখি।

প্রমীলার কথায় তাঁর প্রিয়সখী বাসন্তী বললে, কিন্তু প্রমোদ কানন থেকে প্রাসাদে যাবে কেমন করে? রাঘবের সেনাদল লঙ্কাপুরীর চারদিক ঘিরে ফেলেছে? কেমন করে অবলম্ভ প্রাসাদে ঢুকবে?

তার কথা শুনে ক্রোধভরে প্রমীলা বললেন, তুই কি বলছিস বাসন্তী! পর্বত গুহা ছেড়ে নদী যখন সাগরের উদ্দেশে বেরোয় তখন কার হেন সাধ্য যে তার গতি রোধ করে!

প্রমীলা ভয় পাবার মেয়ে নন, বললেন:

দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুল বধূ
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে?

হলবল নিয়ে বীরাঙ্গনা সাজে ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রমীলা প্রমোদ কানন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রামচন্দ্র সসম্মানে তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন। প্রমীলা নির্বিঘ্নে প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ

। তিন।

লঙ্কাপুরীতে আজ মহোৎসব, দরজায় দরজায় মালা ঝুলছে, জানালায় আলো জ্বলছে, বাড়ীর ছাদে পতাকা উড়ছে। মহা কলরব তুলে রাজপথ প্লাবিত করে জনস্রোত চলেছে। সকলেরই বুকে নতুন আশা নতুন উদ্দীপনা। আজ ইন্দ্রজিৎ লঙ্কেশ্বর রামচন্দ্রকে নিধন করবেন। রাজদ্রোহী বিভীষণ শাস্তি পাবে। স্বর্ণলঙ্কা নিষ্কণ্টক হবে।

এই আনন্দময় লঙ্কাপুরীর এক নিভৃত প্রান্তে অশোকবনের অন্তরাল ঘুচিয়ে সীতাদেবী একা বসে নীরবে চোখের জল ফেলছেন।

দুরন্ত চেড়ীর দল, যারা তাঁকে অহরহ পাহারা দেয়, তারা আজ তাঁকে ছেড়ে উৎসবে মত্ত হয়েছে।

সীতার প্রাণের বেদনা যেন অশোক কাননের পাতায় পাতায় মর্মরিত হচ্ছে, যেন তাঁরই শোকে রাশি রাশি ফুল ঝরে পড়ছে।

রাক্ষসপুরীতে একজন ছিলেন সীতার ব্যথার ব্যথী। তিনি বিভীষণের স্ত্রী সরমা। তিনি এসে সীতার পায়ের কাছে বসলেন। কৌটা খুলে সযত্নে সীতার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন।

সরমা সীতার কাছে এসে তাঁর অপূর্ব জীবন কথা শুনে সান্ত্বনা পান। সীতার স্বয়ম্বরের কথা আগেই শুনেছেন। আজ সীতা-হরণের কাহিনী শুনতে চাইলেন।

সীতা বলতে লাগলেন, গোদাবরী নদীর ধারে কপোত-কপোতীর মত আমরা পরম সুখে ছিলাম। ভোরবেলা পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙতো। পদ্মফুল তুলে চুলে পরতাম। সরোবরের স্বচ্ছ জলে মুখ দেখতাম। আঙিনায় ময়ূর ময়ূরী চরিণ হরিণীর দল খেড়াতে আসতো। পঞ্চবটী বনে এসে আগেকার জীবনের কথা ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম, আমি রাজবধূ, রাজনন্দিনী। কখনো পাহাড়ের চূড়ায় উঠে স্বামীর কাছে বলতাম, আবার কখনো নদীর তীরে খেড়াতাম। মাঝে মাঝে ফুলের সাজে নিজেকে সাজাতাম। তাই দেখে প্রভু হাসতেন, বলতেন, আমি যেন বনদেবী।

বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

একটু পরে আবার বলতে শুরু করলেন, তারপর এলো দুষ্ট সূর্পণখা। সেই থেকে আমার জীবনে অশুভ ছায়া পড়ল। মায়ামৃগের চক্রান্ত জাল ফেলে এলো মারীচ রাক্ষস। আমার অনুরোধে স্বয়ং রাঘব সেই স্বর্ণমৃগকে ধরতে ছুটে গেলেন। তারপর হঠাৎ আর্তনাদ শোনা গেল, 'রক্ষা কর, লক্ষ্মণ, আমায় রক্ষা কর।' প্রভুর কণ্ঠস্বর। লক্ষ্মণ ছিল ঘাবী। আমি জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিলাম। পরক্ষণেই কুটিরের দরজায় এসে দেখা দিল এক সন্ন্যাসী। পিঙ্গল জটা, হাতে কমণ্ডলু। সে ভিক্ষা চাইল। আমার গণ্ডীর বাইরে যেতে মানা। কিন্তু এদিকে অতিথি ফিরে যায়। তাই যেমন গণ্ডীর বাইরে পা বাড়িয়েছি, অমনি দেখি, কোথায় সেই সন্ন্যাসী, এযে রাক্ষস রাবণ। নিমেষের মধ্যে রাবণ আমায় রথে তুলে নিল। তারপর সেই রথ আকাশপথে ছুটে চলল। পশু পাখী, তরুলতা, আকাশ বাতাস, পাহাড় পর্বত সবাইকে আমার বিপদের কথা জানালাম। পথে বীর জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করল। কিন্তু রাবণ জটায়ুর পাখা কেটে ফেললো। রথ চলতে লাগল, ক্রমে নীচে দেখা দিল নীল সমুদ্রের ঢেউএর মালা। রথ লঙ্কায় এসে পৌঁছলো। তারপর থেকে এই বনে আমি বন্দিনী।

কথা শেষ করে সরমার গলা ধরে সীতা কাঁদতে লাগলেন। সরমাও কাঁদলেন। হঠাৎ অদূরে চেড়ীদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা ফিরে আসছে।

ভীতা হরিণীর মতো সরমা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন।

॥ ছয় ॥

লঙ্কার উত্তর প্রান্তে গভীর অরণ্যের মধ্যে চণ্ডীর মন্দির।

লক্ষ্মণ সেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে চলেছেন।

নিরুম রাত।

লক্ষ্মণ একাই যাচ্ছেন। চণ্ডীর পূজা দিতে পারলেই ইন্দ্রজিৎ নিধনে তিনি নির্ভয় হবেন।

পথে দাঁত কড়মড় করে পুচ্ছ নাচিয়ে এক রক্তচক্ষু সিংহ তাঁকে আক্রমণ করল। কিন্তু লক্ষ্মণ নিমেষে তরবারী তুলতেই মায়া-সিংহ অদৃশ্য হল।

তারপর শুরু হল, ঝড়বৃষ্টি, বজ্র বিদ্যুৎ। সাতপালা উপড়ে পড়ল। দাবানল জ্বলে উঠল। মনে হল পৃথিবী যেন এখনি ধ্বংস হবে। কিন্তু লক্ষ্মণ অটল অচল পর্বতের মতো স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝড়ের মায়া মিলিয়ে গেল।

তারপর ক্রমে মধুর সৌরভে বনবনান্ত ভরে উঠল, আকাশে বাতাসে মধুর সুর। সামনেই দেখা দিল চণ্ডীর কেউল।

মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে লক্ষ্মণ মায়ের প্রসাদ লাভ করলেন। পাখীর কলকাকলিতে বনভূমি মুখরিত হল।

এদিকে রাজপ্রাসাদে মেঘনাদের শয়নকক্ষে ভোর হল।

লঙ্কাপুরীতে রণদামামা বেজে উঠল। ঘরে ঘরে পথে পথে শোনা যেতে লাগল, 'জয় মেঘনাদ'।

প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ মা মন্দোদরীকে প্রণাম করলেন, মায়ের আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ হলেই মেঘনাদ যুদ্ধ যাত্রা করবেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল। যুদ্ধ থেকে ছেলে যদি আর ফিরে না আসে!

জননীর পদবন্দনা করে ইন্দ্রজিৎ চলে গেলেন। রাণী পুত্রবধূকে নিয়ে নিজের মহলে প্রবেশ করলেন।

কিছুদূর গিয়ে শিবিকা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে ইন্দ্রজিৎ একাকী পদব্রজে কাননের মধ্যে যজ্ঞশালা অভিমুখে এগিয়ে চললেন।

॥ পাঁচ ॥

রামচন্দ্র আজ বড় উদ্বিগ্ন।

ভয়ংকর যুদ্ধ হবে আজ।

তাঁর মনে পড়ছে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণের জীবনকথা। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পরিজন এবং প্রাসাদের সুখ-শান্তি ছেড়ে লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে এসেছেন, ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে ঘুরছেন। তাই আজ লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠাতে রামচন্দ্রের অন্তর ব্যথায় ভরে উঠেছে।

এদিকে মায়াদেবীর কৃপায় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ অদৃশ্যমান হোয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অদূরে দেখা দিল নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালা।

যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ কুশাসনে ধ্যানে বসেছেন। গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পরণে রক্তাম্বর।

সুরভিত ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। যথাস্থানে সাজানো রয়েছে, পুষ্পপাত্র, ঘৃতঘটী, কোশাকুশি। তাদের মাঝখানে ইন্দ্রজিৎকে দেখাচ্ছে যেন মহাদেবের মত।

ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন গো-শালায় প্রবেশ করে, লক্ষ্মণও তেমনি যজ্ঞশালায় ঢুকলেন।

বীরপদভরে যজ্ঞবেদি প্রকম্পিত হল।

চমকে চোখ মেলে ইন্দ্রজিৎ দেখলেন, সামনেই তাঁর আরাধ্য দেবতা। ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ 'যুদ্ধং দেহী' বলে প্রস্তুত হোয়ে দাঁড়ালেন।

ইন্দ্রজিতের ভুল ভাঙলো। তিনি তখন লক্ষ্মণকে ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করে অস্ত্র নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। ইন্দ্রজিৎ নিরস্ত্র এবং নিরস্ত্রের গায়ে অস্ত্রাঘাত তো কাপুরুষের ধর্ম!

কিন্তু লক্ষ্মণ আজ অত ধর্মাধর্ম বুঝতে চান না। বাঘকে খাঁচায় পেলে কেউ কি ছেড়ে দেয়?

ক্রোধে ও ঘৃণায় ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে হীন কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিতে দিতে কোশা তুলে প্রচণ্ডবেগে লক্ষ্মণের মাথায় ছুঁড়ে মারলেন।

সেই আঘাতে লক্ষ্মণ মাটিতে পড়ে গেলেন

কিন্তু মায়াদেবীর চক্রান্তে বিফল হলেন।

দরজার কাছে যেতেই ইন্দ্রজিৎ দেখলেন, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর কাকা বিভীষণ।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন, কোন্ গুপ্তশত্রু আজ চোরকে সিঁধ কেটে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

ইন্দ্রজিৎ তখন রক্ষোবংশের নাম করে, বিভীষণের মায়ের নাম করে তাঁকে দরজা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন।

কিন্তু বিভীষণ দরজা ছাড়লেন না, জানালেন, তিনি রাঘবের দাস, ধর্মের পথ তিনি পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

তাঁর কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ গর্জে উঠে বললেন:

কোন্ ধর্মমতে···
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে
দিলা জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ···

এদিকে লক্ষ্মণ চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধনুকে টংকার দিলেন। তীক্ষ্ণ শরাঘাতে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতের দেহ থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল। উন্মত্তের মত ইন্দ্রজিৎ শাঁখ, ঘন্টা, পাত্র, প্রদীপ, হাতের কাছে যা পেলেন তাই ছুঁড়ে লক্ষ্মণকে মারতে লাগলেন। কিন্তু মায়াদেবী অদৃশ্য হাতে প্রত্যেকটি আঘাত থেকে লক্ষ্মণকে রক্ষা করলেন।

ইন্দ্রজিৎ সিংহ-গর্জনে লক্ষ্মণের দিকে ধেয়ে গেলেন। কিন্তু মায়ার বলে রাবণথেই স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই সুযোগে লক্ষ্মণ দেবদত্ত মহা অস্ত্র ছুঁড়তেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হলেন।

অমনি থরথর করে পৃথিবী কেঁপে উঠল, দমুভ গর্জন করতে লাগল, রাজসভা মধ্যে রাবণের মাথা থেকে মুকুট খসে পড়ল, আচম্বিতে রাণী মন্দোদরী মূর্চ্ছিতা হলেন, প্রমীলা আপন ভুলে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন, কোলের শিশুরা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল।

এইভাবে লঙ্কার পক্ষের রবি অস্তাচলে গেল।

। ছয় ।

রাবণ রাজসভায় প্রবেশ করে সিংহাসনে বসেছেন এমন সময় দূত এসে সেই নিদারুণ সংবাদ জানালো —বীর মেঘনাদ নিহত হয়েছেন।

গভীর অরণ্যে পশুরাজ সিংহকে ছুরন্ত ব্যাধ কালশরে বিঁধলে সিংহ যেমন গর্জন করে আছড়ে পড়ে, রাবণও তেমনি আর্তনাদ করে সিংহাসন থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

হায় হায় করে মন্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে ধরল।

মূর্ছাভঙ্গের পর উঠে দাঁড়িয়েই রাবণ বললেন, এবার তিনি রণরঙ্গে মেতে প্রাণের জ্বালা জুড়োবেন, তিনি যুদ্ধে যাবেন।

দিকে দিকে সাজ সাজ রব উঠল। সৈন্যদের পদভরে লঙ্কাপুরী টলমল করতে লাগল। পথে পথে পতাকা উড়তে লাগল।

ভীষণ সমরক্ষেত্র।

রাবণ যুদ্ধে এসে আজ রামচন্দ্রকে চান না। তিনি চান লক্ষ্মণকে। কোথায় সেই পুত্রহন্তা কাপুরুষ?

পথের মাঝখানে সুগ্রীব বাধা দিতে গিয়ে আহত হল।

রাবণের সেই ভয়ের মূর্তি দেখে রঘুসৈন্য পালাতে লাগল।

সহসা সামনেই লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন রাবণ। আর যায় কোথায়! ইন্দ্রজিতের নাম স্মরণ করে রাবণ ভীমবেগে শক্তিশেল নিক্ষেপ করলেন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

লক্ষ্মণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

রাঘব-শিবিরে হায় হায় রব উঠল।

জয়ের আনন্দে আত্মহারা হোয়ে রাবণ প্রাসাদে ফিরে গেলেন। চারিদিকে তাঁর জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। আজ মেঘনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, সেই আনন্দে রাক্ষসকুল উল্লসিত হল।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে মুঠো মুঠো তারা ফুটে উঠেছে।

রণক্ষেত্রের মাঝখানে মৃত লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে রামচন্দ্র বসে আছেন।

তাঁর পাশে বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমান, নল, সুষেণ, সুষাণ, সুগ্রীব প্রভৃতি সেনাপতিবৃন্দ।

সকলেই বিষণ্ণ। সকলেই শোকে মুহ্যমান।

প্রাণের ভাই লক্ষ্মণের শোকে রামচন্দ্র ভেঙে পড়েছেন। পাগলের মত বিলাপ করছেন। লক্ষ্মণকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি কোন্ মুখে জননী সুমিত্রার কাছে ফিরে যাবেন? নববধূ উর্মিলাকেই বা কি বলে বোঝাবেন?

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর মহাবীর হনুমান মহৌষধির পাহাড় বহন করে নিয়ে এল।

সেই ওষুধ খেয়ে লক্ষ্মণ বেঁচে উঠলেন।

রাঘবদের শিবিরে মহা আনন্দ কলরব জেগে উঠল।

॥ আট ॥

প্রাসাদ-কক্ষে বসে রাবণ সেই আনন্দ কোলাহল শুনলেন।

লক্ষ্মণ বেঁচে উঠেছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে? বুঝলেন, এই দুর্ধর্ষ শত্রুর অসাধ্য কিছু নেই।

রাবণ ইন্দ্রজিতের শেষকৃত্য সমাপনের জন্য সাত দিনের যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনা করে রামচন্দ্রের কাছে আবেদন পাঠালেন।

রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। সাত দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা হল।

লঙ্কার রাজপথে সারিবদ্ধ জনতা নীরবে চলেছে। শোকযাত্রার পুরোভাগে হাতীর পিঠে ইন্দ্রজিতের শবদেহ।

প্রমীলা চলেছেন পিছনে। তাঁর কপালে সিঁদুর, গলায় মালা, হাতে কংকন।

লঙ্কার পুরবাসীরা পথে পথে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ বা হাহাকার করে কাঁদছে।

এই দৃশ্য দেখে রাবণ আপন বক্ষে করাঘাত করতে লাগলেন।

সমুদ্রতীরে সুগন্ধ চন্দন কাঠের চিতা সাজানো হল। ব্রহ্ম-পুরোহিতগণ মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

সমুদ্রে স্নান করে এসে প্রমীলা গায়ের সব অলংকার খুলে বিলিয়ে দিলেন। গুরুজনদের প্রণাম করলেন। সখীদের মধুর কথায় সম্ভাষণ জানালেন। তারপর হাসিমুখে স্বামীর পাশে চিতায় উঠে বসলেন।

রাবণ চিতার কাছে গিয়ে আপন মনে বললেন, মেঘনাদ, বড় আশা ছিল, শেষ সময়ে তোমার সামনে আমি দু'চোখ বুজবো, তোমার হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে মহাযাত্রা করব। কিন্তু বিধির লীলা বুঝবো কেমন করে? সে সুখ তিনি আমায় দিলেন না।

চিতা জ্বলে উঠতেই সকলে অবাক হয়ে দেখল, আকাশপথে দিব্য রথে চড়ে ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা চলে যাচ্ছেন।

দুধের ধারায় চিতা নেবানো হল। সকলে মুঠো মুঠো ভস্ম কুড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল। তারপর সাগর জলে স্নান করে লঙ্কার নরনারী অশ্রু সজল চোখে ঘরে ফিরে গেল।

করি স্নান সিন্ধু নীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥

[হেমেন্দ্রপ্রসাদ শুধু যে দেশের সমস্যাসমূহ প্রেষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন তাই নয়। বিদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল অপরিমেয়।
গল্পভারতীকে তিনি আজীবন ভালবাসতেন, তাই জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি গল্পভারতীকে তাঁর অপূর্ব রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর শেষ রচনাটি গল্পভারতীতেই প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় তাঁর একটি রচনা পুনঃমুদ্রিত করে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালা ভাষা

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার নানা কার্য্যের জন্য তাঁহার সমসাময়িক সমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছিলেন—"হিমাচল তোমার মত দেশে নাই আর।" কিন্তু তাঁহার নানা কার্য্যের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা (ও সাহিত্য) সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব অনেক সময়ে আমরা লক্ষ্য করিতে অক্ষম হই। সপ্তবর্ণের সম্মিলনে যে আলোক সৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপলব্ধি করিতে পারি না।

তাঁহার জীবদ্দশায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বঙ্গদর্শনে' "তুলনায় সমালোচনা" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকশাল ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দুআনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কশালাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খাঁটি রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া, চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে Queen Victoria ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিক ছাঁটিয়া উপরে 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত' ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দুআনি; মুগ্ধ বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথমে এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান, সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান: সে টাকার নাম 'বেতাল পঁচিশ', সেবার চেম্বার্স বলে একজন বিলাতি মহাজনের নিকট রূপা লইয়া 'জীবন চরিত' নাম দিয়া একটু কম খাদ মিশাইয়া ক'হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পণ্ডিতের পণ্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ খাঁটি রূপা রাখিয়া যান; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলো দিয়া তাহাই 'সীতার বনবাস' নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। এখনও ব্যবসা ছাড়েন নাই। আজি চারি বৎসর হইল সেক্সপিয়রের 'ধোঁকার মজা' বলে খানিক রূপা ছিল, তাহাকেই আপনার সেই মোহর দিয়া 'ভ্রান্তিবিলাস' টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্য যে মৌলিক নহে, তাহাই প্রতিপন্ন করা এই রচনার উদ্দেশ্য। যিনি এই হেয় রচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার উক্তির গুরুত্ব অল্প নহে।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাঙ্গালা গদ্য রচনা যে ভাষায় হইত, তাহার সহিত বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনা করিলে বিদ্যাসাগরের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। —তাঁহার নিকট সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের কৃতজ্ঞতার পরিমাণ উপলব্ধি করা যায়।

বিদ্যাসাগরের পূর্বের বাঙ্গালা সাহিত্য যাহা রক্ষিত হইয়াছে, তাহা প্রায় কবিতা। বাঙ্গালী কবিরা যে সকল রচনা রাখিয়া গিয়াছেন, সে অমূল্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজনারায়ণ বসু বাঙ্গালা কবিতার সকল গতির গঙ্গার গতির সহিত উপমা দিয়াছেন :—

"গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়া হিমালয় প্রদেশে যেখানে প্রকৃতিদেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর কীর্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালী কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডী মহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অপূর্ব কীর্তি কীর্তন করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের সন্নিহিত হইয়া একদিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্যদিকে রামচন্দ্রের কীর্তিস্থান অযোধ্যা প্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণগান করিয়া ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কীর্তিস্থান দিয়া প্রবাহিত যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মধ্য কালে কৃষ্ণার্জ্জুনের গুণকীর্ত্তনকারী কাশীরাম দাসের মহাভারতরূপ সাধানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি কীর্তন করিতেছে।"

এই সকল কবির রচনার ভাষা মনোহর। বিশেষ ভারতচন্দ্রের রচনা যে "কথার তাজমহল" বলা হয়, তাহা অসঙ্গত নহে।

কবিতার ভাষা সুন্দর ও মধুর হইলেও বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা সেরূপ ছিল না। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন :—

"অনেকে মনে করেন যে, রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম গদ্যগ্রন্থ প্রণেতা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহা কর্তৃক বাঙ্গালায় গদ্যগ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্বেও কতিপয় গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের ভাষা ভাল নহে। ইংরাজী ১৮০৬ সালে (১৮০১?) প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয়। উহা রামরাম বসুর দ্বারা কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রণীত হইয়াছিল। রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা অতি কর্কশ। ১৮০৫ সালে কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র প্রকাশিত হয়। উহাও কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে ঐ কলেজের অন্যতম শিক্ষক রাজীবলোচন দ্বারা প্রণীত হয়। ১৮০৮ সালে রাজাবলী ও ১৮১০ সালে প্রবোধচন্দ্রিকা ঐ কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক উৎকল দেশজাত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রবোধ-চন্দ্রিকার অনেক স্থান যে প্রকার উৎকট সাধুভাষায় লিখিত, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে—"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলোদিল সে উচ্ছলদ্বীকরাভ্যাস নির্ঝরাক্তঃ কলাক্ষয় হইয়া আসিতেছে।" ১৮১৪ সালে পুরুষ-পরীক্ষা প্রকাশিত

হয়। উহা বিদ্যাপতি প্রণীত ঐ নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮০০ সালে কলিকাতার তদানীন্তন লর্ড বিশপ টর্ণর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে পুরুষ-পরীক্ষা রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের দ্বারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। ঐ অনুবাদ সাহেব মহলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠার মূল। উল্লিখিত গ্রন্থসকল এমন অপকৃষ্ট ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অন্যায় হয় না। তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের রচয়িতা। ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন রায় কঠোপনিষদ বাঙ্গালা গদ্য ভূমিকার সহিত প্রকাশ করেন: সেই অবধি তিনি অনেক বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সকল এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচার বিষয়ক।"

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।—যিনি বাস করিলেন যশোহরের ধুমঘাটে। একজর বাদসাহের আমলে"—পুস্তকের এই কথাতেই তাহার ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের আরম্ভ এইরূপ—

"এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক ২ রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহাদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায় তদ্ব্যতিরেক তাহাদের বিশেষ বিবেচন কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রসঙ্গ শ্রবণ করে আদ্যপূর্ব্বক না জানিতে কোভিত হয়।"

পরে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার যে "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রকাশ করেন, তাহা রামরাম বসুর গ্রন্থেরই "নব্যভাষায় রূপান্তর"। তাহার আরম্ভ এইরূপ—

"বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রদেশে রামচন্দ্র নামে একজন বৈদ্য কায়স্থ বসতি করিতেন। লোক অধিক উপার্জ্জনের বাসনায় যেন দেশান্তরে যাইয়া থাকে। তিনিও তদ্বাসায় বশীভূত হইয়া তথা হইতে পাঠমহল পরগণায় যাইয়া অবস্থিতি করেন। পরে তথাকার এক সরকারের আশ্রয়াভিশয়ে বাধিত হওত তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমুদায় বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় আবাসে বাস করিয়া রহেন। তাঁহার বালকেরা সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মহরিগিরি কর্ম্ম করিত।"

"শ্রীমহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত"—"লন্ডন মহানগরে ছাপা হইল"

—উহার ভাষার নমুনা :—

"এদেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকার উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। অনন্ত, সেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ। রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস তাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাহারা এ রাষ্ট্রের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক।"

রামমোহনের ভাষাও সুবোধ্য ও সরল নহে। সহমরণের সমর্থকগণের বিরোধিতা করিয়া তিনি হিন্দু নারীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন তাবন্মানাপ্রকার ক্লেশ পায় আর দৈবাৎ ধনবান হইলে যাবৎ দুঃখে কাতর হয় এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্ম ভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয় অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল সহ্য করে। কখন এমন উপস্থিত হয় যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায় তাহারা আপন স্ত্রীর কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদিগের প্রতি হইলে চৌরের তাড়না তাহারদিগকে করে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"প্রাচীনকালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যই হইত। গদ্য রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না; কেননা হস্তলিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা একণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের গদ্য লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমনকি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থ পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহ ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খণ্ডের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিতে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্যাই' বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইত না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। কলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'পিত্তমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ পিত্তমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতগণের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেননা, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' প্রভৃতি রচিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালার শিশুরা যে পুস্তকের সাহায্যে প্রথম শিক্ষা লাভ করিত, তাহা আজ দৃশ্য। সেই শিশুবোধকে বালক-বালিকাদিগকে পত্রলিখনের শিক্ষাদান জন্য যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালীন ভাষার পরিচয় পাওয়া যাইবে—

"সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতা"—"গুণাধিকা, স্বধর্ম্ম পরিচালিকা শ্রীমতী মানতী মঞ্জরী দেবী—"ঐহিক পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তৃক ভবার্ণবনাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য" মহাশয়ের পদপল্লবে নিবেদন করিতেছেন— ঈশ্বর ২

"শ্রীচরণসরসী বিহারিণি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মানতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাগ্রে মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভবিশেষ। পরে নিবেদন, মহাশয় ধনবিলাসে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন, যে কালে এ দাসীর কালরূপসরে পাদক্ষেপণ করিয়াছেন, সে কালাহরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালে কালরূপেতে কিছুকাল সাধনা করা দুই কালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয় কালের সাধনের ধন আদরাদৃত তৃতীয় কালের কালানুসারে কালকূটবোধ হইবে, অতএব বহুকাল কালস্বরূপ মনে উদয় হয় যে, আগতকাল আগতপ্রায়, এইরূপে আগত ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়াগত উদ্ভূত হইয়া অবোগত প্রায় হইয়াছে, অতএব আশ্রং নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সম্বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণ যুগলে স্বানং প্রদানং মুক্ত নিবেদন ইতি। ১৫ই চৈত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের "সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।... প্রাচীন প্রথার নিবন্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইল না।"

বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়কুমার দত্তের কথা বলিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের সহকর্মী লিখিয়াছেন—

"অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয়বাবু কিন্তু দিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রতিভা দীপ্তি পাইয়াছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে মনীষী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের কথার উল্লেখ করিতে হয়—

"আমার মনে হয় যে, যেমন জগৎ সংসারে তেমনি ভাষার মধ্যেও একটা Natural Selection আছে; নহিলে ভাষাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, রামকানাই বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ দর্শা—ইহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই সাহিত্যের এক একটি ভিত্তিপ্রস্তরের গণ্য হইবার উপযুক্ত; তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন; একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল।"

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কি লিখিয়াছেন—

"স্কুলে যতদিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সেদিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্য সাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিস। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া রহিত না।"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায়" স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত এমন একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা পূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, আমি ঐ প্রস্তাব ওরূপ কখনই লিখিতে পারিতাম না।" কিন্তু যোগ্যতমের উদ্বর্তনের নিয়মে বিদ্যাসাগরের ভাষাই স্থায়ী হয়।

সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদের দুর্বোধ্য বাঙ্গালা ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন—"টেকচাঁদ ঠাকুর" জগন্নাথবাসী প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন—

"টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। ইংরেজীতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

তখন বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"মন্থ, মুরশী এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য পোক্তিকে আকুল করিয়া তুলিল।"

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় ভারতচন্দ্রের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নহে। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, উভয়জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা, এবং বিষয় ভেদে একের প্রাবল্য ও অপরের অল্পতাদ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।"

বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ে বিদ্রোহী ছিলেন—দেশের প্রচলিত রাজনীতিক আন্দোলন হইতে বাঙ্গালার প্রবর্ত্তিত জমিদারী প্রথা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে তিনি বিদ্রোহী। তিনি বাঙ্গালা গদ্যে টেকচাঁদের বিদ্রোহের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়—বিদ্রোহ বিদ্যাসাগরের ভাষার বিরুদ্ধে ঘোষিত হয় নাই। তাহার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। তিনি সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু টেকচাঁদ যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া যে লেখ্য ভাষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন,—তাহাই পরবর্ত্তী—উন্নতিপথগামী বাঙ্গালা ভাষার ভিত্তি।

কথ্য ভাষাই বিদ্যাসাগরের কথোপকথনে ব্যবহার্য্য ছিল। কৃষ্ণকমলবাবু বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জনসনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন ডাঃ জনসন সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধহয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্ভীরে Johnsonese ও Latinism ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথার ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সাথে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ঝাপাতুড়ো খাওয়া' (to be confounded), 'হদ্দম মদ্দম,' 'বনিবনাও', 'বিদঘুটে', 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সেই দিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণকমলবাবু বলিয়াছেন—'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে, তিনিও সেই অর্থে সর্ব্বদা ব্যবহার করতেন, অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি 'সমারোহ' ও অর্থে ব্যবহার হয় না—ও কথায় ও অর্থ হইতেই পারে না, উহা একেবারে ভুল।'

বিদ্যাসাগর যে লেখ্য ভাষা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যবহারের কারণ—বাঙ্গালার (অবিভক্ত বাঙ্গালার) নানা জিলার ভাষা নানারূপ চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা ২৪ পরগণার অধিবাসীদিগের সহজ বোধগম্য

নহে। চাকার কথ্য ভাষা নবদ্বীপের ভাষার সহিত এক নহে। ইহা বিবেচনা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালার লোকের ব্যবহার্য্য কথ্য ভাষা স্থিরই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমরা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন—

"অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদমাত্র। কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবা বিবাহ বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বিদ্যাসাগরের স্বকপোল রচনাশক্তি নাই, এমন কথা কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা সমাপনকালে অনেক ইংরেজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর রচিত বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত 'সীতার বনবাসে' ভবভূতির উত্তরচরিত এবং বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়।"

বিদ্যাসাগর কিন্তু মৌলিক রচনায় আত্মনিয়োগ না করিয়া যে বাঙ্গালা ভাষা গঠনের কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহার নিকট সমধিক কৃতজ্ঞ থাকিবে।

• • •

পার্কের কোণের বেঞ্চিটায় বসে কবিতার খাতা পড়ছিলেন আমেরিকান কবি হুইটম্যান। মন তাঁর খুবই চঞ্চল,— বইখানার কি নাম দেওয়া যায়!

ভেবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে তিনি উঠ্‌ব-উঠ্‌ব করছেন এমন সময় একটি বছর দশেকের মেয়ে সেখানে এসে তার ছোট ভাইটির সঙ্গে খেলা করতে লাগল।

ভাইটি কিন্তু বড় দুষ্টু! সে ঘাসের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিদির গায়ে ছুড়ে মারছিল। দিদি রেগে গিয়ে বললে,—ছিঃ নটন, বড্ড নোংরা তুমি,—যে জিনিস কেউ ছোঁয় না,—তা-ই নিয়ে তোমার খেলা!

—কি জিনিস?—দুষ্টু ভাই নটন জিজ্ঞাসা করল।

—কেন, ঐ Leaves of grass।

হুইটম্যান মৃদু হেসে তাঁর কবিতার বইয়ের ঐ নামই দিলেন।

গল্পের নৈবেদ্য ঃ

গল্প নয় সত্য।

অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি

জার্মানির এরফুর্ট অঞ্চলের একটি ছোট জায়গার নাম গ্রোচাইম। হাজার পাঁচেক লোকের বাস। এই ছোট্ট শহরে আছে একটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ১৭৭৩ সালে নির্মিত একটি দুর্গ।

দুর্গটি ছিল ভগ্নপ্রায়। ১৯৪৫ সালের পরে স্থানীয় অধিবাসীরা স্থির করলেন যে দুর্গটি একেবারে ভেঙে ফেলা হোক, কেননা দৃশ্য হিসাবে সেটি খুব মনোরমভিরাম ছিল না।

কিন্তু দুর্গটি ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানালেন ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বললেন যে দুর্গটি ভেঙে ফেলতে হলে প্রচুর খরচ পড়ে যাবে। তার চেয়ে দুর্গটি নতুন করে গড়ে তুললে শহরের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

প্রস্তাব শুনে অনেকেই হেসেছিলেন, বলেছিলেন যে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে খড়ে মৌধ নির্মাণ করার মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হল। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথমে নিতান্তই কৌতূহলী হয়ে দেখতে এসেছিলেন, পরে অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে কাজে হাত লাগিয়েছিলেন।

এমনিভাবে যেখানে ছিল একটি ভাঙা দুর্গ সেখানে গড়ে উঠল গ্রন্থাগার-প্রেক্ষাগৃহ-যন্ত্র ইত্যাদি সমেত বিরাট এক সংস্কৃতি-ভবন।

এই নির্মাণকার্যে ১৫,০০০ মার্ক ব্যয় করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক তহবিল থেকে। স্থানীয় অধিবাসীরা কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যে-পরিমাণ কাজ করে দিয়েছিলেন তার মূল্য ছিল প্রায় ৩১,০০০ মার্ক।

পুতুল নিয়ে

ভবানী মুখোপাধ্যায়

"ও বাবা! তুমি তো ভাই সোজা মেয়ে নও। ওঁর কাছে শুনছিলাম যে একবার নাকি এমন কামড় ওঁর হাতে বসিয়েছিলে যে আজো হাতে তার চিহ্ন থেকে গেছে!"

ঠিক আমার সামনের বার্থে যে বৃদ্ধাটি পান মুখে দিয়ে ডাবার কৌটা খুলছিলেন তাঁর মুখ থেকে এই কথাগুলি শুনে সবিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে তাকালাম।

এমন গোলগাল চেহারা বটে, কিন্তু মোটেই বেমানান নয়। গরুর মত একজোড়া ডাগর চোখ। মুখটা হাসি হাসি। কথা বলতে গালে টোল পড়ে। বয়সটা তেমন কম না হলেও আকৃতিতে একটা বেশ খুকী খুকী ভাব আছে।

পূজোর ছুটি উপলক্ষ্যে কাশী যাচ্ছিলাম। ক্যান্টনমেন্টে আমার ছোট পিসিমার একটা বাড়ি আছে, সেখানেই উঠবো স্থির আছে। পথ চলতে আলাপ, তারপর আমার নাম শুনেই এই আশ্চর্য উক্তি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

উনি মাঝে মাঝে কিন্তু তোমাদের গল্প করেন। এই ত' সেদিন বলছিলেন অনেকদিন দেখা হয়নি, কাশীতেও আর আসে না। আচ্ছা, তোমার ভাই মনে আছে আমাদের কর্তার কথা?

অনেক ভাবলাম, কে যে ভদ্রমহিলাটির স্বামী তা অনুমান করা কঠিন। স্বামীর ঠিক ঠিক পরিচয়টা জানার চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রাচীন পন্থী তাম্বুল রসিক্ত বাঙালী ভদ্রমহিলার মুখে স্বামীর নাম উচ্চারণ মহা পাপের কাজ। উনি শেষকালে নিজের হাতের আঙটিটা খুলে দেখালেন। দেখলাম তাতে এনগ্রেভ করা আছে রমাপদ।

শকুন্তলার হাতের নিজের আঙটিটি যখন মাছের পেট কেটে বের করে রাজা দুষ্মন্তের গোচরে আনা হল তখন তাঁর মানসিক অবস্থাটা কেমন হয়েছিল অনুমান করা কঠিন। আমি ত' আর কালিদাস নই, তাই নিজের কথা বেশ গুছিয়ে লিখতেও পারছি না।

তবে এই আঙটিটি দেখা মাত্র আমার পূর্বস্মৃতি স্মরণে এল। সে এক অতি বিশ্রী ঘটনা। এই কথা মনে পড়তে কেমন একটা তিক্ততা মনে জাগল।

সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন।

এই বেনারসের ক্যান্টনমেন্টের 'চিন্ময়ী কুটিরে' আমরা তখন থাকতাম। অকস্মাৎ মিশনের পাশের বাংলো, একরা এটাও মিশনের সম্পত্তি ছিল। আমাদের বাড়ির একটু দূরে থাকত মালশ্রীরা। রমাপদ মালশ্রীর দাদা।

সহযাত্রিনী মহিলাটি তখন বলছেন—এখন আমরা ঐ চিন্ময়ী কুটিরেই থাকি, ও বাড়িটা বিক্রী হয়ে গেল। উনি একটু ভরিয়ে করে বাড়িটা কিনে ফেললেন। জায়গাটাও অনেকখানি। উকীল মানুষ, এসব দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। তুমি তাই একদিন কিন্তু আমাদের বাড়ি এসো। কথা দিচ্ছ তো?

আমি সবিনয়ে কয়েকটি কথা বললাম। গাড়িতে বসে অতীত দিনের স্মৃতির রোমন্থন চলে।

মনে পড়ল, যার অসুখের সময় এই চিন্ময়ী কুটিরটা ভাড়া নিয়ে আমরা ওখানে কিছুদিন ছিলাম। মালশ্রীরা থাকতো পাশাপাশি আরেকটি বাংলোয়। ছোট পিসিমার বাড়িটা সেই সময় খালি ছিল না। মালশ্রীর বাবা ডাঃ মজুমদার ছিলেন নামকরা ডাক্তার। ভোর প্রাকটিস্। মালশ্রী আর আমার বয়স ছিল সমান সমান, তাই সহজেই একটা ভালোবাসা জন্মে গেল। আমরা সারাদিন ঘরে যে কত রকম খেলতাম তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একটা খেলা ছিল দারুণ জমত, চোর-পুলিশ। আমি আর মালশ্রী চোর আর ওর দাদা সাজত পুলিশ।

ভীত সন্ত্রস্ত দুই চোর আমরা, অবধারিত কঠোরতম পুলিশের পাল্লায় পড়ে সে কি লাঞ্ছনা আমাদের। রমাপদ আমাদের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো ছিল। সে সময় আমার বয়স সাত, রমাপদ বারো। তারপর আর কখনও দেখা হয়নি। এতদিনে নিশ্চয়ই ভারিক্কি হয়েছে। রমাপদদার খাদাটাও ছিল উজ্জ্বল, টিয়া লম্বা চওড়া চেহারা। ঘুড়ি ওড়াত, লাটিম ঘোরাত, পায়রা ওড়াত, পাখির ছানা ধরে আনতো।

সেই রমাপদ। ট্রেনের জানলার দিকে তাকিয়ে টেলিগ্রাফ পোষ্টের ওঠা-নামা দেখি, তারগুলি কেমন সোঁ-সোঁ করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ রমাপদদার স্ত্রী আমার হাঁটুতে ঠেলা মেরে ট্রেনের বিভিন্ন কলরবের মধ্যে বললেন—আর মালশ্রীর খবর জানো? তোমার সেই সঙ্গী গো! বিয়ের পর ওয়াশিংটনে চলে গেছে। ওর স্বামী এম্বাসীতে প্রেস এ্যাটাচি না কি আর মালশ্রীও বেশ চালু মেয়ে, নিজে একটা টাইপিষ্টের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। বেশ আছে। তবে কি জানো বিদেশ, বিভূঁই। এই এক কষ্ট—

আমি কিন্তু ভাবছি আমার সামনের এই আহ্লাদী বৌদিটির কথা। রমাপদদা বেশ বউ পেয়েছে। মহিলাটির এই সারল্য মনে মোহ সৃষ্টি করে। কেমন একটা শান্ত সুন্দর লক্ষ্মী-লক্ষ্মী ভাব। মনে মনে কল্পনা করি চিন্ময়ী কুটির সেই শান্তির নীড়ে বসে এই আহ্লাদী বউটি হয়ত সংসারের খুটি-নাটি নিয়ে খিটিমিটি করে নয়ত আপন মনে উকীল স্বামীটির জন্য উলের সোয়েটার বানায়। রমাপদ মাঝে মাঝে নির্বোধের মত ক্ষেপে ওঠে, যেজাজ গরম করে অকারণে চেঁচায়।

কিন্তু সংসারে এতসব কথা থাকতে, আমার কথাটাই বা স্ত্রীর কাছে সবিস্তারে গল্প করেছে কেন। কেন যে ওর হাতে কামড় দিয়েছিলাম সে কথাটি হয়ত ভোলেনি রমাপদ। এখন আবার ছোট পিসিমার বাড়ি চলেছি। হয়ত রমাপদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। কে জানে?

আমার মাথাটা কেমন ঘুরতে থাকে। যতক্ষণ না ট্রেনটা যথাস্থানে পৌঁছাল ততক্ষণ আমার মাথায় আকাশ-পাতাল ভাবনা। ট্রেন থামতেই তাড়াতাড়ি সুটকেশ, হোলডঅল, ইত্যাদি নামিয়ে নিয়ে যথারীতি সৌজন্য প্রকাশ করে বিদায় জানিয়ে নেমে পড়লাম।

॥ দুই ॥

কাশী পৌঁছানোর কয়েকদিন পরেই ছোট পিসিমা বললেন রায় বাড়িতে কি একটা উপলক্ষে বাড়ি শুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ।

এই ভয়টাই ছিল। রমাপদদা আর তার গিন্নীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রমাপদ আরো রোগা হয়েছে, এতদিনে বেশ পুরুষালি চেহারা হয়েছে এবং একটু মুটিয়েছে। রমাপদদার মুখের দিকে তাকিয়ে অতীতের সেই একটি আতংককর দিনের কথাই বার বার মনে জাগল।

সেদিনকার সন্ধ্যার ভীত সন্ত্রস্ত রমাপদদার চেহারাটা আজো আমার মনে আঁকা আছে। হাতের কোয়ালটা নিয়ে আমাকে তেড়ে এসেছিল। কণ্ঠস্বর স্খলিত এবং কান্না জড়ানো।

রায়বাড়ী পৌঁছে আমি একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছোট পিসিমা হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন।

ঠিক এর পর মুহূর্তেই রমাপদ আমার দিকে এগিয়ে এল। বলল—এই যে লীলা, কত বড় হয়েছ! কতদিন পরে দেখা হল। লাষ্ট উইকেই মালশ্রীর চিঠি পেলাম। জানো ত' ওরা এখন ওয়াশিংটনে। মাঝে মাঝে তোমার কথাও লেখে। শুনের একটা খোকা হয়েছে হয়ত শুনেছ। মেসোমশাই কেমন আছেন? কাল কিন্তু আমাদের বাড়ি আসতেই হবে পিসিমা।

আমি একটা জুৎসই অজুহাত খুঁজছি। রমাপদদার স্ত্রী খুলে মুখের ভিতর একটা পান ফেলে দিয়ে বললেন—হাঁ ভাই। কাল আসতেই হবে।

আর ছোট পিসিমাও এমন মানুষ, আর কোনো কথা না বলে বললেন, তা বেশ ত'।

সে রাতে আমার ভালো ঘুম হল না। সারারাত নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি। ঘুমিয়েছি আবার ঘুম ভেঙে গেছে।

চিন্ময়ী কুটিরের পাশেই ছিল গোরস্থান। স্থানীয় লোকজন বলত 'কবর খোলা'। কতকগুলি বড়ো বড়ো ঘোড়া-নিমের গাছ। দিনের বেলাতেও অন্ধকার। রাতে এপথে কেউ পথ করে যায় না।

কত রকমের কবর, যেগুলি নতুন, তার যত্ন আছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চুণকাম করা, আগরবাতি আর গুগ্‌গুলের গন্ধে ভরপুর। যেগুলি প্রাচীন এবং বেওয়ারিশ, সেগুলি অবহেলিত। ইতিহাসের করুণ স্বাক্ষর।

এই কবর খোলার গায়েই চিন্ময়ী কুটিরের বাগান। আমরা সেখানে বেনেবউ, কানামাছি, চোর-পুলিশ এইসব খেলতাম। মাঝে মহাধুমধাম করে পুতুলের বিয়ে হত। কি ঘটাই না হত এক একটা বিয়েতে। মালশ্রীর অনেকগুলি ভালো ভালো পুতুল ছিল।

সেই বুড়ো নেহপিনি গাছটার নীচে কি রমাপদ কখনও যায়? রমাপদ কি সে সব কথা মনে রেখেছে?

॥ তিন ॥

মার শরীরটা একটু সেরে উঠ্‌ল। এদিকে শীত শেষ হয়ে আস্‌ছিল। বাবার ছুটি ফুরিয়ে আস্‌বে। আমাদের চিন্ময়ী কুটিরে বাসের সময় ফুরিয়ে এল।

আমরা চলে আসার কয়দিন আগে মালশ্রীদের বাড়ি যেতেই সে তার বিরাট লাল পুতুলটা কোলে করে ছোটে এল। এই পুতুলটা জাপান থেকে ওর সেজ কাকা এনে দিয়েছেন, যেন একটি জীবন্ত বাচ্চা। মালশ্রী ওর নাম দিয়েছে নোটা। সব পুতুলের আলাদা-আলাদা নাম। কেষ্টা, গোবরা, মিঠু, নোটা, বাব্‌লী, বাবুয়া, রুমা এমনই আরো কত কি!

অর্থহীন বাক্যে সুর টেনে সেই সুরম্য পুতুলটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল মালশ্রী। উত্তেজনায় তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে।

ওর পুতুলটাকে অত্যধিক নাড়া দিতে দিতে মালশ্রী বলল—জানিস ভাই নীলা, আমাদের একটা ভাই হয়েছে, ওর নাম রেবু, ভালো নাম রেবীপদ। মালশ্রীর মুখে বিজয়িনীর দীপ্ত ভঙ্গী।

ছোট পিসিমার এই ঘরটিতে শুয়ে সেদিনের কথা মনে করে আমার ঘুম ভাঙলো।

নতুন খোকাকে নিয়ে মালশ্রী আর আমি অনেক হৈ-চৈ করেছিলাম। রমাপদদা কিন্তু এতটুকু উৎসাহ দেখায় নি সেদিন।

সকালে ছোট পিসিমার পাশে বসে চা খেতে খেতে সেই ছোট্ট রেবুর টুকটুকে মুখখানি আর রমাপদদার রক্তচক্ষু-বার বার আমার মনে ভেসে উঠ্‌ল। কিভাবে যে দিনটা কেটেছিল তাই ভাবি।

সমস্ত দিন ধরে রমাপদের নিমন্ত্রণটা কাটানোর কথা ভেবেছি। তবু শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। নয়ত ছোট পিসিমার হয়ত অপমান হবে, উনি ত' এখানেই থাকেন, আমি না হয় চলে যাব।

আর যাইহোক রমাপদদা আমার কি আর করবে এখন! এটুকু সে ভালোই জানে যে কথা এতকাল গোপন রেখেছি তা গোপন থেকে যাবে। এতদিনের লুকিয়ে রাখা কথা কি বলে ফেলে? আগে আগে ভাবতাম রমাপদদা যদি কখনও আমাকে দেখতে পায় তাহলে হয়ত গলাটিপে মারবে।

স্মৃতির জ্বালা অতি ভীষণ জ্বালা।

আমরা কলকাতা ফিরবো সব ঠিকঠাক। মালশ্রীর কয়েকটা ছবির বই আমার কাছে ছিল, মা বললেন এগুলি ওদের দিয়ে এসো।

ফেরৎ দিতেই গিছলাম। ঐ মেহগিনি গাছটার তলায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। গল্প করতে করতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কবরখোলার ঠিক পাশটিতেই এই মেহগিনি গাছ, শেষকালে কি ভূতে ঘাড় মটকাবে।

আমার হাতে একটি পেনসিল টর্চ ছিল, সেই সময়টায় নতুন উঠেছে কে যেন আমাকে উপহার দিয়েছিল। সব সময় হাতে করে ঘুরতাম।

গাছের গুঁড়িটার কাছে স্পষ্ট দেখলাম রমাপদদা দাঁড়িয়ে। হাতে কোদাল ও ছোট নিড়েন। বাগানের মালিদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে বোধহয়।

আমি চেঁচিয়ে কিরছিলাম, আমার গলার আওয়াজ নিশ্চয়ই রমাপদদার কানে পৌঁছেছে। সে কেমন ঘোলা-ঘোলা মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আমি কোনো কিছু ভাবার আগেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার গলাটা টিপে ধরল।

আমি জোরে কাঁদতেও পারছি না। সেদিন হয়ত আমাকে শেষ করেই দিত। কোয়ালটা উঁচিয়ে ছিল, কিন্তু আমি প্রাণ-পণে ওর হাতটি সজোরে কামড়ে দিলাম।

ও কাঁদতে কাঁদতে বলল – কাউকে যদি বলিস ত' গলাটিপে মেরে ফেল্‌ব জানিস্।

আমার টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে টর্চটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলাম, তখন লক্ষ্য করলাম রমাপদরা কি একটা বস্তু মাটিতে পোঁতার উদ্যোগ করছিল কারণ সাদা কাপড়ের পুটলি আমি স্পষ্ট দেখেছি।

চার

কি করে যে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম তা মনে নেই।

পরদিন ভোরের গাড়িতেই আমরা কলকাতায় পৌঁছেছি। অনেক পরে ছোট পিসিমার চিঠিতে জেনেছিলাম যে মালশ্রীর ছোট ভাই বেবুকে পাওয়া যাচ্ছে না, সন্ন্যাসীরা নাকি তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সারা শহরে এই নিয়ে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

এর কিছুদিন পরেই আমার বিশ্রী ধরণের জ্বর হল। মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সাময়িক স্মৃতি ভ্রংশও বলা যায়। সত্যি এমন একটা ঘটনা ঘটেছে না আমি স্বপ্ন দেখছি তা মনে মনে চিন্তা করি। কাউকে কোনো কথা জানানোর প্রয়োজন হয়নি।

ছোট পিসিমা জানিয়েছিলেন, মালশ্রীর ভাইকে পাওয়া যায়নি, পুলিশ কিন্তু হাল ছাড়েনি। এর পর আমিও মালশ্রীকে চিঠি দিলাম। প্রথম প্রথম ঘন ঘন চিঠি পত্র চালাচালি হত, এখন বছরে দু একটি চিঠি আসে। মুখোমুখি দেখা আর হয়নি।

এখন আমার বয়স হয়েছে, আমি আর কচি খুকী নই, আর সেই রমাপদদার বাড়িতে বসে তার স্ত্রীর আতিথ্য উপভোগ করছি। বাড়িটা সেই রকমই আছে, কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। আমার পরিণত দৃষ্টিতে অবশ্য একটু কেমন কেমন ঠেকছে।

আহারাদির পর ওপরের নতুন বাথরুমটায় কেমন সব আধুনিক ধরণের ফিটিংস দিয়ে সাজানো হয়েছে তা দেখানোর জন্য নিয়ে গেল রমাপদদার স্ত্রী। যাবার সময় আমার দিকে একটু মিষ্টি হেসে বলল— তুমি ভাই, ততক্ষণ তোমার দাদাটির সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করো। এখনই আসছি—

রমাপদকে বেশ প্রশান্ত এবং পরিতৃপ্ত মনে হল। সে উঠে জানালার ওপরকার পর্দাটা সরিয়ে দিল। এখান থেকে বাগানের হাওয়া এসে গায়ে লাগছে।

রমাপদদাই কথা তুললেন—ও মনে আছে, কি মজাটাই না হত সেকালে কত খেলা কত হৈচৈ। তবে ভাই আমার হাতটা বিশ্রী করে কামড়ে না দিলেই পারতে। আজো দাগ আছে জানো—। মালশ্রী কিন্তু মোটেই রাগ করেনি, সে সব ভুলে গেছে।

আমি মৃদু গলায় উচ্চারণ করি মোটেই রাগ করিনি। রাগ করবো কেন।

আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল, আমি রাগ করিনি। রাগ করব কেন!

আমি কেঁদে উঠ্‌লাম।

রমাপদ বলে ওঠে আমি ত আর খুন করিনি।

খুন নয়—? তাহলে বেবুর কি হল? একটু ক্ষয় নিয়ে সহসা উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল রমাপদ। হাসিটার মধ্যে অবশ্য স্নেহ আর প্রীতির পরিমাণ বেশী ছিল। যেন কোনো শিশু ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠ্‌ছে। চেয়ার থেকে উঠে রমাপদ বলে উঠ্‌ল না না লীলা, সেনটিমেন্টের কিছু নেই, তুমি বড় সেনটিমেন্টাল। রাধবীর সেই বড়ো রাঙা পুতুলটার কথা মনে আছে। সেই যে তনটা নীলুকাকা লণ্ডন না প্যারিস থেকে এনেছিল। সেই রাঙা পুতুলটাই মালশ্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে পুঁতেছিলাম।

ধীরে ধীরে মুখ নামালাম। এখন চোখ থেকে জল পড়ছে। মনে পড়ল মালশ্রীর একটা প্রকাণ্ড ডল পুতুল ছিল, তার নাম দিয়াছিল রাঙা পুতুল। ঘাঘরা পরিয়ে তাকে রাজপুতানী সাজিয়ে দিয়েছিল মালশ্রীর মা।

আমার বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল।

রমাপদদা বলল কেন যে সেদিন তুমি অমন পাগলামি করছিলে তাই ভাবি। বেবু হারাণোর ব্যাপারটি নিশ্চয়ই তোমার মাথায় ঘুরছিল। আমি তাই ভাবি একটা পুতুল নিয়ে কেন মাথা খারাপ করেছিলে কে জানে।

আমি বললাম আমি তখন ছোট। মনে হয়েছিল একরকম। কিন্তু তুমি মালশ্রীর পুতুলটাকেই বা কেন মাটিতে পুঁতেছিলে?

—ঐ যে বললাম, মালশ্রীর সঙ্গে ও ঐ নিয়েই ঝগড়া—

কেমন একটু গম্ভীর হল রমাপদদা। মালশ্রীর কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

রমাপদদা আবার বলে ভারী হিংসুক ছিলাম ছেলেবেলায়। তোমরা দুজনে পুতুল নিয়ে মেতে থাকতে আমার সহ্য হতনা। এখন আমার নিজের বোকামিতে হাসি পায়। তোমার ওপরই কি কম রাগ ছিল। যাক এতদিনে ক্ষমা চাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। তবে রাগটা আমার হাতে রয়ে গেল।

আমি এবার লজ্জিত হলাম। বললাম আমি যে বেবুর কথা মনে করেছিলাম সেটা বুঝেছিলে!

হাঁ, অনেক পরে আমার খেয়াল হল যে পুতুলের লাল টকটকে রঙ অন্ধকারে তোমার চোখে হয়ত তাজা রক্ত মনে হয়েছে।

—আচ্ছা বেবুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি? কি জানি পুলিশ বলল হয়ত ছেলেধরা বেদেধরা বা সন্ন্যাসীরা ধরে নিয়ে গেছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে মালশ্রীকে চিঠি দিলাম। তাদের এই সৌভাগ্যে আমার আনন্দ হয়েছিল। রমাপদদার ও তার স্ত্রীর কথাও লিখেছিলাম।

এয়ারমেলে জবাব এল ক'দিন পরেই সে চিঠির সেখাংশটা তুলে দিয়ে এই কাহিনীর শেষ করছি—আমার খোকাটা পাশেই শুয়ে আছে। বেশ গোলগাল হয়েছে। তোর সেই রাঙা পুতুলটার কথা মনে আছে সেটা এখানে নিয়ে এসেছি—মায়া খেলনা বুকে নিয়ে ছেলে ঘুমাচ্ছে। আমরা যেটাকে বলতাম রাঙা পুতুল—দাদা বলত ভূত। মনে পড়ছে? মাঝে মাঝে চিঠি দিস্।

রাঙা পুতুলটা আজো তাহলে ঠিকই আছে। আশ্চর্য!

পুরাণোক্ত সেই দৈত্য

বাণী রায়

একটি বিজ্ঞাপন কাগজে কাগজে :—

"ফিরে এসো। তোমার মা শয্যাগত। তোমাকে বিবাহ করতে হবে না।

—পুলক সিংহ।"

এরকম বিজ্ঞাপন মিনহিটের উদ্দেশ্যে অনেক প্রকাশিত হয় প্রায়ই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে আপনারা দেখেছেন!

সকল কিছুর পেছনে কাহিনী থাকে।

এই কাহিনীটি আমি জানি। সংবাদপত্রের সংবাদ অবশ্য-তত্ত্ব নয়।

আমি গল্পটা আপনাদের বলে যেই—

বিভার তারস্বর উদ্বেলিত সান্ধ্য আকাশে, "ও বিপুল কাকা! বিপুল কাকা, কোথায় যাচ্ছ?"

রাস্তার ওপারে ফুটপাথে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি বিপুল। খোঁচা খোঁচা চুল, সেভ্-না-করা চিবুক, আধময়লা জামা-কাপড়। তন্ময় হয়ে কি যেন দেখছে।

মুখ তুলে তাকাল।

কিন্তু মুখে পরিচিতজনের একটি মোহিনী বালিকাকে দেখে যে স্নেহভরা প্রশ্রয়ের হাসি ফোটে, কোথাও নেই সেই হাসি। একটু খালে-পড়া চোখ দুইটি শুধু চকচকে।

"কোথায় তুমি যাচ্ছ, কবি?"

ততক্ষণে নাইলনের ফ্রকপরা কবিতা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বি-এর হাত ছেড়ে এধারে এসে গেল।

"আমাদের বাড়ি চলো, চলো না।"

"না, না, আমি লাইব্রেরী যাব।" বিপুল ক্ষীণ আপত্তি জানাল।

"চলনা, আমাদের ওখানে, কত বই আছে। একজন কে এসেছে দেখবে চল।"

বিপুল ততক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে একটা মোষের গাড়ি দেখছে। লরি যারা মাল বহনের যুগে গরু-মহিষের গাড়ী বিশেষ দেখা যায় না। একখানা কি করে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাক্ষ্য বহন করে চলছিল।

"কি দেখছ অত, বিপুলকাকা? মোষ তুমি ভালবাস বুঝি?"

"তা বাসি বৈকি, যখন দেখি ওদের দিয়ে কেমন করে মালপত্র টানাচ্ছে নির্মম ভাবে। পারছে না শুধু চাবুকের ওপর চাবুক।"

ছলছল চোখে বিপুল কবিতার দিকে তাকাল।

কি মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হেসে নিল। কবিতার বাবা, তার মনিবের খুড়তুতো ভাই বিপুলবাবুর হাবভাব সকলের জানা আছে।

গোটা জগতের ভারমঞ্চ যেন কেবার ভার বিপুলের। পৃথিবীতে যত অন্যায় চলেছে সে হাসির বিপুল সিংহের। ধনী গৃহের একমাত্র সন্তান, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের হাসির যেন একটা ওষি ভরে ন্যস্ত। তাই হাসির লঘুতায় রুচি নেই বিপুলের। সদা সর্বদা চিন্তিত, বিমর্ষ।

একমাত্র সন্তানের হিতার্থে চিকিৎসক ডেকেছিলেন মা-বাবা। সকলেই বলেছিলেন, এ কিছু নয়, একটু খেয়ালী, ভাবপ্রবণ। বড় হলে সেরে যাবে।

বিপুল যথাক্রমে এম. এ. পাশ করেছে। বোজগারের চিন্তা নেই। আয়েস করে গবেষণা অথবা রিসার্চ করছে। কবে অনন্ত-অখণ্ড রিসার্চের শেষ হবে জানা যায় না।

আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেশী যাতায়াত করে না বিপুল। মধ্যে মধ্যে কবিতার বাড়ি আসে, কবিতার আকর্ষণে। শিশুরা একটু বিচিত্র লোক ভালবাসে, তাই কবিতা বোধহয় বিপুলকে অত্যন্ত পছন্দ করত। বিপুলের বিপুল পার্সোনালিটির উপচৌকনও অন্যতম কারণ।

কবিতা হাত চেপে ধরেছে, আর ছাড়বে না।

"আমাদের বাড়ি যেতে হবে। মোষ দেখে কি করবে? চল না।"

বিপুলকে যেতেই হল। পাশে দোকান থেকে অবশ্য এক বাক্স ক্যাডবেরির চকোলেট কবিতার লাভ।

বাড়িতে কবিতার মা বিরস মুখে বসে উল বুনছিলেন। স্বামী, বড় ছেলে অফিস থেকে ফেরেন এখন; ছোট ছেলে কলেজ থেকে।

এ হেন সময়ে নাকেমুখে দুটো খেতে হয় তাঁকে, উলবোনার বিলাস থাকে না। আজ এ ব্যতিক্রম?

বিপুলকে অভ্যর্থনা জানালেন, "এসো বিপুল ঠাকুরপো, বুঝি আজকাল দুপুরের ভুল হয়েছ, না? ওকি, কবি, কাকার কাছ থেকে হাতিয়েছ দিদি? না, বিপুল ঠাকুরপো, অবথা এসব খরচ কোর না।"

মুখে বললেও বৌদি মেয়ের প্রাপ্তিযোগে বেশ প্রীতা বোধা গেল, মুখের বিরস ভাবটাও কেটে গেল খানিকটা।

"মাধুরী, এখানে এক কাপ চা দিও।" হাঁক দিলেন বৌদি।

একটা ছোকরা উঁকে ঠাকুর তিনি রাখেন। বৃদ্ধা খাণ্ডারী থাকায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন গতি নেই। যাঁদুনে দুপুরবেলা আড্ডায় অনুপ, সন্ধ্যায় কিরে রান্না চাপায়। সুতরাং, বৌদির ভাষায় জলখাবারের ন্যালা" ওঁর একাই ঠেলতে হয়। অল্প বেতনে খাঁটি ও নিরামিষ রান্নার লোক জোটে কই ব্রাহ্মণের মধ্যে?

আজ নিশ্চিন্ত উলবোনা ও 'মাধুরী' নামের ডাক শুনে বিপুল ধরে নিল নূতন ঝী রেখেছেন।

সে বলে উঠল, "নতুন ঝি রেখেছ বুবি, বৌদি? তাই অসময়ে উলবোনা দেখছি।"

বৌদি অপ্রতিভ হয়ে বলেন, "মাধুরী আমার বোনঝি। আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল গ্রামে। আগাগোড়া পাকিস্তানে ছিল পড়ে। অমিজমায় চলে যেত কোনক্রমে। কলেরা হয়ে দুদিনের আগুপিছু বোন ভগ্নিপতি মারা যেতে গ্রামের লোকেরা এখানে পৌঁছে দিয়েছে। দেখ তো, আমার কপাট। বিয়ে হয়নি, লেখাপড়া শেখে নি। কী করব আমি এখন একে নিয়ে।"

কল্‌কল্ করে ববিতা বলে উঠল, "কেন, মাধুরী মাসী কত কাজ করে। চা তৈরি, বিছানা পাতা"—

"ববিতা, চুপ কর। বড়দের কথায় কথা বল না।"

বৌদি সরোষে মেয়েকে থামিয়ে দিলেন।

এমন সময়ে মাধুরী নামধারিণী এক কাপ চা হাতে এল।

পরমুখাপেক্ষী গেঁয়ো মূর্খ মেয়ের সঙ্কোচ-ভীরুতা-বিধাতরা একখানা করুণ মুখ দেখার আশায় বিপুলের ছুঁচ বিলাসী মন ডিজে-ডিজে, ভারী ভারী। কিন্তু বাসনা পরিপূর্ণ হল কই? মুখখানি উজ্জ্বল, সদানন্দ। মাতাপিতার সদ্য শোকও মালিন্য দিতে পারেনি।

চা নামিয়ে রাখায় বৌদি রুক্ষ স্বরে বল্লেন, "শুধু চা বিকেলবেলায় মানুষকে দিতে নেই, তাও কি জান না? এত খাবার করলে কি তুলে রাখার জন্যে?"

বিপুল অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানাল, আমি এখন কিছু খাবনা। বাড়ী থেকে একগাদা খেয়ে এলাম।"

"না, না, তাই বলে কি দাদার বাড়ী খাবে না? মাধু, নিয়ে আয়। কাঁচের প্লেট পরিষ্কার করে মুছে সাজিয়ে আনিস। তোর তো কোন লহবৎ নেই।"

বিপুল নির্য্যাতিতা মানবীর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় বিগলিত হয়ে যায় আর কি!

কিন্তু দেখা গেল মাধুরী হাসছে।

অপ্রতিভ লজ্জাঢাকা হাসি নয়, সহজ স্বাভাবিক সুন্দর হাসি।

বিপুল অবাক হয়ে গেল।

হতদরজ মাধুরী সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। সারা মুখ ঘামে ভেজা, চুল উস্কু-খুস্কু। হাত ভরা কাচা কাপড়।

বিষণ্ণ মুখে বিপুল নেমে আসছে ববিতার হাত এড়িয়ে।

"পথ ছাড়ুন, হাত ধরে গেছে।" মাধুরী অনুনয় জানাল।

"একী, এত কাচা কাপড় নিয়ে চলেছ কোথায় মাধুরী?"

"আজ গেরস্তের কি আসেনি।" খিল্‌খিল্ করে হাসির জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

"তুমি তাই বলে বিয়ের কাজ করবে না কি?" বিপুল বিরক্ত হয়ে বলে উঠল।

"কে করবে? আমার মাসী তো দাসীর কাজ করবে না।" হাসিমুখ আরও হাসিতে ভরে গেল।

"তুমি দাসী বুঝি?" বিষণ্ণ মুখ আরও বিষণ্ণ করে বিপুল ঈষৎ বাঙ্গের চেষ্টা পেল। আর সকালে একটা কুকুরকে গাড়ীচাপা পড়তে দেখে সে সমগ্র ধরিত্রীর যাবতীয় শোকের বোঝা সেই পুরাণখ্যাত দৈত্যের মত মাথায় তুলে ধরেছে।

অ্যাটলাসের আকাশ বহন!

"এতদিন আসছেন, এতদিন আমাকে দেখছেন, আপনার জানা উচিত আমি কি।" মাধুরী পাশ কাটিয়ে উঠতে গেল।

হাসি ফুলঝুরি সিঁড়ি বেয়ে ঝরছে তখন।

হঠাৎ মনে হ'ল বিপুলের এর এত হাসির কি উপজীব্য আছে? পরের বাড়ী অনাদরে দাসবৃত্তি যদি একে নিরানন্দ না দেয় তবে নিশ্চয় "শুক নামে সুখপাখী" এর বুকেই বাসা বেঁধেছে।

এর সুখ থেকে সুখের সন্ধানে আজিয়ে প্রাণ মন ভরে নেয়া যায়।

মনে হল, অনন্ত দুঃখের সমুদ্রে এরি সুখের ভেলায় হয়তো আশ্রয় পাওয়া যায়।

এর কাছে দুঃখের কথা বলে হাল্কা হাওয়া যায়। এর হাসির হাওয়া সকল দুঃখ উড়িয়ে দেয়।

"আজকের কাগজে পড়েছ?"

"এখনি? একখানা কাগজ যোগাড় করতে দোতলা একতলা বহু হাঁটাহাটি করতে হয়। সবাইকার পড়া হলে তবে না!"

কথাগুলি দুঃখের কিন্তু সুরে হাসির সমুক।

"দেখেছ নিরীহ ভিয়েটনামের লোকেদের ওপর কি অকথ্য অত্যাচার চলছে?"

যেন বিপুলের অন্তরের অস্বস্তিকর বেদনা-বহনে এরি কাছে নির্ভরসূত্র পাওয়া যাবে। একে এগুলি বলে ভারাক্রান্ত মনের বোঝা নামানো দরকার।

"আপনি কি ভিয়েটনামে গেছেন বা ওদের দেখেছেন? আপনার অত মাথাব্যথা কেন? আমি যাই, কাজ পড়ে রয়েছে অঢেল। আপনার বৌদি বকবে।"

দীপ্তিময় মুখের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল প্রভাতের প্রহর।

বিপুলের মা-বাবা মনোক্ষুণ্ণ হলেন।

অতি উপযুক্ত ছেলে তাঁদের। এমন একটি হা-ঘরে, হাবাতে মেয়েকে অবশেষে মনোনীত করল! শুধু মেয়েটির দুঃখ মোচনের উদ্দেশে না কি?

সুন্দরী বা বিদুষী হ'লেও বা বোঝা যেত। অতি সাধারণ চেহারা, পাশ করেনি। পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে অবশেষে একান্ত অনাথ অবস্থায় এসেছে, মাসীর দয়ায় জীবন ধারণ করছে।

যে-ছেলে বিয়ে করতেই চায় না, তাকে এখন বাধা দেওয়াও চলেনা। মনে মনে ভাই-এর ওপর চটে গেলেন বিপুলের বাবা। অবশ্য স্ত্রী বোঝালেন যে এটা সম্পাদিত হয়েছে ববিতার মাতার কূটচৈপানায়। ববিতার চোখ ঝলসিয়ে বহুদিন যাবৎ তিনি বিপুলকে বেঁধে রেখেছিলেন অনূঢ়া চাইবির উদ্দেশে নিশ্চয়। আশা মাত্র কালক্ষেপ না করে গেঁথে দিলেন।

এ নিয়ে উভয় পক্ষে মনোমালিন্যের সূত্রপাতও হ'ল। ববিতার মা শপথ করে বলেন যে তাঁর এবিধ দুরাশার কোনও সাহস হয়নি। মিটুকে শয়তান মেয়েটা কখন কি করেছে কে জানে? আগে জানলে তিনি চোখে চোখে রাখতেন। বিপুলের এমন পছন্দ যে হতে পারে তিনি সুদূর কল্পনায়ও ভাবেন নি। তিনি রাগে দুঃখে মরে যাচ্ছেন।

কথাটা ঠিক।

সহায় সম্বলহীনা মেয়েকি এমন পাত্র পেয়ে ফেলল, যার যোড়া তিনি ববিতার প্রাগ্‌যৌবনে হয়তো যোগাড় করতে পারবেন না। ভাবতে ভাল লাগল না তাঁর।

ববিতা 'কাকা, কাকা' বলে অজ্ঞান। ইদানীং বিপুলের ঘন-ঘন আসা যাওয়া ববিতার প্রতি স্নেহে মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

দেখতো, বটঠাকুর কি মনে করলেন!

একটি মাত্র সন্তান, কত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁর বোনঝির কারণে তাঁদের আশা ভঙ্গ হ'ল। লজ্জা করে।

অবশ্য মেয়েটা ঘাড় থেকে নামল।

বিপুলের ওপরও আরও জোর খাটানো চলবে। বনিতার বাবা উত্তাক্ত চিত্তে 'নমোনমঃ' করে একটা দীনহীন বিবাহের কর্ম করলেন। মাধুরীর জমিজিরেত যা ছিল সেই পাড়াগাঁয়ে, বিক্রী হল টাকায় ঘোরাতে।

বিপুলের মা-বাবা অগত্যা বিবাহের যোগাড়যন্ত্রে নামলেন।

মেয়েটির হাসিমুখখানা দেখে অতটা খারাপ লাগল না। চিরবিবাহের অভিশাপে অভিশপ্ত ছেলে তাঁদের, হয়তো এর চিরানন্দ থেকে সুখী হবার শিক্ষা পাবে। পৃথিবীর দুঃখে অহেতুক বিগলিত পুত্র, সারা বিশ্বের দায়িত্ব কি করে একা বহন করে? দোসর লাগে একজন।

কিন্তু, কি আশ্চর্য!

বিপুলের সুখের সব-উপাদান আছে। তথাপি সে বিষণ্ণ।

এধারে মাধুরী সর্ববঞ্চিতা। সে সর্বদা হাসির কারণ পায় কি?

একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল বিপুলের।

বৈশাখী পূর্ণিমার প্রহরে বারান্দার বেলফুল সৌরভ বিলিয়েছে।

প্রথম প্রেমের সুখের মধ্যে অনিবার্য্য বেদনা থাকে।

জীবনের চৌকাঠে পা রাখতে যেয়ে সেছনে অস্পষ্ট বিশ্বের সঙ্গে মৌলিক বন্ধন ছেদন।

পুরাতন আস্থার, ধ্যান ও ধারণার মর্মমূল উৎপাটন। অনেকেই ভয় পায়।

মাধুরীর হাসিভরা মুখের স্মৃতি রাত্রি ভরে রেখেছে।

অপরূপাকে রূপসী নয় বলে কোনজন?

ওরি সুখের মধ্যে নিজের অভাববোধ বিলিয়ে দিয়ে নূতন জীবনে বেঁচে যাবে বিপুল।

কিন্তু, মনে হচ্ছে কি যেন নেই।

হাত বাড়িয়ে দেখল মাথার নীচে বালিশ আছে তো?

অঙ্গ অটুট আছে সব?

তবে?

সমগ্র পৃথিবীর দুঃখ, ব্যথা ছিল বিপুলের মানসিক বোঝা।

বোঝা খসে গেছে বুঝি?

তাই হাল্কা?

কিন্তু নিঃসীম শূন্যতাবোধ কেন?

প্রেম যদি পূর্ণ না করতে পারে, তবে অবলম্বন কোথায়?

বিষাদ সঙ্গী বিপুলের জীবনব্যাপি। হাত বাড়ালেই চিরসঙ্গীকে পায়। বিবেক তুষ্ট থাকে, পৃথিবীর এত দুঃখ বিপুল অনুভব শুধু করছে না, গ্রহণ করেছে।

তাহলে সুখের হাসি চিরসঙ্গীকে সরিয়ে দিলে নিরালম্ব শূন্যকে পাবে সে।

পৃথিবী সমব্যথীর অভাবে হাহাকার করে কাঁদবে। মনে পড়ে গেল শাক্যসিংহের কথা। প্রেমবিহ্বা পত্নীকে তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন, শিশুপুত্রকে বাধা মানেন নি।

পরের দিন তাজব।

পিনকুশানে গাঁথা চিঠি :—

"চলিলাম। কবে ফিরিব ঠিক নাই। বিবাহ আমার জন্য নহে। মাদুরীর অন্যত্র বিবাহের টাকা আমার পিতা দিবেন।

—বিপুল সিংহ।"

বিবাহের কয়েকদিন আগে বর পলাতক!

বিপুলের মা শয্যা নিলেন। রবিতারা মা কপালে করাঘাতসহ আক্ষেপ করলেন, চিরদিনের অস্বাভাবিক ছেলে। এখন করি কি আমরা?"

বিপুলের বাবা পুলক সিংহ গোয়েন্দা লাগালেন কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন।

সেই বিজ্ঞাপন আপনারা দেখেছেন। প্রধান পাত্রীকে ঘটনা বলা হ'লে সে শুধু হাসল। তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে উত্তর দিল, "পুরুষের লোকেদের বড় ভয় বেশী। ফিরে আসবে।"

আপনি, আমিও সেই প্রতীক্ষায় বসে আছি।

আয়-ব্যয়

সুবোধ বসু

কুইক মার্চ ক্লাবের প্রতিমা-বিসর্জনের জন্য লরী এসে দাঁড়িয়ে আছে সওয়া ঘণ্টার ওপর। মাঝে মাঝে 'পো-আপ্' পো-আপ্' হর্ণার ছেড়ে তাড়া লাগাচ্ছে। অথচ প্রতিমা তোলবার কোনও উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। উদ্যোক্তারা বরফ এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে যাচ্ছে, স্বর্ণবিধায়ী মাইকের তলায় দাঁড়িয়ে জটলা করে অনর্থক সময় নষ্ট করছে। কুইক মার্চের কোনও লক্ষণই নেই।

সভাপতি গণপতি দাসের বাড়ি প্যাণ্ডালের পেছনেই। সেখানে তিনি অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছেন বিসর্জনের জন্য। প্রতিমার নয় মাইকের। কিন্তু একটি না হলে অন্যটি হয় না। পূজার আগের সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়েছে মাইক। পূজা তিন দিন হলো শেষ হয়েছে। না বিসর্জন হচ্ছে প্রতিমা, না মাইক। শব নিয়ে যেন সাড়ম্বর শব-সাধনা চলছে।

অবশ্য সভাপতি হিসাবে তিনি এই তাণ্ডবের অবসান দাবি করতে পারতেন। প্রতিবাদ করতে গেলে অন্যান্য পাড়া-প্রতিবেশীর যেমন হেনেস্তা হবার ভয় তাঁর ততটা ভয় করবার মত কিছু ছিল না। ভয় ছিল জনপ্রিয়তা হারাবার।

সভাপতি অবশ্য গণপতি স্বেচ্ছায় হন নি। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কুইক মার্চ ক্লাব তাঁকে নিজেরাই 'নমিনেট' করেছে। তিনি ১৪৲ টাকা চাঁদা দিয়ে সেই মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন মাত্র।

ছোট ক্লাব। কিন্তু উৎপাতে কম নয়। এদের হাতে রাখা বুদ্ধিমত্তা। তাই চাঁদার উপর দিতে হয়েছে পাঁচ দিন যথেচ্ছ বিদ্যুৎশোষণের অধিকার। তাঁরই বাড়ির কনেক্‌শনের হিসাবে তিন তলা ফ্লুরোসেণ্ট আলোয় ঘরী প্যাণ্ডালের দুপাশের এবং সামনের ফুটপাথে উজ্জ্বল হয়ে শোভা পেয়েছে। পাঁচ রাত্রি, চারদিন দু'জুটো মাইক প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে আর্তনাদ করেছে তারস্বরে। একটা পুরো পাছ লাল-নীল বাহারি বাতিতে সুসজ্জিত হয়ে আপামর সাধারণের মনোরঞ্জন করেছে এ ক'দিন ধরেই। এ সবই গণপতিকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু যেটা আর মোটেই সহ্য করা যাচ্ছে না, সেটা মাইক। একটা ভাঙা রেকর্ড হাজার বার বেজে বেজে ছেদ না দিয়ে একটার পর আর একটা বেজে যন্ত্রের মত কড়কড় করে বেজে রাক্ষসের মত হুঙ্কার করে বেজে মাথার স্নায়ু ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছে।

তাই অধীর হয়ে গণপতিবাবু প্রতিমা বিসর্জনের অপেক্ষা করছেন। এদিকে নিয়ে যাবার জন্য লরী হাজির অথচ প্রতিমা তুলে দেবার দিকে কেউ গা-ই করছে না। ব্যাপার কি?

ব্যাপার টের পাওয়া গেল যখন কুইক মার্চ ক্লাব হুড়মুড় করে গণপতির বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল। নিরুপায় হয়ে নিচে নামতে হলো গণপতিকে বিলম্ব হলে এই ভূমিকম্পে বৈঠকখানার জিনিষপত্র কিছু আর আস্ত থাকত না।

'আমরা তার মহাবিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।' কুইক মার্চের কর্মকর্তার নিশন্থ বললে। 'বিসর্জনের সব ব্যবস্থা ঠিক। গয়লাদের ইংরেজি ব্যাণ্ড, প্রতিমার সামনে নেচে নেচে শিব মেয়ে চলবার দল, ঘোমটা কাটাবার দল, প্রসেসনে ইলেকট্রিক আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেবার জন্ত ব্যাটারী সব তৈরি। ট্রাক-ও হাজির। মুস্কিল হয়েছে, ট্রাকের ভাড়া দেবার পয়সা নেই। চাঁদা যা উঠেছিল, পাই-পয়সাটি পর্যন্ত খর্চা।···তাই ছুটে আসতে হলো স্বয়ং প্রেসিডেন্টের কাছে। গোটা পঞ্চাশেক টাকা না পেলে বিসর্জন দেওয়াই অসম্ভব।

গণপতি গম্ভীর হয়ে গেলেন। গত ক'দিনে কেউ একবার প্রেসিডেন্টের খোঁজ করেনি। সে বেচারি আস্ত থাকুক বা টাঁসে যাক, এ নিয়ে কারই কোনও মাথা ব্যথা ছিল না। যেই টাকার অভাব হয়েছে, অমনি সভাপতির কথা মনে পড়ে গেছে।

'তোমাদের ছোট্ট পুজো। এত খরচা হলো কি করে?' গণপতি বললেন। 'চারশোর ওপরে চাঁদা আদায় হয়েছে শুনেছি···

'আজ্ঞে হাঁ। চারশো একুশ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।' নিশন্থ রাজস্বমন্ত্রীর নির্লিপ্ততার সঙ্গে জবাব দিলে। 'হিসেবটাও দিচ্ছি শুনুন। একটি আধলাও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই···প্যাণ্ডালে ৮৭৲, প্রতিমা ৬৫৲ টাকা, ছুটো মাইক···'

'ছুটো মাইক এনেছিলে কেন?' গণপতি আপাতত একটা ফাঁক আবিষ্কার করে বললেন।

'করতে হলো নিজের জন্ত। সত্যি বলুন তো, কি দরকার ছিল ছুটোর? জোর করে দিলে একটাই পাড়া সরগরম করতে পারে।' নিশন্থ আপত্তি স্বীকার করে নিয়ে বললে। 'নিধিরামের জামাইবাবুর মাইকের ব্যবসা। সে ছুটো চালাবেই। উপায় কি। বেশি জোর করতে গেলে দল ভেঙে যায়। মেনে নিতেই হলো। তারপর ধরুন লাইট। ঘুরো আর লাল-নীল বাতি লাগাতে পুরো ষাট টাকা খরচা পড়ে গেছে। আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নণ্টু বলপাকালে। বললে, ফুটপাথের ধারে ধারে ঘুরো না বসালে আবার পুজো। এ না হলে আমরা মরে পড়ব।···এরপর আছে প্রতিমা সাজানো প্রতিমার জন্ত নাইলনের শাড়ি এবং। মোট ৪১৲ টাকা। তারপর যাতায়াত খরচা, প্রতিমা আনার টেম্পো ভাড়া, ছাপাখানার চার্জ চিঠি ছাপাবার জন্ত। মোট ২৭ টাকা ২৫ পয়সা। তবে আপনার কত দাঁড়াল? তিনশো পঞ্চাশ টাকা পঁচিশ পয়সা। আর এর সঙ্গে জুড়ে দিন প্রসাদের খরচ। ৭১ টাকা ৫০ পয়সা। এখন পুরোটা ধরুন। চারশো একুশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা। দেখুন, ভুল আছে কিনা।···

গণপতি হিসাব মেলাবার চেষ্টা করলেন না। এমন হিসাব খুব অল্প লোকই দাখিল করতে পারে। হতে পারে অন্তের সততার পঁচিশ ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাতব্বরদের নিজেদের পকেটে গিয়েছে। কিন্তু ভাউচার মিলিয়ে হিসাব পরীক্ষা সভাপতির এক্তিয়ার মধ্যে পড়ে না। গণপতি শুধু মন্তব্য করলেন কটা খরচের হিসেব বাদ পড়ে গেছে দেখছি···'

'বাদ পড়ে গেছে!' নিশন্থর প্রতিবাদ পলকে ছুটে এলো। 'কোন খরচার কথা বলছেন···'

'পুজোর ফুল, পুরুতের দক্ষিণা।' গণপতি বললেন। 'বারোয়ারি পুজায় পাঁচ দশটাকার কম দক্ষিণাও দেওয়া চলে না। এ সব খরচার টাকা পেলে কোত্থেকে?'

নিশন্থ মৃদু হাসলে। 'ও সব', সে মাথা চুলকে বললে, 'এবার বাদ দিয়ে খরচা বাঁচিয়েছি, স্যর। পুজোটা মনের ব্যাপার। ভক্তির ব্যাপার। ওটা মনে মনে করলেই সব চেয়ে ভালো হয়। যাকে বলে প্রকৃত আন্তরিক পুজা তাই আন্তরিক পুজোটা এবার···'

গণপতি একবার আড় চোখে কুইক মার্চের কমাণ্ডারের ভক্তি-গদ গদ মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন। মনে মনে বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা। খোদ পুজোটাই বাঁচা।' প্রকাশ্যে বললেন, 'তবে যে বললে, প্রসাদের জন্য ৭১টাকা পঞ্চাশ পয়সা···'

'প্রসাদ মানেই খাওয়া।' নিশন্থ সবিনয়ে জানাল। 'উৎসবে খাওয়া না হলে চলবে কেন? ব্ল্যাক-মার্কেটের আতপ চাল আর সোনা মুগ ডাল দিয়ে খিচুড়ি। বেগুন ভাজা, ফুলকপি, আলু, কুমড়ো, বেগুন, কড়াইশুঁটি দিয়ে লাবড়া। তাছাড়া পাঁপর, আচার, আপেল, নারকোলি কুল, আঙুর, চুণো সন্দেশ এসব তো মুরি মাফিয়ে দিতে হবে। একান্তর টাকায় পঞ্চাশটা প্লেট সাজানোই মুস্কিল। ইচ্ছে ছিল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেব। অথচ দেখা গেল, নিজেদের ওয়ার্কারদেরই কুলোয় না। ফিন, আর, আর আপনার বেবি করাব না। মনে হচ্ছে, পঞ্চাশটা টাকা হলেই কুলিয়ে যাবে। এই দেখো, সোজাটার কাঁধে চড়ে বসেছিল কেন, বাঁদর? মাস্ট শীগগির···'

সাগরেদদের বিভিন্ন জন বৈঠকখানার বিভিন্ন আসবাব ঘাঁটাঘাঁটি মোচড়া-মুচড়ির কাজে ব্যাপৃত ছিল এতক্ষণ। মেধোর প্রতি অধিনায়কের আহ্বানে সবাই নিবৃত্ত হলো।

'মাইক বন্ধ করবে কখন?' গণপতি টাকা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই বললেন।

'ঠাকুর টাকে নিয়ে তুলব', নিশন্থ আশ্বাস দিয়ে বললে, 'আর মাইকের গানও বন্ধ হবে। এ সবই তো ঠাকুরের জন্য তত্ত্ব। এই যা, তোরা যা। মাইকের ভার কেটে দে। আমি টাকা নিয়ে আসছি···'

টাকা এসে পৌঁছতে বিলম্ব হলো না।

কমলকুমারী

কবিতা সিংহ

নীলার অদ্ভুত লাগছিল।

সে অমলের পাশে বসে আছে। অমলের দামী সেকেলে চেহারার রোলস্ রয়েসে। অমলের হাতের মুঠোয় তার হাত। গাড়িটা এখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে। একটু আগেই তারা বাংলা বিহারের সীমানা পেরোল। আরো একটু আগে বিস্তৃত একটি দেবদারু কুঞ্জের পাশে বসে তারা দুজনে বনভোজন করেছে। শোফার চাঁদ সিং গাড়িতে বসেই নিজের ভাগটুকু খেয়ে নিয়েছিল। তাদের একান্ত আলাপনে ভিড় বাড়ায়নি।

এত সত্ত্বেও নীলার মনে হচ্ছিল সব মিথ্যে। সব ফাঁকি।

সে যেন শুধুই স্বপ্ন দেখছে।

অমল আস্তে আস্তে নীলার বাঁ হাতখানি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিল। তার আঙুলে চুনির আংটিখানি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল,

—নীলা বলো, এখন কেমন লাগছে তোমার?

নীলার এক নিমেষের মধ্যে অনেক কথা একসঙ্গে মনে উঠে এল। কোন অন্ধকার নিরানন্দ জগত থেকে অমল তুলে নিয়ে এসেছে তাকে। কোন নিরালা থেকে। তার গলা বন্ধ হয়ে এল। কোনো কথা বলে এই মুহূর্তটিকে নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে হল না তার। শুধু চোখ দুটি অজান্তে একেবারে ভরপুর হয়ে টলমল করে উঠল।

মনে মনে সে হাজার বার করে বলল,

—অমল, অমল আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কত যে কৃতজ্ঞ তা কথায় বলে বোঝাতে পারব না।

নীলা বাইরে তাকাল। দুপাশে সবুজ গাছের সারি। বসন্তে সব কচি নতুন পাতা। এত আনকোরা এত সবুজ, এত তেল চুকচুকে আর চকমকে! আর সেই নিপাট সবুজের ভেতরে ভেতরে মাঝে মাঝে মাদার পলাশ আর শিমুলের আচমকা লাল। সবুজের ভেতরে ভেতরে টকটকিয়ে উঠল। হৃদয়ে রোদে তাজা বনভূমির তেমন গন্ধ এসে নাকে লাগছে। নীলা বড় বড় নিঃশ্বাসে সেই তাজা গন্ধে নিজের শহুরে ফুসফুস দুটি ভরে নিচ্ছিল। তারপর চাপা গলায় অমলকে বলল,

—তোমার নীলকুঠির গল্প একটু বলোনা আমায়।

অমল শান্ত একটু হাসল।

—জানো নীলা নীলকুঠির কিন্তু আরো নাম ছিল। এখন আর তাকে সে নামে কেউ ডাকে না। ডাকতেন আমার দাদুর দাদু। চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তিনি বলতেন জঙ্গল-বাংলা।

নীলা বলল,

—বেশ নাম। তুমিই বা কেন জঙ্গল-বাংলা বলবে না?

অমল বাইরে সবুজ বনভূমির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,

—নীলা জঙ্গল-বাংলার নাম বিলাটের জন্যে অনেকদিন আগে তোমার মত একজনকে অনেক খুঁজতে হয়েছিল। তা জানো!

নীলা বলল,

—তাই নাকি ! তাহলে ত জঙ্গল-বাংলার কথা আমি আরো বেশি করে জানতে চাই !

অমল যেন স্মৃতির ঝরনা খুলে খুলে কোথায় অনেক দূরে চলে গেছে।

নিজের মনেই সে বলল,

—সত্যি, ভেবে দেখিনি ত, তোমার সঙ্গে কমলকুমারীর অনেক মিল আছে জানো নীলা। শুনেছি তিনি নাকি অপূর্ব ঠুমরি গাইতেন।

নীলা তার দীর্ঘ পক্ষ চোখের পল্লবগুলি কাঁপিয়ে অমলের দিকে তাকাল।

—সত্যি।

অমল নীচু গলায় খুব আস্তে আস্তে কথা বলে। নীলা ভাবল। একেবারে ঠিক তার স্বামীর উল্টো। অমলের হাতে হাত রেখে তার কাছে বসে বসে তার কথার স্রোতে ছোট্ট একটা নৌকার মত ওলটপালট খেয়ে ভেসে যেতে নীলার অদ্ভুত লাগে।

অমল শুরু করল,

—জানো নীলা জঙ্গল-বাংলা আমার দাদুর দাদুর আমলে কেনা হয়েছিল। তখন এখানে আমাদের বেশ কটা মহল ছিল। চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহলে আসবার সময় এই বাড়িটি দেখতে পান। তখন সোড়ো ছিল। তিনি কিনে মনের মত করে সারিয়ে সুরিয়ে নেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। কমলকুমারী ছিলেন কলকাতার এক বনেদী বংশের মেয়ে। এক বিয়ে বাড়ির অবসরে তাঁদের দেখাশোনা হয়। দুজনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ। তখনকার কালে বহুবিবাহে বাধা ছিল না। কিন্তু কমলকুমারী ছিলেন অনেক বড় বংশের মেয়ে। বোধহয় বাপমার একটিমাত্র কন্যা। অনুপম সুন্দরী। বিদুষী। পণ্ডিতের কাছে বাংলা সংস্কৃত পড়া শেষ করে সে তখন মেমসাহেবের কাছে পাঠ নিচ্ছে বিলিতি কেতা আর পিয়ানো বাজনার। তবে কমলকুমারী ভালোবাসতেন শাস্ত্রীয় গান। ওরই চর্চায় তাঁর প্রাণমন ঢালা থাকত। আরো অনেক বড় ঘরে তাঁর বিয়ের একেবারে ঠিক ঠাক, হঠাৎ শোনা গেল কমলকুমারী কুলত্যাগ করেছেন।

নীলা চকিতে তাকাল একবার।

অমল বলল,

—না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। তিনি অসতীর প্রাণহীন একটা মোমের পুতুল ছিলেন না। কমলকুমারীর নির্মল স্বভাব আর রুচিবোধই চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে অনেক বেশি টেনেছিল। এসব আমি তাঁর ডায়েরিতে পড়েছি। জঙ্গল-বাংলাতে আবার যখন যাওয়া আসা শুরু করলাম তখন তাঁর শোওয়ার ঘরের বইএর আলমারিতে ওই ডায়েরিখানা আমি আবিষ্কার করেছিলাম। ওটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে পড়ে শোনাবো। চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সাহেব বাড়ি থেকে কমলকুমারীর দুখানা রঙিন ফটোগ্রাফ্ করিয়েছিলেন তোমায় দেখাব।

নীলা অমলের হাতে হাত দিয়ে তার শরীরের উষ্ণতা নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে করতে বলল,

—আরো বলো। কমলকুমারীর কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে আমার।

—তারপর থেকে, মানে কমলকুমারীর গৃহত্যাগ করার পর থেকে চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জঙ্গল-বাংলায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। জমিদারী দেখতে আসাটা তাঁর একটা ছলই ছিল। বছর খানেক যাবে একেবারে আষাঢ়ে কাহিনীর মত অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। কমলকুমারী যে আশাপোড়া তাঁর খুব

কাছাকাছি ছিলেন এ খবরটা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। কমলকুমারী পাশের মহলের জমিদার মহাবীর সিংএর রক্ষিতা বাইজি হয়ে ছিলেন। মহাবীর সিংএর সদর মহলের ভিড় পছন্দ হয় না বলে কমলকুমারী জঙ্গলের পাশে নির্জন মহলে একটি বেহারী কায়দায় তৈরী বাঈকোঠায় থাকতেন। সঙ্গে থাকত দাসী চাকর বাবোয়ান। মাসে দুবার করে মহাবীর সিং আসতেন। জায়গাটা একেবারেই জনহীন ছিল। খুব ঘুরে ঘুরে বেহাতেই পরীব গ্রামবাসীদের দু'চারটে ছাউনি। তাই বেহাতের পশ্চাদপদতার প্রাবল্য এদের জনহীন অঞ্চলে না যাবলেও কিছু এসে যেত না! কমলকুমারী তাই খুব একলাবোধ করলে দাসীকে নিয়ে পাশের বনভূমিতে বেড়াতে বেরোতেন। কোনো কোনো দিন জঙ্গল-বাংলা পর্যন্ত চলে আসতেন। মুগ্ধ হয়ে দেখতেন বাংলাটা। অথচ জানতেন না এখানে আসার জন্যই একদিন তিনি কুলত্যাগিনী হয়েছিলেন। বিশ্বাস করে বেরিয়েছিলেন তাঁর এক সইএর স্বামীর সঙ্গে। কারণ জঙ্গল বাড়িকে এখানকার লোকেরা বলত নীলকুঠি। ওই জঙ্গলের মধ্যে পালবনের হাতখানে একটা ছোট্ট বিলের ধারে হঠাৎ কমলকুমারীর সঙ্গে চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর দেখা হয়ে গেল।

নীলা চমকে উঠে অমলকে বলল,

—বোলোনা, আর বোলোনা অমল। হঠাৎ আমার কেন এত ভয় করে উঠছে বলোত? ও যদি সব জানতে পারে অমল!

অমল হাসল।

—দূর, কি যে বলো? শেখর ত এখন পুরীতে। সঙ্গে আছে কলট্রাক্টর বস্তবিশ্বাস আর সিপে ঘোষের দলবল। এক গাদা এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে। বস্তবিশ্বাস নাকি তোমার 'ও' কে প্রিন্ করবার জন্যে ওই স্টেলা বলে নতুন স্টেনোটাকে রেখেছে।

নীলা হেসে বলল,

—এখনত ও সব ঘেঁষিয়ে ঘেঁষিয়ে করে লুকোয় না পর্যন্ত। কিন্তু এদিকেত কড়াকড়ির কমতি এমন কি মেয়ে বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে গেলেও ও দেখছ কি রকম করে! তাই ভয় করছে।

—কি ভয়?

—ধরো হঠাৎ সব ক্যানসেল করে যদি ফিরে আসে। যদি বাড়িতে আমায় দেখতে না পায়। যদি শোনে তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি। অমল নীলাকে খুব কাছে টেনে নিলে। নীলা নিজের বুকের দুরু দুরু নিজেই শুনতে পাচ্ছিল।

সান্ত্বনা দিয়ে অমল বললে,

—তাতে কি হয়েছে? দেখো নীলা শেখর তোমাকে অবিশ্বাস করারও প্রয়োজনবোধ করে না। সেকথা তুমিও জানো আমিও জানি। তবু যদি তোমার ভয় হয়, তুমি ত ওকে বলেই রেখেছ একলা লাগলে দু একদিনের জন্য তোমার পারিকা বন্ধু রঞ্জিতার কাছে দুর্গাপুরে যাবে। পড়িমসি করেও শেখরও রাজি হয়েছে। আবার যদি গেছে নতুন পাখা ষ্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ডটা নিয়ে যেতে। তবে?

নীলা বলল,

—না, কিন্তু না, তবুও কেমন যেন ভয় করছে অমল, আমিত ওটাতেই বেরিয়েছি কিন্তু……কিন্তু বোকার মত হরিকে বলে এসেছি রঞ্জিতাকে নিয়ে জঙ্গল-বাংলায় যাচ্ছি।·· কেন যে বলতে গেলাম।

অমল আশ্বাসের সমস্ত আকুলতা দিয়ে নীলার হাতটি নিজের বুকের কাছে টেনে নিল।

নীলা একবার শোফারের দিকে তাকাল। চাঁদ সিং এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝখানে কাচের পার্টিশন দেওয়া ব্যবধান। ওদের কথা শোনা যায় না। পাশে ডেলভেট মোড়া ভিতর দেয়ালে ঝোলানো। ফুলের আধার থেকে শাদা গোলাপগুচ্ছের গন্ধ আসছে। নীলার হেয়ারড্রেসিং এখন অমলের গ্যারাজে। রাস্তায় আসতে আসতে দুটো গাড়ি বদল করেছে অমল। এত সাবধানী। নীলা তাই অমলের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল।

চোখ বন্ধ করে নিজেই বুঝতে পারল মানুষের জীবনটা শুধু কতকগুলো বিষাদময় মুহূর্তের মালা। আনন্দ যেন কালো পাথরের মালায় ভুল করে গেঁথে ফেলা দু'একটা লাল মনীর মত হঠাৎ এসে যায়। সতের বছর বয়সে হিরো হেলে খেলে বেড়াচ্ছিল নীলা। কলেজে পড়ছে আর গান শিখছে। শেখর এমনি মাগালের বাইরের ভালো পাত্র যে, তার ইচ্ছে আর পছন্দ মত নীলাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। মা বাবা নেই। দাদা বৌদির ওপর নীলার আর জোরইবা কতটুকু। শেখর ত তখন নীলা বলতে পাগল। অতবড় ব্যবসা, জমিদারী, কলকাতা সহরে পনের খানা বাড়ি, দিনেমা হাউস, কলিয়ারী তার ওপর বিলেত ফেরৎ ফুটফুটে সাহেবের মত চেহারা। আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেই বুকটা সাতহাত হয়ে যায়। তখন ভালোবাসার আতিশয্যে শেখর বলেছিল নীলাকে পড়া ছাড়াবে না। কিন্তু বিয়ের পর পড়াশুনোর ফুরসৎ হলেত। খালি চরকির মত ঘোরা আর বেড়ানো, আর পার্টি আর নাইট ক্লাব। লং ড্রাইভ্ আর পিকনিক। আর হাওয়া বদল। কাশ্মীর দার্জিলিং উটি। নীলা আবেগের অত্যাচারে প্রায় হাঁফিয়ে উঠেছিল। তারপর খোকা এল। তখন তার বয়স একুশ। নীলা কিছু দিনের জন্যে দাদার বাড়ির থাকতে গেল। তারপর নার্সিংহোম। নার্সিংহোম থেকে খোকাকে নিয়ে ফিরে এসে আর স্বামীর মাগাল পেল না নীলা। নীলা শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। ভদ্র উচ্চবিত্ত পরিবারের। এই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলার খোলাখুলি উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন তার কোনোদিন ভালো লাগেনি। তার ওপর স্বামীর উদাসীন ব্যবহার বাইরে কাটানোর বাড়াবাড়ি অত্যধিক মদ্যপান তার মন একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। তবু খুব কষ্ট পেয়েছে নীলা বেশ কিছুদিন। তারপর কেমন করে যেন একদিন বুঝে গেল নীলা স্বামীকে সে আর কোনোদিনই ফিরে পাবে না। নীলাকে শেখর মেহগনি একটা পুতুলের মত খেলে টেলে এখন সংসারের তাকে তুলে রেখেছে। নীলা শান্ত বলে আর সব মেনে নিয়ে চুপচাপ আছে বলে তাদের এখনও বেশ সুখী দম্পতি বলেও ভুল হয়।

নীলা তবু বুক বেঁধেছিল। সে ভেবেছিল তবুও সে বাঁচবে। তার স্বামীকে বাদ দিয়ে খোকাকে নিয়েই বাঁচবে। খোকাই ত তাকে আবার সম্পূর্ণ নতুন করে ভরে তুলেছিল। আঃ খোকার নরম ছোঁয়া, তাকে কোলের কাছে নিয়ে শোয়ার নরম উত্তাপ, তাকে জামা পরানো, স্নান করানো, তেল মাখানো, নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, বুকে করে গল্প বলা, সব। পাঁচ বছর খোকা ছিল নীলার কাছে। কোল জুড়ে, বুক ভরে। ওই ছাব্বিশ বছর বয়সেই খোকাকে নিয়ে সে এমন হৈটৈবুঁ হয়েছিল যে তার আর বাড়তি কোনো আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহার কথা মনেই পড়ত না। এমন কি স্বামীর তাচ্ছিল্যও তার সয়ে গিয়েছিল।

নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বললে,

—সত্যি অমল, ও কেন খোকাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। দার্জিলিঙে বোর্ডিংএ পড়াতে!

অমল গাঢ় কণ্ঠে বলল,

—থাক, ওকথা আর ভেবে কি করবে নীলা। এই তিনটে দিন তুমি স্মৃতির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে

যাও। আমিও ত খুব অল্পই চেয়েছি তোমার কাছে। মাত্র তিনটি দিন। নীলা মাথা নেড়ে বলল,—হ্যাঁ তুমি অনেক কম চেয়েছ আর আমি তোমার কাছ থেকে অনেক বেশি পেয়েছি অমল!

—নীলা, আমার তখনই মনে হয়েছিল এ মেয়েটি একদম সুখী নয়। যখন তোমায় প্রথম দেখি। তখন তোমার খোকা হবে। শরীর খুব খারাপ। ফ্যাকাশে মুখ চোখের কোলে কালি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল শেখর জোর করে তোমাকে টেনে এনেছে। আর তারপর পার্টির শেষে তুমি তাকে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুলেছিলে। তার জ্ঞান ছিলনা বলতে গেলে।

নীলা লাজুক হেসে বলল,

—বাব্বা, এত কথাও তোমার মনে আছে!

অমল আপ্লুত গলায় বলল,

—তারপর তোমার গানের ওস্তাদের বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা। একদিন দুদিন তারপর অনেক অনেকদিন!

—অমল,

নীলা বলল,

—সত্যি অমল, আমিও তোমায় কিছু দিইনি! কিছুই না। তুমি কত ভালো ছেলে, কত ভালো গান করো, কত মেয়ে তোমার জন্যে .....

—ও কথা থাক নীলা।

—না, থাকবে না। অমল তুমি আমার সুখের জন্য কত ত্যাগ যে করেছ। তা আর কেউ না জানুক আমিত জানি!

অমল বলল,

—ও কথা থাক নীলা, তুমি নীলকুঠি, আমার অমল-বাংলার গল্প শুনতে চাইছিলে না? ওই ওই গাছগুলোর ফাঁকে, ঐ নীল কাম্পিন—

নীলা প্রশ্ন করল,

—ওই-ই অমল-বাংলা বুঝি?

নীলা কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে সব ভুলে গেল। সব। দুটি নিবিড় কালো ভ্রূর তলায় অত্যন্ত সরল, অথচ গভীর আর নিবিড় দুটি চোখ। দু চোখে বুকের ভিতরে লুকানো অমৃতের পূর্ণ পাত্র।

নীলা মনে মনে অমলের লতানো আঙুলগুলোয় ঠোঁট ছোঁয়াতে চাইল।

কিন্তু কথা বলতে চাইল শেখরের সঙ্গেই।

—শেখর তাকে একেবারে সন্ধ্যা আর কালপুরুষের বলে ফেলে দিয়েছিল ছাব্বিশ বছর বয়সেই। নিজের কাপাকড়ি হাত আর একাকীত্ব নিয়ে নীলা টানা লম্বা লম্বা দুপুর আর আঁধার হয়ে আসা একলা বিকেল গুলোয় ভাবত তার জীবনটা কি বিষম অর্থহীন আর দীর্ঘ হয়ে পড়ে আছে। অমল আবার তাকে তুলে এনেছে। তাকে বাঁচার অদ্ভুত আনন্দ আর শিহরিত জ্বর দিয়েছে। এও ত সুখ। নিজের ফুলা ফিরে পাওয়া। নিজেকে আবার কারো মুগ্ধ চোখের সামনে দেখা। সেই জন্যে আর তার শেখরকে মনে পড়ছিল। শেখর একবার এসে দেখে যাক, একটা অভ্যাস লোভও হচ্ছিল নীলার—যে নীলার জন্যে অমলের কত আগ্রহ। কত আয়োজন।

অমলের হাতে হাত রেখে নামতে নামতে নীলা খানিকক্ষণের জন্যে মুগ্ধ হয়ে জমল-বাংলার দিকে তাকিয়ে রইল।

সবুজ বনের মধ্যে নীল আর এলা রঙ্ দিয়ে মোড়া কাঁচ কাজ করা মস্ত বাড়ি। বিলিতি ধাঁচের গড়ন। পথিক থামে আর বিলাস দেওয়া লাল লাল জানলা। হোতলায় চওড়া ঢাকা বারান্দা। বোগেন-ভোলিয়ার তিন চার রঙের তিন চারটি লতা পাগলের মত খোপা খোপা ফুল ফুটিয়ে প্রায় ঢেকে দিয়েছে বাড়িটা। জানলার থাম, ছাদ, বারান্দার লাল টালির ছাউনি সব। পুরোপো বাড়ি আর বন জমলের একটা ঘনিষ্ঠ নিবিড় গন্ধ। শোফার চাঁদ সিং দরজা খুলে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়িয়ে নীলার মুগ্ধ রূপটি দেখছিল। তার পাকা গোঁফে খুশি আর প্রশ্রয়ের হাসি। চাঁদ সিং অমলদের অনেকদিনের পুরোনো লোক। নীলা জানে, নীলাকে তার খুব পছন্দ। চাঁদ সিং হেসে বলল,

—বাংলা পছন্দ্ হয়েছে দিদি!

নীলা বললে,

—হ্যাঁ চাঁদ সিং,

চাঁদ সিং সেলাম করে সরে গেল।

বাবুদের ওপরতলায় সমাজে এর ওর বৌ নিয়ে এভাবে বেরিয়ে আসাটা তাদের মত লোকার খানসামাদের চোখে বলতে গেলে কোনো নতুন দৃশ্যই নয়। তবে অমলকে কখনো এমন করতে দেখেনি ওরা। দেখেনি বলে বরং একটু চিন্তিতই ছিল। বাবু কি যাওয়া টাওয়া হয়ে যাবেন্ কি না কি? শুধু গান আর গান। ব্যস্ আর কিছু নয়। ওদের মধ্যে নানান আলোচনাও হ'ত। ওই হাড়বজ্জাত বাঈটাকে তালাক্ দিয়ে নীলাদিদি যদি বাবুকে বিয়ে করে ত চাঁদ সিং হয়ত খুশিই হবে। নীলাদিদি বড় শান্ত মেয়ে। কতদিন তার বাবু ও শেখরবাবুকে মস্ত অবস্থায় গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে। যে সব মেয়েরা বাবুর চারিদিকে ভীখের কাকের মত ঠোকর দিয়ে দিয়ে বেড়ায়, নীলাদিদি তাদের মত নয়। অনেক ভালো, রঙ্ মাখেনা, মদ খায়না। চাঁদ সিংকে সময় পেলে দেশ-ঘরের কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কেন যেন বিলাস, অমলের খাস্ খানসামা, যে ছোটবেলা থেকে অমলকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে,—কিছুতেই নীলাকে সহ্য করতে পারে না। লোকটি খুব ভক্ত! মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মনোভাব চেপে রাখতে পারে না।

নীলা গাড়িবারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখল বিলাস দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

নীলা হেসে বলল,

—বিলাস ভালো আছো!

বিলাস মাথা নীচু মোলায়েম হেসে বললে,

—দিদি আমাদের আর ভালো থাকা না থাকা! এখন খোকাবাবুকে রেখে যেতে পারলেই বাঁচি!

অমল বললে,

—থামো দেখি! যত পাকা পাকা কথা। নীলার ঘরটা ঠিক করে রেখেছত বিলাসদা!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঘর। দিদির চানের জল। সব। গাঙ্গাপুলার অবি ছুটিয়েছি একটা।

অমল বললে,

—বাঃ। চলো নীলা ওপরে যাই!

নীলা যেন কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে আপন মনেই বলল,

—বুঝলে বিলাস, অমল নীলকুঠি দেখতে এলো, আমিও চলে এলাম সঙ্গে। এত শুনেছি এখানকার কথা!

বিলাস মাথা নাড়ল। কিন্তু বলল না।

নিজের ঘরে ঢুকে নীলা একেবারে বিমূঢ়। অমল বিলাসের অলক্ষ্যে নীলাকে সেইন থেকে ইশারা করে জানাল, সে একটু পরে আসছে। নীলা ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। সিঁড়ির মুখেই ঘর। দুপাশে দুটি। বসবার জন্য লতাপাতায় ঢাকা বারান্দা। ঘর দুদিকে খোলা। ঝুরঝুরে জানলা দিয়ে বাগানের দেশী সুগন্ধি ফুলের গাছের ফুলও মাখামাখি হচ্ছিল; কাঠ গোলাপের মৃদু মৃদু, গন্ধ, স্বর্ণচাঁপা, কাঁঠালীচাঁপা আর গন্ধরাজের ডাল। ঘরের মধ্যেটা আরও মনোরম। ওপরে সাচ্চা অভ্রির ঝালর দেওয়া টানা পাখা। নীলা ভিতরে ঢুকতেই দুলতে আরম্ভ করেছে। দরজার কাছে নিকষ কালো একজন পাখাকুলী। ঘরের দেওয়ালে গোলাপের নক্সা রঙ। মনে হয় যেন রঙ নয় সিল্কের যোড়ক দেওয়া। তাতে তুলির টানে আঁকা গোলাপ গুচ্ছ। নীলা আঙুল ছুঁয়ে বুঝল অত্যন্ত সূক্ষ্ম শঙ্খের কাজ। আয়না বসানো আবলুশ কাঠের জংলা কাজ করা পালঙ্ক। এত সূক্ষ্মকাজ, যে কাঠের কাজ বলে মনেই হয়না। মনে হয় তারের কাজ। বিছানায় পুরু গদির ওপর লক্ষ্ণৌই বিছানার চাদর। চাদরের রঙ জলে গেছে। তার ওপর নতুন হাল আমলের বেড্-কভার পাতা ছিল বলে নীলার দৃষ্টিকটু লাগল। খাটের সঙ্গে মিলিয়ে ঘরের ড্রেসিংটেবিল, সেজ, বসবার কেদারা। সাটিন অভ্রি আর ভেলভেটের ছড়াছড়ি। দেয়ালে ঝোলানো রঙ্-জলা সাটিনের পর্দা দেখে নীলা প্রশ্ন করল,

—দেয়ালে পর্দা কেন বিলাস? ওখানে কি আছে?

—একজন অপরূপে বাইজির ছবি! বাবুর দাদুর দাদু ওঁর জন্যে মারা গিয়েছিল তাই বাবু ঢেকে রাখতেন। বিলাস বললে।

নীলার সব মনে পড়ে গেল। অমলের কাছ থেকে কমলকুমারীর—কাহিনীটি পুরো শোনা হয়নি।

নীলা গিয়ে আস্তে আস্তে পর্দাটা সরিয়ে দিলে। দেয়ালে সাজানো দুখানি ডিজাইনি এ্যালবেলভরা ফটোগ্রাফ্। তাদের আদি বাড়িতে এমন দুচারখানা এখনো আছে। সাহেববাড়ি থেকে করানো দামী ছবি। দুটি ছবিতে দুজন কমলকুমারী। একজন বসে আছেন উঁচু ইংলিশ কেদারায়। পাশের 'মেজের' ওপর কয়েকখানি বই। পরণে পার্শি সাড়ি, গলায় তখনকার হালফ্যাশানী মফ্‌চেন। পাতাকাটা এলোচুল। রোগা ছিপ্‌ছিপে বুদ্ধি উজ্জ্বল চেহারা। আর একটিতে লেস দেওয়া বড় গলার ভেলভেটের জ্যাকেট। এত বড় গলা যে গলার অনাবৃতস্থল উর্ধ্বতন দেখা যায়। পরণে ঘাঘরা। পদ্মা চুমকির কাজকরা ওড়নায় তলাদিয়ে মাথার টারবা আর কাপ্‌টা দেখা যায়। গলায় হারের পর হার। কোমরে চন্দ্রহার। হাতে বাউটি স্যাটের গয়না। এমনকি জড়োয়ার নথনচুড়। অনেক ফুল-পুরুষ মুখে হাসি, কিন্তু চোখে বিষাদ। নীলা তাকিয়েই ছিল। তার আর পলক পড়ছিল না। বিলাস বললে, শুনেছি ইনি মহাবীর সিংএর অত্যাচারে পালিয়ে এসে বাবুর দাদুর দাদুর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন জানো দিদি। তারপর মহাবীর সিং লেঠেল এনে দুজনাকেই টেনে বের করে খুন করে।

নীলা থর থর করে কেঁপে উঠল।

বিলাসের তা চোখ এড়াল না।

নীলা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মত টেবিলে রাখা সোরাই থেকে খানিকটা জল তারপর বিলাসকে বলল —আমি একটু বিশ্রাম করে তারপর স্নান করব বিলাস।

বিলাস বললে,

—বিকেলে তোমাদের জন্যে চমৎকার মালাই ক্ষীর আর নিমকি রেখেছি দিদি। রাতের জন্য মুর্শির মোগলাই রোস্ট আর বিরিয়ানী। পর্দা সরিয়ে বিলাস বেরিয়ে যেতেই নীলা আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে তিনটে মুখ দেখে চমকে উঠল। দুপাশে দুজন কমলকুমারী। আর মাঝখানে সে। দুশ্চিন্তার ভয়ে নীলার মুখ শুকিয়ে কুশ্রী হয়ে গেছে। নীলা তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে পর্দাটা টেনে দিল। ছবি দুটো ঢেকে আবার নিজের মুখোমুখি হ'ল নীলা। হঠাৎ তার মনে হ'ল এভাবে চলে না এলেই হয়ত ভালো হত। শেখর যদি জানতে পারে—যদি এসে পড়ে। যদি তাকে আর অমলকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। নীলা স্পষ্ট বুঝতে পারল শুধু একটা বিয়ের জোরে শেখর তার আর অমলের মাঝখানে নাছোড়বান্দা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ নীলার খোলাখুলি বিদ্রোহ করার যা বেরিয়ে আসার সাহসও নেই। খোকা তাকে কি ভাববে একথা ভেবেই সে কাঁটা। মায়ের এতটুকু পতন দুর্বলতাও সন্তানেরা কোনোদিন সহ্য করতে পারেনা। নীলা হয়ত আরো কত কথা ভাবত। ইতিমধ্যে অমল ঢুকল। আস্তে আস্তে নীলার কাছে এসে নীলাকে গভীর করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে অমল মাথানীচু করে তার বুকে মাথা লুকোলো। অস্ফুট স্বরে অমল বলল,—নীলা, নীলা আমি ভাবিনি, আমি ভাবিনি, তোমাকে এভাবে, এভাবে……

রুদ্ধ গলায় বলল নীলা, —আমিও না।

—অমল এই তিনটে দিনের কথা ভেবে আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি…সত্যি অমল এরচেয়ে আর বেশি চাইনে…

অমল আস্তে আস্তে নীলার হাতদুটি ধরে জানলার কাছে নিয়ে গেল। হাত বাড়ালেই গুচ্ছ গুচ্ছ কাঠগোলাপ।

অমল বললে,

—জানো নীলা তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর যখনই জংগল-বাংলায় এসেছি তখনই সাধ হয়েছে তোমাকে এখানে এই জংগল-বাংলায় এনে এই জানলায়, ওই বারান্দায় তোমার পাশাপাশি দাঁড়াব। আর তাতে এই বাগানের আর বনের সব রূপ সব ফুটে ওঠা—ভরে ওঠা সার্থক হয়ে উঠবে।

নীলা বললে,

—চেয়ে হয়েছে, এখন ছাড়ো ত। আমি চানটা সেরে নিই।

অমল বললে,

—তাহ'লে কিন্তু আজ বিকেলে চায়ের আগে আর দেখা হচ্ছেনা।

—মানে?

—আমি জঙ্গলের ভেতর একটা জায়গা আবিষ্কার করতে বেরোচ্ছি।

নীলা সাবানদানিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলল,

—আমিও যাবো!

—না আগে তোমায় নিয়ে যাবোনা। আগে আমি চিনে আসি জায়গাটা।

নীলা নাছোড়বান্দার মত আবদার ধরল,

—কোন ওষুধ বলো না। বলতেই হবে তোমায়।

—আজ বিকেলে তোমাকে নিয়ে সেখানে যাবো। যেতেই হবে।

ওখানে ওদের দুজনের নাম খোদাই আছে। তার তলায় তোমার আর আমার নামও খুদে আসতে হবে।

নীলা বলল,

—কোথায়?

—একটা শাল গাছের গায়ে। খুঁজতে দেরী হবেনা। ওখানে একটা ঝিল থাকবে। আমি জানি আমি চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর ডায়েরীতে পড়েছি।

নীলা হেসে বলল,

—সত্যি অমল তুমি একটা পাগল। তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল। স্নান করতে করতেই নীলা শুনল অমলের বড় গাড়িটা স্টার্ট দিচ্ছে। তাহ'লে চাঁদ দিও সঙ্গে থাকছে। নীলা একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। স্নান সেরে, গাঢ়লা বাসন্তি রঙের একটি বেনারসীর শাড়ি পরে নীলা বারান্দায় গিয়ে বসল। তখন বেলা সাড়ে তিনটে চারটে হবে। অমলের জঙ্গল-বাংলার বারান্দার এই লতাপাতার ঘেরা কোণটিতে এমনি বসন্তের বিকেলে যে সে এসে একবার বসেছে, নীলার মনে হ'ল সে শাড়ি কথাটার অর্থই বোঝেনি কোনদিন। চারিদিক সবুজ-সবুজে ছয়লাপ। আর আকাশটা একেবারে খাঁটি অমলিন নীল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বসে বসে নীলা এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ যেন আর চারপাশের এই শান্তি আর নরম নরম রঙের বন্যায় ডুবে যেতে লাগল। তারপর তন্দ্রায় আস্তে আস্তে তার চোখদুটি জুড়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ মনে হল নীলা জঙ্গল-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাশের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর গাছের জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে শুরু করেছে। তার পাশে আছে অমল। দুজন দুজনকে দারুণ ভয়ে যেন আঁকড়ে ধরে আছে। কিসের যে ভয় তা কেউ জানেনা। হাঁটতে হাঁটতে চারিদিক আরো ঘোর আঁধার হয়ে এলো—সামনে কিছু দেখা যায়না। পাশেও ভয়। কিন্তু সে ভয় অজানা বলে তত ভীষণ লাগছিল না। তাছাড়া এগোতেও ত কোনো অসুবিধা হচ্ছিলনা। কিন্তু পিছনের ভয় এত জানা, যে আপনা থেকেই পা দুটো যেন সামনে ছুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ অমল আর্তচিৎকার করে উঠল :

—নীলা, নীলা, আমি পড়ে যাচ্ছি, এখানে জল, চোরা দহ। নীলা আমি খাঁড়িতে তলিয়ে যাচ্ছি। হাত ধরো। আমার হাত ধরো। বাঁচাও। নীলা স্বপ্নের মধ্যেও একবার ভাবল অমলকে ধরবে কিনা। তারপর দুহাত বাড়িয়ে দিল। যখন বাড়িয়ে দিল, তখন জলের ভেতর থেকে কোনো কিছু ডুবে গেলে যেভাবে বুড় বুড় করে সেভাবে হাওয়ার বুদ্ বুদ্ ওঠে সেভাবে শব্দ উঠতে লাগল।

ঘেমে নেয়ে জেগে উঠে নীলা দেখল পশ্চিমে সূর্য চলে গেছে। অপরাহ্নের লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে জঙ্গল-বাংলাকে একেবারে অন্যরকম আর অদ্ভুত অচেনা লাগছে।

নীচে রান্নাশালে বিলাস আর অন্যান্য স্থানীয় চাকর বাকর অস্ফুট কথাবার্তার আওয়াজে নীলা যেন খানিকটা সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের ঘরে যেতে গিয়ে তার কেমন যেন কৌতূহল হ'ল। সে অমলের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পড়ন্ত বিকেলের চাপা আধো অন্ধকারটাকে নীলার চিরকালই খুব খারাপ লাগে। আর এঘরটা এমন গম্ভীর। পুরোনো আমলের বড় বড় আলমারি ঠাসা বই। বই আর বই। আর লম্বা একটি পালঙ্কে বিছানা। একপাশে অমলের স্যুটকেশ্। তার তালা খোলা। জামা কাপড়ের

ওপরেই রয়েছে ছেঁড়া পুরোনো একটা বাঁধানো বই নীলার হঠাৎ মনে হল, আজ সারাদিন সে কিছু পড়েনি। বইটি হাতে করে খুলে দেখেই নীলা চিনতে পারল। আরে এই-ইতো চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর ডায়েরী। সময়ের ভার সরাবার জন্যে নীলা ডায়েরীটা নিয়ে নিজের ঘরে চলল।

সবে ডায়েরীটা খুলতে যাবে, পর্দা সরিয়ে ঢুকল বিলাস। হাতে ট্রে ট্রেতে বিকেলি কেতার চা-দানী আর ফুলীকৃত খাবার।

দিদি বাবুত এখনও ফিরলেন না। তুমি একটু চা খেয়ে নাও উনি এলে আবার চা করে দেব।

নীলা প্রথমে ভাবল, চা টা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এতটা পাতিব্রত্য হলে মানায়, নাহলে যেন চোখে এই ভেবে চা টুকু রেখে দিল।

নীলা ঘনিয়ে আসা অপরাহ্নে আধোছায়ায় কষ্ট করে কি যেন পড়ছে দেখে বিলাস একটা শেজ বাতি নিয়ে এল।

নীলা বিলাসের দিকে যেন চোখ রাখতে পারছিল না। দারুণ অস্বস্তি লাগছিল তার। গৃহকর্তা এতক্ষণ অনুপস্থিত। এরজন্য যেন বিলাসের চিন্তিত ভ্রূকুটি দায়ী করছে তাকে।

বিলাস সম্মানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনেও নীলা পড়ে যেতে লাগল,

"আজ কমলকুমারীর সহিত দেখা হইবার দ্বিতীয় দিন। সেদিন কমল তাহার কাহিনী সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। তাহার দাসী আসিয়া মহাবীর সিং-এর আগমন বার্তা জানাইলে সে ত্বরিতে চলিয়া যায়। আজ তাহার কাহিনীটি শেষ করিল।

আমাকে নাকি সে ঐ ভদ্রলোকটির হাতদিয়া পর পর কয়েকটি পত্র প্রেরণ করে। উত্তর না পাইয়া আমার নিকট আসিতে চায়। আমি জঙ্গল-বাংলায় বেড়াইতে আসিয়াছে শুনিয়া সেই বিশ্বাস খাতকের সহিত রওয়ানা হইয়া যায় বিহারের পথে। যখন সে সব বুঝিতে পারিল তখন তাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কমলকুমারী বুঝিল যে সে কূলের বাহিরে। তা সত্বেও সে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আর একটি ঘোড়ার গাড়িতে কয়েকটি মহিলার নিকট আশ্রয় নেয়। তাহারা বাইজি, মহাবীর সিং-এর মুজরো করিতে যাইতেছিল। কমলকে তাহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কমলকে তাহারা আদরে নাচায় নাই কিন্তু কি করিয়া যেন তাহার অনুপম রূপ সাধনা মহাবীর সিংএর চোখে পড়িয়া যায়। তিনি উৎকোচ প্রদান করিয়া বাইজিকে হাত করেন। ও কমল-কুমারীকে রাখিয়া দেন।

এই পর্যন্ত পড়ার পর নীলার মনে হ'ল কোথায় যেন অদ্ভুত সব শব্দ কলরোল শোনা যাচ্ছে। চোখ তুলে দেখল বাইরের পাংলা হাল্কা রঙের বসন্ত সন্ধ্যার গায়ে কে যেন কালিমেড়ে দিয়েছে। গাছের মাথাগুলো তুমুল ভাবে নড়ছে। বিলাস জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল,

—এত ঝড় উঠল, তবুও খোকাবাবু এলেন না।

নীলারও কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছিল। এত কাণ্ড করে এত ভয় আর ঝুঁকি নিয়ে তাকে এনে অমল কেন সারা সময়টাই বাইরে বাইরে ঘুরছে।

আশ্চর্য। আর বিলাসের চোখের দৃষ্টি ক্রমশ যে রকম কঠোর হয়ে আসছে! কাঁচের শার্শির পাশ দিয়ে দেখল বাইরে ঘোর বর্ষা নেমেছে।

নীলা মাথা তুলে বিলাসকে এবার বলল,

—তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে বিলাস। একটু চায়ের জোগাড় দেখে এসে ওপরে বসো।

বিলাস কোনো কথা না বলে নেমে গেল।

ঘরের মধ্যে আধো অন্ধকারে আলমারি পত্রগুলোর পালিশ চকচক করে জ্বলছে। 'ফেডের' পাশে আরাম চেয়ারে বসে নীলা চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর জীর্ণ ডায়েরীটা খুলে বসল। এবারে শেষ পাতা।

"কাল কমলকে লইয়া আসিব। তাহার জন্য সারাবাড়ি সাজাইয়াছি। মহাবীর সিং সব জানিতে পারিয়াছে। তাহার জন্য কিন্তু ভাবিনা। আমার লেফটেনেন্ট দুই চার দিনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। কমল ত কাহারও বাঁদি নহে। বাইজির ষড়যন্ত্রে সে মহাবীর সিং-এর ফাঁদে পড়িয়াছিল। সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে সে জংগল-বাংলার এত কাছে রহিয়াছে। কারণ এই বাড়িটিকে স্থানীয় লোকেরা নীলকুঠি বলে।

শেষ পর্যন্ত কমল আমার হইবে আমি তাহা ভাবিতেও পারি নাই। সে আসিতেই চাহে নাই। কিন্তু জীবনটাকে এভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়া লাভ কি? অবশ্য কমলকে তাহার আগে কথা দিতে হইয়াছে যে আমি আমার স্ত্রীপুত্রের প্রতি যথার্থ কর্তব্য করিব। কাল কমলের ফটোগ্রাফ দুইটি কলিকাতা হইতে বাঁধাইয়া আসিয়াছে ....."

হঠাৎ নীচে গাড়ি থামবার শব্দ লোকজনের একটা দারুণ কোলাহল শুনে নীলা ডায়েরী ফেলে উঠে দাঁড়াল। নীচের উঠোনে অমলের গাড়ি থেকে নেমে জলকাদা মাখা অবস্থায় চাঁদ সিং দাঁড়িয়ে আছে। নীলাকে ওপরের বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়তে দেখে বলল, অমল বনের ধারে একটা মজাবিলের ভিতর ঝাঁকি আর চোরা পাঁকে তলিয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে বিলটাকে খুঁজে বের করে একটা শাল গাছ খুঁজছিল অমল। তাতে নাকি তার দাদুমশায়ের নাম লেখা আছে। বিলের অনেক জায়গা এমন মজে গেছে যে জমির সমান মনে হয়। অমল বুঝতে না পেরে তার মধ্যে পা দিয়ে ফেলে। তারপর দু একবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই ঝামঝাঁকির মধ্যে থেকে মাথা তুলতে পারেনি। দেহ যদি আপনি ভেসে ওঠে তাহলেই পাওয়া যাবে। নাহলে কোনদিন আর পাওয়া যাবে না।

নীলা আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। বিছানার চাদরে মুখ ঘষতে ঘষতে অসহায়ের মত বলতে লাগল, সব দোষ আমার, সব আমারই দোষ। কিন্তু কি আশ্চর্য নীলার চোখে কিছুতেই এক ফোঁটা জল এলনা।

মাঝরাতে নীলার চৈতন্য ফিরে এল শেখরের ডাকে। চোরালো গলায় হাঁকডাক করতে করতে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। কণ্ঠস্বরের পিছন পিছন এলো মানুষটা। পরনে সাহেবী পোষাক। চালচলনে রুক্ষ সন্দিগ্ধ ভাব। পর্দাটাকে যেন ছিঁড়ে খেঁড়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল শেখর। তার অশান্ত চোখ দুটো ঘরের চারদিকে ঘুরছে।

—ব্যাপার কি? হঠাৎ অমলের সংগে জংগল-বাংলায় চলে এলে? আমিত জানতেই পারতাম না যদি না বড় স্টেশন ওয়াগনটা খারাপ হয়ে যেত। গাড়ি বদলাতে কলকাতায় ফিরে না আসতাম।

—অমল, অ-মল, কৈ অমল ত

ভয়ে আতংকে নীলা যন্ত্রচালিতের মত কথা বলছিল।

তুমি না বলেছিলে দুর্গাপুরে কে বন্ধিতা আছে তার বাড়ি যাবে?

—রঞ্জিতা, রঞ্জিতাইত অমল-বাংলায় আসতে চাইল।

নীলা ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছিল।

—কোথায়? তোমার বন্ধু রঞ্জিতা কই? ডেকে আনো!

শেখর বলল।

নীলা হতাশ হয়ে শেখরের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকালো।

এবার শেখর চিৎকার করবে, লাফাবে, তেড়ে মারতে আসবে তাকে। হয়ত খুন করেই ফেলবে। কিম্বা বাঁচিয়ে রাখলেও খোকাকে দত্ত বলে নেবে। যাতে সারাজীবন খোকা তাকে ঘেন্না করে।

হঠাৎ পিছন দিকের দরজার পর্দাটা দমকা হাওয়ায় খানিকটা নড়ে উঠল। শেষের শিখাটা দপ্ দপ্ করে উঠল হাওয়ার তোড়ে।

তারই কম্পিত শিখায় নীলা আর শেখর দুজনেই দেখতে পেল তাকে। ঘোর নীল রঙের সোনালী ছবির কারুকাজ করা পাশি শাড়ি পরা ছিপ্ছিপে তন্বী মেয়েটি। গলায় চওড়া সোনার মাফচেনের মাত্ত পাক। কানে ঘণ্টার মত ভারি দুল। উজ্জ্বল দুটি চোখে গভীর বিষাদ আর করুণ একটি অনুনয়। যেন শেখরকে সে এবাড়ির শান্তি ভঙ্গ করতে বারণ করছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সরে গেল মেয়েটি। শেষের বাতির নীলাভ শিখাটি বোড়ো হাওয়ার আছাড় সহ্য করতে না পেরে দপ্ দপ্ করে উঠে নিভে গেল।

—শেখর পকেট হাতড়ে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে বলল,

—ওঃ এই কাণ্ড। বন্ধুকে প্রেম করতে সাহায্য করা হচ্ছে!

অনেকগুলো কাঠি খরচ করে কোনো রকমে শেষটা জেলে দিলে শেখর। মায়ের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নীলা প্রশ্ন করল,

—তু-তুমি বুঝলে কি করে?

—তোমার বন্ধুর চোখে মুখে সব যে লেখা আছে!

তারপর কেমন অদ্ভুত সুরে বলল,

—সত্যি নীলা তোমার একটু লুকিয়ে চুরিয়ে একটু চরিত্র খারাপ করারও পাইস নেই! আমি এদিকে কত কি ভাবতে ভাবতে আসছি। বিশ্বাস করো পকেটে করে আমার সোডেড্ রিভলভারটা পর্যন্ত এনেছি।

নীলা খাটের বাজুটা ধরে দাঁড়িয়েছিল। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় তার মুখ নীল। তবু ক্রমশ তার উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে আসছিল। শেখরের কথা থেকেই সে মিথ্যে গল্প বানানোর অনেক উপাদান পেয়ে যাচ্ছিল।

—তোমার বান্ধবীকে চাপিয়ে দেখতে! তা অমল কোথায়? ওর প্রেমিকই ত অমল। তাই না?

—না।

—তবে?

—চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী!

—অ, তোমরা দুটিতে সাহায্যকারী মাত্র। আকম্প্লিস? নীলা এই কিন্তু শেষ। এরপর আর কখনও তোমাকে এ ধরণের বাজে বন্ধুকৃত্য করতে না শুনি। বাব্বা আজ দুপুরে বাড়ি ফিরে খালি বাড়ি দেখেই বুঝতে পেরেছি তোমার কতো···মানে···ভালোবাসি। এনি ওয়ে আই প্রেজ্ ইয়ু, নীলা তোমার পাইস না থাকুক হার্ট আছে। তা তোমার বন্ধুটি কোথায়। অমলচন্দর?

নীলা যেন অমলকে চেনেনা, যেন অমলের মৃত্যুটা তার কাছে কিছুই নয় এমনি সুরে বলল,

—অমল আজ দুপুরের দিকে চোরা পাঁকে ডুবে মারা গেছে।

ওর ঘড়িটা এখনো তোলা যায়নি।

—কি সর্বনাশ! অস্বাভাবিক মৃত্যু! নীলা সেইন্স যেন এ মৃত্যু।

আমি আর থাকতে চাইনে। অনেক ঝামেলায় পড়তে হতে পারে

নীলা যন্ত্রচালিতের মত উঠে পড়ল।

অমল খেমে দাঁড়িয়ে বলল,

—আর তোমার বান্ধবী? তাঁকে ডাকো। তিনিও ত যাবেন

নীলা বলল,

—ও চলে গেছে।

—চলে গেছে? কার সঙ্গে?

—চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সঙ্গে।

নিঃশ্বাস ফেলে বলল নীলা।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে শেখরনাথ বলল,

—অমল বেচারী তাহলে বিনা কারণেই মরল?

নীলা বলল, মানে?

শেখর বলল—নাঃ কিছু না।

গাড়িতে শেখরের পাশে বসে নীলা সন্তর্পণে অমলের জন্য একটা গুরুনো নিঃশ্বাস ফেলল। এত সন্তর্পণে যে শেখর যাতে টের না পায়। তারপর কাকে যেন লক্ষ্য করে মনে মনে বলে উঠল নিজে অভাগী ছিলে বলেই কি আমাকে বাঁচাতে এসেছিলে? কেন এসেছিলে। বেঁচেই বা কি লাভ।

আশ্চর্য। এতক্ষণ পরে অমলের জন্য নয়, কমলকুমারীর কথা ভেবে নীলার দুচোখ ভরে জল এল।

অমলের সম্বন্ধে কি একটা খেদোক্তি করতে গিয়ে শেখর নীলার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু চমকে উঠল।

—তুমি কাঁদছ নীলা? অমলের জন্য।

একরাত্রেই নীলা কি পাকা অভিনেত্রীই না হয়ে উঠেছে।

নিজেই নিজেকে তারিফ দিয়ে সে হেসে বললে,

—নাঃ অমলের জন্য কাঁদব কেন? আমার সে গাইগই নেই। আজ দুপুরে একটা পুরোনো নভেলের নায়িকার কথা ভেবে চোখে জল এল।

নীলা চমৎকার একটা রসিকতা করেছে মনে করে শেখর হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। তারপর ফ্লাস্ক থেকে একমাত্রা চাঁতা বিয়ার গলায় ঢেলে নিয়ে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

নীলা জানতেও পারল না চায় সিংকে টাকা খাইয়ে তার বেরিয়ে মুখবন্ধ করে অন্ধকার বনভূমির নির্জনে শেখর অমলকে গুলি করে ঝিলে ডুবিয়ে দিয়েছে।

———

আপনি আচরি ধর্ম্ম

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

অনেক কালের বনেদি পাড়া। আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এতকাল মাথা উঁচু ক'রে ছিল। গোয়াকবাজী, ইতরামী, দলাদলী, মারামারি, বোমাবাজী, ছিনতাই এর একটিরও অনুপ্রবেশ ঘটতে পারেনি। কিন্তু কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে এতকালের এই ঐতিহ্যের গোড়ায় নোনা জল ঢুকতে সুরু হয়েছে।

সন্ধান দিল চণ্ডী। পাড়ার সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করেই সে মুখ খুলল। এতকাল এ পাড়ায় একটি মাত্র পূজা হ'ত। এবারে হবে দশটি। এই নিয়ে সর্ব্বপ্রথম চীৎকার সুরু করলেন হরিখুড়ো। শিক্ষা দীক্ষা রাজনীতির ঘূর্ণী জলে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে বাণী বন্দনার সংখ্যাও তত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

পাড়ার বারোয়ারী গোয়াকে বড়দের পরামর্শ সভা বসেছিল। চণ্ডীখুড়োকে ইঙ্গিতে থামতে বলে কানের যন্ত্রটা পরিয়ে নিয়ে বলল, আগে প্রস্তুত হ'তে হাও খুড়ো।

খুড়ো পুনরায় তাঁর বক্তব্য পেশ করতে চণ্ডী একটু হেসে বলল, ওদিকে নজর দিও না খুড়ো। খাতা এগিয়ে দিলেই কিছু দিয়ে দিও নইলে

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হরিখুড়ো চীৎকার করে উঠলেন, তোমার আর কি চণ্ডী, সারা বাড়ীতে দুটিমাত্র প্রাণী। কিন্তু আমাদের চাঁদার জ্বালায় প্রাণ কণ্ঠাগত। একটা পাড়ায় দশ দশটা পূজো!

একটি অল্প বয়সী ছেলে পাশ দিয়ে চলছিল মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে সে বলল, দিয়েছেন ত চার আনা করে…

চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটি। কিন্তু হরিখুড়োর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ল। তীব্র ভাষায় তিনি বললেন, কথাটা শুনলে তোমরা। দিয়েও সুনাম নেই। তুই ত বলে গেলি চার আনা। আমি যে সবসুদ্ধ আড়াই টাকা গুণাগার দিলাম তার হিসেব রাখিস তোরা? কিন্তু এ কথা কি বলবার উপায় আছে? মরছি অভাব অনটনের জ্বালায়

কানের যন্ত্রটা আর একবার ঠিক করে নিয়ে চণ্ডী হেসে বলল, কার অভাবের কথা বলছ খুড়ো? তোমার? কিন্তু তোমার ছেলেদের "টেরী"র জৌলুসে যে পাড়া বলসে গেল।

নাক সর্ব্বস্ব রামকানাই বলল, "টেরী" বস্তুটি কি চণ্ডীভায়া। নতুন কোন "কোডের" ভাষা নয় ত?

বিধু বলল, তার মানে?

রামকানাই বলে, মানে কি ছাই আমিই জানি। এইত একটা শব্দের নতুন মানে শুনে এলাম মাস্টারের কাছে।

বিধু বলল, কি শব্দ?

হর হর বম বম। রামকানাই বলল, অর্থাৎ বিনা বোমা মেরে হরণ কর।

হরিখুড়ো একটু যেন চমকে উঠলেন। কিন্তু সে ভাব মুহূর্তে কাটিয়ে উঠে রামকানাইকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি দিনকে দিন বড় হ'য়ে যাচ্ছ রামকানাই। "টেরীর" মানে আজ একটা দু' বছরের ছেলেও জানে চণ্ডী। টেরীলিন, আর টেরীকটনের কথা বলছে।

চণ্ডী বলল, হরিখুড়ো কিছু না জানার ভান করলে মানাত ভাল। খুড়ো নিজে ছেঁড়া পরে আমাদের চোখে ধুলো দিলে কি হবে, ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে খুড়ির কথা হাইকোর্টের রায়।

হরিখুড়ো উচ্চ কণ্ঠে বলেন, একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে চণ্ডী।

চণ্ডী হেসে বলে, সত্য কথার এই এক মহাদোষ—

রামকানাই বোকার মত চেয়ে থাকে। এদের কথার গতিপথ তার কাছে কেমন যেন জাপসা কিন্তু খুড়োর চেহারাটা ভোঁতা হলেও বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ। হাঁ করতেই বুঝে ফেলেছেন।

চণ্ডী কানের যন্ত্রটা আর একবার অকারণে ঠিক করে নিয়ে বলে, বোকা লোকগুলোই বেশী চেঁচায় —অজ্ঞতা ঢাকবার সহজ পথ।

হরিখুড়ো চণ্ডীকে বেশী ঘাঁটাতে চান না। ও কানে খাটে বলেই উচ্চকণ্ঠ। তার উপর স্পষ্ট-বাদী। তাছাড়া ওর আজকের কথাবার্ত্তাগুলো রীতিমত বেসুরো। তবে একেবারে চুপ করে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। বলেন, তুমি ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে টানাটানি করছো চণ্ডী, তোমার খুড়ির কথা আমি টেনতে পারি না, কিন্তু এর মধ্যে দোষের কি আছে? সংসারের শান্তি রক্ষার জন্য সব পুরুষকেই এটুকু সহ্য করতে হয়।

চণ্ডীর মুখ বন্ধ করতে গিয়ে নিজের অজান্তে তাকে আরও উসকে দিলেন খুড়ো।

চণ্ডী খুক খুক ক'রে হেসে উঠল।

অমন করে হেসো না চণ্ডী। হরি বাঁড়ুজ্জে এসব হাসির তোয়াজা রাখে না। সে ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরে বেড়ালেও কারুর কাছে হাত পাতে না। কোনদিন পাতবেও না।

চণ্ডী তেমনি হাসি মুখেই বলে, এইটুকু স্বীকার করলেই ত চুকে যায়। ছেঁড়া জামার আড়ালে আত্মগোপন করে বেড়ানোতেই আমাদের আপত্তি।

তবে কি চাক বাজাব?

দরকার হবে না। সে দায়িত্ব তোমার চাচা প্যাণ্টরাই একদিন নেবে খুড়ো।

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করে, কি রকম ··কি রকম···

চণ্ডীর কণ্ঠে খানিকটা বাঙ্গের ছোঁয়া। বলে, দুচার দিনেই জানতে পারবে সবাই। চণ্ডী অনেকেরই অন্তরমহলের খবর রাখে। নেহাৎ গায় পড়ে কিছু বলতে চায় না। কিন্তু আর চুপ করে থাকলে আমাদের পাড়ার বদনাম হবে। না না খুড়ো পালাবার চেষ্টা করো না। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। নিজের হাতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছ সে বিষের ক্রিয়া তোমার মধ্যে যে সুরু হয়েছে তা আমি জানি, কিন্তু আর দশটা শান্তিপ্রিয় পরিবারের মধ্যে সে বিষ আমরা ঢুকতে দেব না। হয় তুমি ঘর সামলাও নয়ত নিজে ঘর ছাড়ো।

এই শেষ কথাটায় হরিখুড়ো একেবারে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন, তুমি আমাকে পাড়া দেখাচ্ছ চণ্ডী? আমি তোমাকে গোটা দেশের দিকে তাকিয়ে দেখতে বলছি। ও সব লঘাচওড়া হাঁতোশদেশে পেট ভরে না।

আবার খুক খুক করে হেসে ওঠে চণ্ডী। বলে, তুমি একথা বলতে পার খুড়ো। সকল মানুষের পেট ত আর এক আকারের হয় না। কিন্তু আমার কথাটা তা নয় খুড়ো। আমি বলি নিজের দিকে তাকাও। নিজেকে দেখো। বাইরের সমস্যা ত ঘরকে নিয়েই খুড়ো।

মুখোস যখন খুলেই দিতে উদ্যত হ'য়েছে চণ্ডী তখন মুখ রক্ষার জন্যই হরিখুড়ো চীৎকার করে উঠলেন, যার ঘর নেই সে ঘরের মর্ম্ম কেমন ক'রে বুঝবে হে। ঘরে দুটো' কচি কাচা থাকলে তোমার ঐ মতলবটা বুলি তলিয়ে যেত হে চণ্ডীবাবু।

চণ্ডীর হাসিটা একেবারে প্রচণ্ড বেগে ফেটে পড়ল। হাসির দমকে কানের যন্ত্রটা সম্ভবতঃ ঢিলে হয়ে গিয়ে থাকবে। দ্রুত হাতে ঠিক করে নিয়ে চণ্ডী ফিসিয়ে ফিসিয়ে বলতে লাগল, মোক্ষম খবরই পেয়েছি তাহলে, খুড়ো এবারে তোমার ঘোড়া সমলাও।

রামকানাই ওদের কথার মাঝে ফোড়ন কাটল, ঝগড়াটা একটু সহজ ক'রে হয় না চণ্ডীদা? আমরাও খানিকটা উপভোগ করতে পারতাম। মানে বুঝতে সুবিধে হত।

চণ্ডী বলল, ঝগড়া নয় রামকানাই। এটা হল ঢাক পেটার প্রথম পর্ব্ব! ঢাক যখন সত্যি সত্যি বেজে উঠবে তখন কত রকমারী নাচ দেখবে তোরা।

হরিখুড়ো সহসা আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে গর্জ্জে উঠলেন, শেষ পর্য্যন্ত সামলাতে পারবে ত' চণ্ডী?

চণ্ডী নিরীহ ভঙ্গীতে জবাব দিলে, পারা খুবই শক্ত খুড়ো। সেই জন্যেই মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর সাহস দিনকে দিন বেড়েই চলেছে, যারা শান্তিপ্রিয় তারাও ভয়ে আড়ষ্ট! এই ভীতিকে দূর না ক'রতে পারলে ডুবন্ত দেশ একেবারেই তলিয়ে যাবে।

হরিখুড়োর দু'চোখে আগুন। বললেন, তুমি কিন্তু জেনে বুঝে আগুনে হাত দিতে যাচ্ছ চণ্ডী।

চণ্ডী শান্ত হেসে বলল, পুড়ে যাবার ভয় আছে তা জানি। কিন্তু কিছু ছাওয়াইয়ের ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে বইকি খুড়ো। তুমি শুধু একদিকের কথাই ভাবছ। তুমি কেন অনেক রথী, মহারথীরাও এই একই পথে চিন্তা করে এগিয়ে চলেছে। এই এগোন যে পিছু হটার নামান্তর এইটেই তারা বুঝেও বুঝতে চায় না। তাদের স্বার্থপরতার বলি, যে একদিন নিজেদেরই বংশধরা হতে চলেছে এই কথাটাই কথায় এবং কাজে দেখাতে হবে প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয় মানুষকে।

হরিখুড়োর কণ্ঠে ব্যঙ্গ, আমায় যে হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে চণ্ডী।

করবে বইকি খুড়ো, চণ্ডী বলল, বক্তৃতা আর হাততালি দেওয়া যে আমাদের জাতীয় স্বভাব। তুমি আমিও ব্যতিক্রম নই। আমরা ভুলে গেছি যে, কাজের দ্বারাই কাজের মূল্যবোধ অম্লান থাকে। শুধু····

বাধা দিলেন হরিখুড়ো। বললেন, তাই বুঝি তুমিও এতক্ষণ ধরে জাতীয় স্বভাবের পরাকাষ্ঠা দেখালে? কিছু কাজ করে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখালে না কেন?

খুড়ো তোমার আদেশ শিরোধার্য্য। এবারে কাজেই নামবো তবে দেশের কাজে নয়। পাড়ার কাজে। আর আমার প্রথম শিকার হবে তুমি।

হরি খুড়োর মুখোভাব রীতিমত কঠিন হয়ে উঠল। বললেন, কথাটা আমিও তোমাকে ঘুরিয়ে বলে যাচ্ছি ভায়া। চলে গেলেন হরি বাঁড়ুজ্জে। তিনি দৃষ্টির আড়াল হতেই রামকানাই বলল, আড়াই টাকা চাঁদা নিয়ে একটু বেশী হয়ে গেল নাকি চণ্ডীদা?

আড়াই টাকাটা উপলক্ষ রামকানাই। হরিখুড়ো ছেড়া আমার নামাবলি পরে থাকেন। খুঁটি

চালান নিজের ছেলে মেয়েদের আর অনুগামীদের সাহায্যে। রাতের অন্ধকারে এদের আসা যাওয়া। অনেকের চরিত্র নষ্ট করে ঘুড়ো আদর্শ চরিত্রবান। চোখের জল ফেলেন যুবশক্তিকে বিপথগামী বলে। অথচ বিপথের সন্ধান দিয়ে সিংহভাগটা নিজের সিন্দুকে তোলেন।

চণ্ডী একটু থেমে পুনরায় বলে, এই বিপথগামীদের সত্য পথের সন্ধান দিতে পারলে তারা ঘুরে দাঁড়াবে, না একথা আমি বিশ্বাস করি না। আসলে সন্ধান দেবার নিঃস্বার্থ লোকেরই একান্ত অভাব। নইলে প্রচণ্ড উন্মাদ যুবশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশকে অনেক···

রামকানাই সহসা হাত তুলে চণ্ডীকে থামিয়ে দিল, থেমো গার্গো···

চণ্ডীর কণ্ঠে বিস্ময়, থেমো ?

হাঁ হাঁ থেমো দি স্পাই। মাতাহারি···ঘুড়োর মেয়েটা এদিকে আসছে।

চণ্ডী মেয়ের সঙ্গে বলল, আমাদের এই ভয়ই ওদের অস্ত্রের কাছে শক্তি যোগাচ্ছে রামকানাই।

মাথা নাড়তে নাড়তে রামকানাই বলে, বুঝতে পারছি না চণ্ডীদা।

কি বুঝতে পারছ না ?

গার্গো আগে চলে যাক

ওরা যে সন্দেহ করছে তা অনুমান করেই মেয়েটা সরে পড়ল।

চণ্ডী বলল, নাও এবার নির্ভয়ে বলতে পার।

রামকানাই বলল, ওদের শক্তিকে অত ছোট করে দেখ না চণ্ডীদা, বিপদে পড়বে।

চণ্ডী বলল, বিপদ নেই এমন কথা আমি একবারও বলিনি। ওদের শক্তিকে ছোট করেও দেখি নি। আমি সমুদ্রের জলকে বোতলে ভরে ফেলবার কথা ভাবছি।

বিধু অনেকক্ষণ চুপ করে শুনছিল। পুনরায় সে মুখ খুলল, সমুদ্রের জলকে বোতলে ভরে ফেললে তাকে সমুদ্রের জল বলা চলে কি চণ্ডীদা ?

চণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, কেন চলবে না বিধু। খাঁচায় পোরা বাঘকে কি বাঘ বলা হয় না বিধু। তুমি বোধ হয় রূপ আর প্রকৃতির কথা ভাবছ ? ও বস্তুর ত মৃত্যু হয় না ভাই। বৃহত্তর শক্তির সাহায্যে আয়ত্তে এনে নিয়ন্ত্রণ করা চলে। এ যারা পারে না তারাই এই শক্তিকে বিপক্ষে ঠেলে দিয়ে আর্তনাদ সুরু করে। এরাই সকলের চেয়ে বড় অপরাধী যারা সাধারণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেরা অসাধারণ হয়ে উঠতে চায়। এদের মুখোস খুলে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বিধু একটু হেসে বলল, কিন্তু এগিয়ে আসবে কে ?

চণ্ডী বলল, এতক্ষণ ধরে দেখছি মিথ্যেই বকে গেলাম। তোমার কাজ তুমি করলে আমার কাজ আমি করে নিলে কোন সমস্যাই সমস্যা নয়। যারা সুযোগ পেয়ে নিজেদের বেয়াদ খুশীর রোলার চালিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছে তারাও ভয় পেয়ে জেগে উঠবে। কেঁপে উঠবে তাদের পায়ের তলার মাটি। সংঘবদ্ধ মেয়েই অসংঘবদ্ধের মৃত্যু ঘটান সম্ভব। অসংঘবদ্ধ অসংঘবদ্ধের শক্তিকেই আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে বিধু।

বিধু বলে, তুমি বর্তমান যুগের দিকে চোখ রেখে কথা বলছ কি চণ্ডীদা।

চণ্ডী বলে, আমার কথা সকল যুগের কথা বিধু। বড় ত চিরদিন থাকে না তাকেও একসময় থামতে হয়। তাই বলে ঝড়ের মুখে পড়ে প্রতিরোধের চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে এটা একটা যুক্তি নয়।

রামকানাই বলল, তুমি প্রতিরোধ কাকে বলছো ?

কখনো স্টীমারে অথবা জাহাজে নদী অথবা সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়েছো রামকানাই ?

না।

আমি পড়েছি। জলযানকে ঝড়ের গতির বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে এগুতে হয়। পাল কাটিয়ে কিংবা গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলেই বিপদ। হয় উল্টে যাবে না ত' চড়ায় ঠেকে বিপত্তি ঘটাবে।

বিধু বলল, কিন্তু তেমন পাকা কর্ণধার কোথায় ? যে তার স্থির বুদ্ধি, নিঃস্বার্থ চেতনা আর অদম্য সাহস নিয়ে এগিয়ে আসবে ? সে মানুষ কোথায় চণ্ডীদা ?

এতক্ষণে ধাক্কা খেল চণ্ডী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বলল, প্রয়োজনের দিনে তেমন লোকের আবির্ভাব ঘটা কি একেবারেই দুরাশা বিধু ? ভারতের মাটিতে তার অতি প্রয়োজনের দিনে বহু মহামানবের অবির্ভাব ইতিপূর্বেও ঘটেছে ভবিষ্যতেও ঘটবে বলেই আমার বিশ্বাস। নইলে তার বহুপূর্বেই মন্থর পায়ের তলায় পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

কিন্তু

আমার সেই ভয়ের কথা তুলবে ত ? আমি আশাবাদী বিধু আমার বিশ্বাস এই ভয়ই একদিন আমাদের দুঃসাহসী করে তুলবে, বেপরোয়া করে তুলবে। তাবিয়ে তুলবে অপর পক্ষকে। থামিয়ে দেবে তাদের নীতিহীন অসংযমী গতিবেগকে। কিন্তু আজ আর নয় ভাই।

* * *

চণ্ডী যে সেদিনে নিছক কথার কথা বলেনি তা তার পরবর্তী কার্যক্রমে প্রমাণ করে দিলে। পাড়ার প্রায় প্রতিটি শক্ত-সামর্থ ছেলেরাই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বনেদি পাড়ার ঐতিহ্যের যাতে চরিত্রহানি ঘটতে না পারে তার জন্য ওরা দলবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

বিধু বলল, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের তুমিই একটা প্ল্যান ক'রে দাও চণ্ডীদা।

চণ্ডী মাথা নাড়ে। বলে, যারা কাজ ক'রবে আগে তাদের মতামত নাও বিধু। আজকের দিনের হাতাঘাট ওরা আমাদের চেয়ে বেশী চেনে। ওদের উপেক্ষা করো না।

বিধু কিছু বলবার জন্যই মুখ তুলেছিল সহসা বার দুই পটকার তীব্র আওয়াজে আর মিলিত আর্তনাদে তাকে থামতে হল। হরিখুড়োর বাড়ীর দিক থেকেই শব্দটা এসেছে। ছেলেরা বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়াল।

চণ্ডী আগে আগে চলল। ছেলেরা তাকে অনুসরণ ক'রল। হরিখুড়োর বাড়ীর কাছে এসেই তাদের থামতে হল। খুড়োর বাড়ীর দরজা হাট ক'রে খোলা। ছেলেদের নিয়ে চণ্ডী বাড়ীতে প্রবেশ ক'রল। চণ্ডীকে দেখে খুড়ো কপাল চাপড়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে চণ্ডী। সব···সব নিয়ে গেছে। বাধা দিয়েছিলাম। হারামজাদারা পট পট দুটো বোমা ছুড়লো। তোমার খুড়ির গুণধর দুই ছেলের এই কীর্তি !

চণ্ডী গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কোথায় তারা ?

হরিখুড়ো পুনরায় আর্তনাদ করে উঠল, পালিয়েছে। আমার যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে সরে পড়েছে।

হরিখুড়ো আরও কি যেন ব'লতে গিয়েও বলতে পারলেন না। গলার কাছে কথাগুলি আটকে গেল। খুড়ি ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে তখনও ঠক ঠক করে কাঁপছেন।

দলের একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, পুলিশে একটা খবর দিলে হয় না কাকাবাবু ?

চণ্ডী মাথা নেড়ে বলল, তাতে খুড়োর বিপদ আরও বাড়বে।
কতক্ষণ দৃষ্টিতে হরিখুড়ো চণ্ডীর মুখের পানে তাকালেন।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরে খুড়োকে নিঃসঙ্গে একে চণ্ডীর বাড়ীতে প্রবেশ ক'রতে দেখা গেল। সামান্য কটা দিনের ব্যবধানে অন্তত বছর দশেক এগিয়ে গেছেন তিনি। চেহারায় এবং চলাফেরায় একটা অপরিসীম ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরেছে।

চণ্ডী মুখ তুলে তাকাতেই খুড়ো একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আজই চলে যাচ্ছি চণ্ডী। বাড়ীটা বন্ধ করে চাবিটা তোমার কাছেই রেখে যেতে চাই। তোমাদের মধ্যে যদি বাড়ীটা কেউ কিনতে চাও নিয়ে নিও। দামের জন্য আটকাবে না। আমার বাকী কটা দিন চলবার মত কিছু পেলেই খুশী হবো।

তিনি একটু থেমে আবার বললেন, সব দোষ আমার, সব ভুল আমার। নইলে আমার অর্থ লালসা মেটাবার চোরা পথে নিজের ছেলেদের টেনে আনব কেন? তোমার খুড়ি ব'লতেন, লেখাপড়া শিখিয়ে আর দুটো বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি। তার চেয়ে তোমার পথটাই ওদের দেখিয়ে দাও। তোমার খুড়িও আমার ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তুমি ঠিকই বলেছিলে চণ্ডী। নিজে হাতে বিষবৃক্ষ রোপণ ক'রেছি তার ফলটা……

কথাটা শেষ না ক'রে টলতে টলতে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন হরিখুড়ো।…

• • •

প্যারিসের লুভের মিউজিয়ামের অধ্যক্ষকে একব্যক্তি প্রশ্ন করেন: আপনি ত আর্টের সমুদ্রের মাঝখানে আছেন, কি পেয়েছেন বলুন ত?
অধ্যক্ষ মৃদু হেসে বললেন: মাল কাবারে কয়েক শত ফ্রাঙ্ক,—আর্ট আর কিছু দিচ্ছে না আমাকে।

কল্লোল ও কালি-কলম

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কল্লোলের আড্ডা তেমনি জমজমাট।

রোজ বিকেলে কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা না হলে মনে হয় যেন দিনটা বৃথাই গেল।

আমাদের সে বন্ধুত্বের বন্ধন যে কত নিবিড় ছিল, সেকথা আজও মনে পড়লে শিহরণ জাগে।

কোথায় গেল সে-সব দিন?

দিন কারও জন্যে বসে থাকবে না জানি, তবু আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া অতীত যে কত মধুর ছিল—সেকথা যখন ভাবি, কারও সঙ্গে যখন আলোচনা করি তখন বুঝতে পারি তার মর্যাদা কতখানি ছিল আমাদের জীবনে।

কেউ আমরা বড়লোক ছিলাম না। সকলেরই একরকম 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা।

পকেটে পয়সা নেই। প্রেমেন আর অচিন্ত্য যাবে ভবানীপুর, নৃপেন যাবে চিংড়িঘাটা,—কোনও চিন্তা নেই, চলো মুসাফের—তোলো গাঁঠরি!

ফুটপাথে নেমে পড়েছি সবাই।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ হলো অগ্রণী। হাত পেতে বললো—পকেটে কি আছে দেখি! কারও পকেট থেকে বেরুলো এক আনা, কারও পকেট থেকে দু'আনা। একসঙ্গে জড়ো করে যা হলো—তাই দিয়ে পথের ধারে কেনা হলো গরম চিনে-বাদাম ভাজা। ঠোঙায় ভাগ করে হাতে হাতে দেওয়া হয়ে গেল। আর নয়তো হাতে-হাতে নিয়ে পকেটে পুরলে।

তাই চিবোতে চিবোতে কথা বলছি আর পথ চলছি। চিনাবাদাম কী এমন অপরূপ বস্তু, তাই মনে হয় যেন অমৃত।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বই পড়তে ভালবাসে। বুক কোম্পানীর সিরীপদার কল্যাণে তার বইএর অভাব নেই। সারা পৃথিবীর কত বিভিন্ন দেশের কত সাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদ। তাই সে পড়ে আর যা ভাল লাগে পথ চলতে চলতে গল্পচ্ছলে তাই সে শোনায় আমাদের কাছে।

কলকাতা শহরের ফুটপাথ, ফুটপাথের পাশে কোথাও নোংরা বস্তি, কোথাও দুএকখানা বড় বড় বাড়ী সব-কিছু আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কল্পনায় দেখি রাশিয়ার পথ-ঘাট, ফ্রান্সের নাইটক্লাব, পোল্যাণ্ডের গ্রাম। কত দেশবিদেশের মানুষ, কত বিচিত্র চরিত্র, কত ঘটনা, কত সংঘাত!

আবার কখনও বা চন্দ্রালোকিত চৌরঙ্গীর কর্ণওয়ালিস পার্কের সবুজ ঘাসের ওপর বসে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। কখনও বায়রণ, কখনও শেলী, কখনও রবীন্দ্রনাথ।

এমনি করে আমাদের দিন চলে। গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। বন্ধু-বান্ধবদের না শুনিয়ে থাকতে পারিনা। সবাই মন দিয়ে শোনে।

তারপর চলে নিঃশব্দ সমালোচনা।

কেউ বলে, চমৎকার হয়েছে। কেউ বলে—কমিতি হলেই যেন ভাল হতো।

আমি সাধারণতঃ দুঃখের গল্পই নিয়ে থাকি। আর লিখি তাদের নিয়ে—সমাজে যারা উপেক্ষিত, অবহেলিত। মনে মনে সময়েই একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—ভাল লেখা লিখবো।

টাকার কথাও ভাবি। কিন্তু লেখার জন্য টাকা অতি ভয়ে ভয়ে আদায় করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত আমরা ভোট বেঁধে ফেললাম।

ভারতবর্ষ-পত্রিকার হরিদাসবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমার লেখার তিনি ছিলেন একজন অনুরাগী ভক্ত। এই হরিদাসবাবুর অনুরোধেই ভারতবর্ষে আমাকে প্রায়ই লিখতে হতো। আমাকে তার জন্য টাকাও দিতেন ভাল। শরৎচন্দ্রের পরেই ছিল আমার স্থান। শরৎচন্দ্রের কাছে যে যেতো, লেখার প্রসঙ্গ উঠলেই তাকে আমার কথা বলতেন, আমার লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

একবার হয়েছে কি, উমাপ্রসাদের একটি মাসিক পত্রিকা ছিল। উমাপ্রসাদ তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। সেই পত্রিকার একটি সংখ্যায় পাশাপাশি দুটি গল্প ছাপা হলো। একটি শরৎচন্দ্রের 'মতী', আর-একটি আমার 'সমাপ্তি'। এই 'সমাপ্তি' গল্পের সম্মান-দক্ষিণা পঁচিশটি টাকা আমি উমাপ্রসাদের কাছ থেকে হাতে-হাতে পেয়েছিলাম। আমি ছিলাম তখন বীরভূমের রূপসীপুর গ্রামে। হঠাৎ দেখলাম আমার নামে তিরিশটি টাকার মনিঅর্ডার এলো। মণিঅর্ডার এসেছে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার উমাপ্রসাদের কাছ থেকে। ভাবলাম বুঝি মনের ভুলে দুবার টাকা দিয়ে ফেলেছেন। টাকাটা ফেরত দেবো বলে চিঠি লিখলাম। জবাবে উমাপ্রসাদ যা লিখলেন—পড়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। শরৎচন্দ্র নাকি আমার গল্পটি পড়েছেন। তাঁর খুব ভাল লেগেছে। এবং তিনিই উমাপ্রসাদকে অনুরোধ করেছেন আরও তিরিশটে টাকা পাঠিয়ে দেবার জন্যে। বলেছেন—পল্লীগ্রামে রয়েছে। কেউ একটি টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না। ওর টাকার খুব দরকার। একবার দিয়েছে বেশ করেছ, আবার পাঠিয়ে দাও।

ভিয়ার (বীরেনবরন) চিঠিখানা দেখেছিল। দেখে বলেছিল—এত টাকাও 'কল্লোল' দিতে পারবে না, এই সব ভাল ভাল গল্পও সে পাবে না। এমনি যদি চলতে থাকে তো 'কল্লোল' আমি বন্ধ করে দেবো।

তা সত্যি। কল্লোলে তখন যেসব লেখা ছাপা হচ্ছে—সেগুলি কল্লোলের উপযুক্ত মোটেই নয়। তার রুচি এমন খান যেন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

প্রেমেনও সেটা লক্ষ্য করেছে দেখলাম।

প্রেমেন বললে, কল্লোল এবার গেল।

বীরেনকে বললাম।

বীরেনের কেমন যেন উড়ু উড়ু ভাব। আপিসে প্রায়ই থাকে না। অজিত (ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধরদাদার ছেলে) আর পবিত্রর ওপর দেখাশোনার ভার দিয়ে সরে পড়ে। রোজ একবার করে ভবানীপুরে যায়, কখনও যায় টালিগঞ্জের সিনেমা-ষ্টুডিয়োতে। নিউ থিয়েটার্সের মালিক বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি। তাঁরই সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজব করে আসে। সাহিত্য ছেড়ে সিনেমায় ঢোকবার মতলব তার ছিল সেকথা তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম।

মাসের পর মাস কল্লোল ঠিক নিয়মিত বেরুতে লাগলো, কিন্তু কাগজ দেখে খুব কষ্ট হতো। মনে হতো তার মাথা ছাতা নেই।

অচিন্ত্যকে বললাম। অচিন্ত্য বললে, এ-বছরটা যেমন চলছে চলুক. আসছে বছর থেকে আমি তার নেবো কল্লোলের। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো। প্রেমেন আর আমি তখন অল্প স্বল্প লেখছি।

আমার পড়াশোনা ছিল খুব কম। আর প্রেমেন ছিল ঠিক তার বিপরীত। বিদেশী সাহিত্য সে তখন অনেককিছু পড়ে ফেলেছে।

দুজনেই থাকি ভবানীপুরে। খুব কাছাকাছি। দিনরাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় একসঙ্গেই কাটাই। কত রকমের কত কথা হয়। সব সাহিত্যের কথা। সাহিত্যই ধ্যান-জ্ঞান। সাহিত্যের আলোচনায় আর চিন্তায় আমরা তখন তন্ময় হয়ে গেছি। শুধুই মনেহয়—দূর ছাই, এতদিন কী সব ছাই-ভস্ম লিখেছি। আবার নতুন করে লিখি। নতুন করে জীবন আরম্ভ করি।

তখন কতই-বা আমাদের বয়স। আর কতটুকুই বা দেখেছি জীবনকে।

আমি লিখলাম—'মহাযুদ্ধের ইতিহাস। (গ্রামকে গ্রাম)। প্রেমেন লিখলে—'পাঁক'।

'মহাযুদ্ধের ইতিহাস'—নামটা ইতিহাস হলেও আসলে সেটি একটি উপন্যাস। দিয়ে এলাম প্রবাসীতে। প্রবাসী ছাপলে না—ফেরত দিলে। জীবনে এই প্রথম লেখা ফেরত পেলাম। এর আগে আমার কোনও লেখাই কোনও পত্রিকা থেকে অমনোনীত হয়ে ফেরত আসেনি। তাই বলে অমনোনীত হবার মত মন্দ লেখা যে লিখিনি তা নয়। মন্দই ছাপা হয়েছে।

মুরলীদা বললে, চিরাচরিত পথ থেকে তোমরা একটু সরে এসেছ। তোমরা স্বতন্ত্র। এ বিদ্রোহ মানুষ সহজে স্বীকার করে নেবে না।

মুরলীদাই প্রস্তাবটা প্রথম করলে। বললে, আমরা একটা কাগজ বের করি এসো।

কল্লোল থাকতে সেটা কি সম্ভব?

মুরলীদা বললে, কেন সম্ভব নয়? কল্লোলের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। তোমাদের একটু বেশি খাটতে হবে—এই যা। কল্লোলেও লিখতে হবে।

নিশ্চয় লিখবো। সাহিত্যের দিনমজুরি করতে তখন আমরা নারাজ নই।

কিন্তু টাকা? কাগজ বের করতে হলে টাকার দরকার।

বন্ধুবর এজেন্সীর শিশির নিয়োগী তখন আমার একখানি গল্পের বই বের করেছেন। 'অতসী'। ভদ্রলোক শিক্ষিত। এম-এ বি-এল। আমাদের লেখার বিশেষ অনুরাগী। মুরলীদা তাঁর সঙ্গে কথা বলে তার পরের দিনই আমাদের জানিয়ে দিলে—কাগজ বেরুবে। সম্পাদক হবে তোমরা দুজন। তুমি আর প্রেমেন।

মুরলীদা প্রথমে নিজেকে বাদ দিতে চেয়েছিল। আমরাই রাজী হলাম না। সম্পাদক হবে তিন জন। আমি প্রেমেন আর মুরলীদা।

এইবার চাই কাগজের নাম।

প্রেমেনের মাথা এ-সব ব্যাপারে সব সময়েই পরিষ্কার। তক্ষুণি বলে বসলো—কালি-কলম।

'কালি-কলম' বেরুলো।

এক হাজার কপি—তিন দিন পরে দেখি—একখানি নেই। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

ডক্টর কালিদাস নাগ

(অপ্রকাশিত রচনা)

ডক্টর কালিদাস নাগের এই অপ্রকাশিত রচনাটি সত্যিই আজ অমূল্য। রবীন্দ্রনাথের অতি অন্তরঙ্গ সহচর হিসাবে ডক্টর নাগের লেখা "রবীন্দ্র-যুগ" বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় অবদান হয়ে থাকবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রবীন্দ্র জন্ম বৈশাখ মাসে এই অমূল্য রচনা প্রকাশ করে আমরা কবিগুরু ও তাঁর সহচর ডক্টর নাগের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। গল্প-ভারতীর পাঠক মাত্রই এ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কিছু নূতন কথা জানতে পারবেন, যে কথাগুলি একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

—সম্পাদক।

ধোঁয়া যেন আকাশকে আচ্ছন্ন করছে। কবিগুরু কিন্তু প্রাণে ঢেলে দিয়েছেন সুরের অমৃতে "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।" ২২শে আগষ্ট মাদ্রাজ কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক Rollo (পরে ইনি ডাঃ শীলের সময়ে মহীশূর কলেজে যোগ দেন) আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন রবীন্দ্র শিল্প বলে। অনেক খবর তিনি নোট করে নিয়েছিলেন, 'Tagore : his mind and art" বিষয়ে কিছু লিখেছিলেন কি না জানিনা। তবে দক্ষিণ ভারত থেকে আর একজন মনীষী প্রফেসর রাধাকৃষ্ণণ তাঁর প্রথম গ্রন্থখানি 'Philosophy of Rabindranath' নামে প্রকাশ করেছিলেন। বলাবাহুল্য মূল বাংলায় এঁরা কেউ রবীন্দ্র সাহিত্য ঘাঁটেননি। রবীন্দ্রনাথ কৃত ইংরেজি সংস্করণগুলিই তাঁদের সম্বল।

মাদ্রাজের বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থাগার কোনেমারা লাইব্রেরীতে (Conamara) অনেকদিন কাটিয়েছি। কারণ সত্যেন্দ্র জ্যোতিরীন্দ্রের বন্ধু মাইকেল মধুসূদন মাদ্রাজে প্রায় ১০ বছর শিক্ষকতা করে পরিবার প্রতিপালন করেছেন। তাঁর 'Captive Lady' ছেপে শিক্ষামন্ত্রীকে যখন তিনি পাঠান শিক্ষামন্ত্রী তা তাচ্ছিল্য করে পচিশ বছরের যুবক মাইকেলকে উপদেশ দিলেন ইংরেজি ছেড়ে মাতৃভাষায় রচনা করার জন্যে। ফলত Mutinyর সময়ে মাইকেল সৌভাগ্যক্রমে বাংলা দেশেই ফিরে আসেন এবং নাটকে—ট্রাজেডি ও কমেডি আর কাব্যে—মিত্রাক্ষর থেকে অমিত্রাক্ষর কত বিচিত্র রচনা বাংলা সাহিত্যকে দান করে গেছেন। কিন্তু এসবের প্রস্তুতি মাদ্রাজ প্রবাসেই হয়েছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র এ বিষয়ে গবেষণা করলে যশস্বী হবেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত কোন চেষ্টাই হয়নি।

১০০ বছরের বেশী পুরোনো কাগজের ফাইল আদি খুঁজে বার করতে পারিনি অল্প কিছুদিন মাদ্রাজে থাকার সময়ে। মাদ্রাজ মিউজিয়মে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ ও বিশেষভাবে অমরাবতী ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আর এখানকার অধিবাসী নেতা ডাঃ এ্যানী বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত Theosophical Society-র পুঁথিশালা গ্রন্থাগার ইত্যাদিও আডিয়ার আশ্রমে গিয়ে দেখেছিলুম।

৮—২১শে সেপ্টেম্বর পক্ষাধিককাল তামিল মাদ্রাজ থেকে পরিক্রমা শুরু করে তেলেগু, কানারী ও মলয়ালীদের আচার ও সংস্কৃতাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য হল। কারণ মেজমামা টুরে বেরুলেন আর আমাকে নিয়ে সর্বত্র ঘুরে তামিড় ও ভারত সভ্যতা বোঝবার সুযোগ করে দিলেন। দুজনে মাদ্রাজে নেমা মাত্রই জার্মান জাহাজ 'এমডেনে'র আবির্ভাব! ২২শে মাদ্রাজ বোমার্ড করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুনের ছোঁয়াচ যেন গায়ে ছুঁয়ে দিল। ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত সেই বিধিবিদ্ধস্ত শহরে বাস করে মাদ্রাজ ত্যাগ করলুম। অক্টোবরের শেষে ভগ্নি ইলার জন্মদিনের উৎসবে অনেকের সঙ্গে দেখা হল। আর দিদিমা (দিনেন্দ্রনাথ) রবীন্দ্রসংগীতের ফোয়ারা ছুটিয়ে গেলেন। অপূর্ব প্রতিভা। এ মানুষকে দেশ তাঁর যথা সম্মান দেখায়নি। নভেম্বর মাসে একবার হাজারিবাগ ঘুরে এলাম। ফিরে অরুণের সঙ্গে দেখা সে তো জোর করে প্রায় আমার শান্তিনিকেতনের চাকরী জুটিয়ে দিতে চায়, কারণ দুজনেই এম, এ, পাশ করেছি। সে ওখানে কাজ করতে চায়না, কিন্তু আমাকে ঢোকাতে চায়, কারণ সে বললে: 'গুরুদেব বিশেষভাবে তোমাকে চাইছেন।' গুরুদেব মাথায় থাকুন কিন্তু মাইনে নিয়ে তাঁর কাজ করতে চাইনা। অরুণ ক্ষুণ্ণ হল। এবং তার বাবা দিনেশবাবুর কাছে ঘনঘন নিন্দে যেতে লাগল! তিনি তাঁর Fellowship lecture শুরু করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক দিকের নতুন সন্ধান দিচ্ছেন। আর সেই সময় বেকার এম এ, কালিদাস দরখাস্ত করার ফাঁকে রাখালদাসের ঘরে বসে তাঁর "বাংলার ইতিহাস" ও "প্রাচীন মুদ্রা" প্রভৃতি বই কপিকরার পরেশ হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এর কিছু পরিচয় আছে। তাঁর আত্মীয় রংপুরের জমিদার জয়েশ রায় চৌধুরী ও প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়-এর Coin Collection রাখালবাবুর কৃপায় দেখেছিলাম। তিনি কতরকম উৎসাহ দিয়েছেন তা আজীবন মনে থাকবে। অকালে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সিলিগুন সিরিজড অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি ও রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা আমার অপরিণত মনেও বৃহত্তর ভারতের রেখাপাত করে। রাখালবাবুই আবার 'নারায়ণের' বঙ্কিমচন্দ্র সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছিলেন। আর হয়ত সেই টেলার নিজেও 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল' প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। Centenary guide to the Indian Museum ও 'পাষাণের কথা' বই দু'খানি রাখালবাবুর কাছে উপহার পেয়েছিলেম।

১৯১৫ সালের মাঘোৎসবের মধ্যে গুরুদেবকে গভীরভাবে পেলাম। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে বাংলায়ও অনেক দুর্ঘটনা বিশেষভাবে বাঁকুড়া, বীরভূমে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ১১ই মাঘের উৎসবে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ প্রবলভাবে আমাদের নাড়া দিল। ২৬শে জানুয়ারী (পরে Republic Day) বাংলার দুর্ভিক্ষাদির সাহায্যকল্পে কি করা যায় সেই আলোচনা যারা দিনের বৈঠক আমাদের নিয়ে সুরু করেছেন। ২৮শে জানুয়ারী তিনি বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী (Bengal Social Service League) এর গোড়া পত্তন করেন। পুজোর ছুটিটাই বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ রিলিফ কাজেতে কাটানো গেল। Wesleyan College বাঁকুড়া ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হল। Rev. Thompson বাংলা শিখে রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ছেন।

এরপর দিন গুরুদেব তাঁর বাড়ীতে একটু মজলিশ ও পরে জলযোগের নিমন্ত্রণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ

প্রতিমা দেবীর বিবাহের দিন উপলক্ষে কিছু গানের আয়োজন করেছেন। সেই উপলক্ষে সংগত করছেন কবি বন্ধু জগদীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)। মহারাজা প্রসিদ্ধ কলাবিদ। যেমন তবলায় তেমনি পাখোয়াজে—এমন সংগত শোনাতেন যা আর কারো কাছে শুনিনি। তিনি ছিলেন মাননী ও মর্মবাণীর পৃষ্ঠপোষক। আর সেখানে সাহিত্যিক মিলন মানে ভোজ্যপেয়ের রাজসূয় যজ্ঞ। তাঁর নাটোরে রবীন্দ্রনাথকে অতিথি করে নিয়ে গেছেন, সে বহুকালের কথা। 'কবিকার' যুগ আবার আমাদের যুগের 'বলাকা'ও দেখি নাটোর মহারাজের কণ্ঠস্থ। কবির বন্ধুদের মধ্যে এমন খাঁটি মানুষ। ১৯১১-১২ সালে 'গীতাঞ্জলী'র জয়যাত্রার আগেই টাউন হল মিটিংএ রবীন্দ্র সম্বর্ধনার নায়কত্ব নিয়েছিলেন নাটোরের মহারাজ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেই বিরাট সম্বর্ধনা অনেকটা তাঁর সাহায্যেই হয়েছিল। রথীবাবুর শুভবিবাহ দিনে যে বিরাট ভোজ আমরা খেলাম তার মেনু ইত্যাদি সবই রবীন্দ্রনাথের। শুনলাম এ বিষয়েও নাকি তিনি একজন ধুরন্ধর! রথীর মাও নাকি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন স্বামীর ঘন ঘন মেনু পরিবর্তনের ঝাপটে। কিন্তু শুধু ভোজ নয়, মনের খোরাকও এমন কিছু দিলেন, যা চিরকাল মনে থাকবে। গুরুদেব 'জোঠামশায়' শেষ করে 'যামিনী' লিখেছেন, সেটি নিজে শোনালেন। এবং সেখানেই যেন শেষ করতে চান ভাবে বোঝা গেল। আমরা একেবারে হৈ হৈ করে বললুম, 'এখানে থামা চলে না।'

তিনি বলেন, 'কেন চলে না?'

আমরা বললুম, 'তাহলে শ্রীবিলাসের প্রতি সুবিচার হয় না।'

'তাইত!' বলে খাতাপত্র গোটালেন, কিন্তু ফল ফলল। তারপর তিনি শিলাইদহ গিয়ে চতুরঙ্গের শেষ গল্প অপূর্ব রচনা শ্রীবিলাস লিখে আমাদের শোনালেন।

মাঘে আমার জন্মদিনে আর একটা নতুন স্তরের সূচনা। আমার পুরোনো কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর এম, কে যায় তাঁর কিছু কাজের ভার দিলেন। এবং জানালেন যে তাঁদের কলেজেই ইতিহাসের অধ্যাপনার জন্যে আমাকে নেওয়া ঠিক হয়েছে। শিক্ষকের জীবন ১৯১৫-তে সুরু করে ১৯৪৫-তে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়েছি। অর্থাৎ ৩০ বছর প্রায় পড়িয়েছি আর আশা করি বাধা হইনি।

১৭ই ফেব্রুয়ারী দিনেশবাবুর বেহালার বাগানে অরুণের সঙ্গে যাওয়া গেল। কারণ সে আগরতলায় চাকরী করতে যাচ্ছে। তখনি শুনলাম দিনেশবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতায় স্থায়ীভাবে আনবার চেষ্টা করছেন। এবং একবছর পরেই তা সত্য হয়েছে। আর দিনেশবাবুর বাগানেতেই শরৎবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয় সেকথা যথাস্থানে আসবে।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। মোহনদাস গান্ধী কস্তুরীবাই-এর সঙ্গে লণ্ডনে দুদিন চিকিৎসা সেরে বোম্বাইয়ে নেমে সোজা শান্তিনিকেতনে হাজির হলেন। তাঁর এই প্রথম দর্শনের সবিস্তার কাহিনী শান্তিনিকেতন থেকে কিছু কিছু ছাপা হয়েছে। মহাত্মাজীও তার কিছু আভাষ দিয়ে গেছেন। Tolstoy and Gandhi বই লেখবার সময়ে আমারও মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর বিষয় কিছু লিখে যাই। কিন্তু এ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় গান্ধীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন কিন্তু বেশী কিছু লিখে যেতে পারেন নি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কিন্তু শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর সম্বন্ধে লিখেছেন। শান্তিনিকেতন থেকে গান্ধীজি খবর পান যে তাঁর গুরু গোখলে দেহরক্ষা করেছেন, তাই তাড়াতাড়ি কলকাতা হয়ে চলে যান। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রাঙ্গনে গান্ধীজি ও কস্তুরাবাইকে সম্বর্ধনা করা হয়, সেখানে তাঁদের দেখেছি। এবং সেই সভায় নেতৃত্ব করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি।

১৯১৩ সালে কল পরিত ভিবেগ্রাতক্, কল সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। টলষ্টয় শিষ্য গান্ধীজীকে কাছে পেয়ে আমরা আবার টলষ্টয়কে নতুন করে পেতে সুরু করলাম। টলষ্টয় ও গান্ধী লেখার সময়ে সে সব কাজে লেগেছে। এই মার্চ মাসেই রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মরণ নাট্যের অপূর্ব রূপক 'ফাল্গুনী' রচনা শেষ করে আমাদের কলকাতায় শোনালেন। তিনি পাঠ করছেন আর গানগুলি সব একাই বিনেন্দ্রনাথ গেয়ে যাচ্ছেন।

২৪শে ও ২৬শে এপ্রিল মহাসমারোহে বোলপুরে ফাল্গুনী অভিনয় হল, সেটা পরে বলা যাবে।

ফাল্গুনী ২০শে ফাল্গুন (৫ঠা মার্চ) কবি লেখা শেষ করেন সুরুল গ্রামে ভেতলা বাড়ী (সিংহদের) একটি নির্জন ঘরে। বাংলার তথা ভারতের গ্রামকে আনন্দ ও জীবনে মুখরিত করে তোলার স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়ে আছেন। আবার গ্রাম-যজ্ঞের ঋত্বিক গান্ধীজীও যেন সমস্ত বুকে ঐ সময়ে শান্তিনিকেতন ও বাংলা দেশ ঘুরে যান। ২৮শে মার্চ (১৫ই চৈত্র) রামমোহন লাইব্রেরীতে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে কবি গ্রামোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ('প্রবাসী' বৈশাখ ১৩২২)। কিছু পরে ডাঃ বিধেন মৈত্রের নেতৃত্বে আমরা বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী গড়ে গুরুদেবের কাছে গেলাম। এবং তিনি তা সানন্দে উদ্বোধন করলেন (১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী) (সবুজপত্র ফাল্গুন ১৩২১) 'কর্মমন্ত্র' নামে সে ভাষণ ছাপা হয়েছে। সেই সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন সভাপতি আর কবিবন্ধুদের মধ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, ডাঃ নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে ৫০ বৎসর পূর্ণ হলে সেটি আমরা স্মরণ করেছিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলে হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধনের একটা ইতিহাস আছে। 'ব্রহ্মসভা' ও 'ব্রাহ্ম' সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩১) সমাজ সেবাকে ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করেছিলেন। এবং সেই জন্যেই কুসংস্কার প্রসূত নারীহত্যা তথাকথিত সতীদাহ নিবারণ ব্রতে বহু বৎসর তিনি সংগ্রাম করেছেন। ১৮২৯ সালে তাঁর চেষ্টার ফলে সতীদাহ আইনত রদ হয় এবং ডাঃ শীল দেখিয়েছেন যে আধুনিক ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে রামমোহনই 'লোকহিত' কর্মকে (Peoples welfare) ধর্মেরই অঙ্গ বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) Charitable society (Refuge এর পূর্বাভাষ) প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বহু দান করেন। এবং তাঁর উপযুক্ত পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বহুবিধ দান করে গেছেন। তিনি উপাসনার এক গভীর তাৎপর্য দিয়ে গেছেন—'তস্মিন প্রীতে তৎপ্রিয় কার্য সাধনম্ তৎ উপাসনম্' তাই সহজেই দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ আজীবন সর্বহারাদের কথা চিন্তা করে গেছেন : the humblest, the lowliest, and the lost' (নৈবেদ্যের ইংরেজি অনুবাদ) সারা পশ্চিম জগতে সাড়া দিয়েছিল। ১৯১২।১৩ সালে ইংরেজি গীতাঞ্জলির যুগেই তিনি শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি শ্রীনিকেতনেরও ভিত্তি স্থাপনা করেন সুরুল গ্রামের দিকে বাড়ীটি ক্রয় করে। শুধু ধনীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা তিনি করেননি ; অতি দরিদ্র অজ্ঞান গ্রামবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কথাও তাঁর প্রাণে এবং রচনায় বহুকাল থেকেছিল। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা যুবক রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন, আর ৪৯ বৎসর পার হয়ে তিনি গ্রামোন্নতি ও শ্রীনিকেতন পরিকল্পনা করে গেছেন। সেই ব্রতে তাঁর শিষ্য কালীমোহন ঘোষ যেমন আজীবন সেবা করে গেছেন তেমনি তিনজন ইংরেজ বন্ধুও অকৃত্রিম সাহায্য করে গেছেন। এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের কথা প্রথমেই স্মরণীয়, তাঁদের দুজনকে নভেম্বর ১৯১৩ সালের শেষে আমি দেখেছি। গুরুদেব দু'জনকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠালেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সাহায্য করবার জন্যে। ৩০শে নভেম্বর

যাত্রা করে মার্চ ১৯১৫ সালে তাঁরা ভারতে ফিরে আসেন। সৌভাগ্যক্রমে স্মাটস্-গান্ধী চুক্তির ফলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করে গান্ধীজী ২১ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রত উদ্‌যাপন করে দেশে ফিরতে প্রস্তুত হন। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবি ইংরেজি চিঠিতে লেখেন, 'You know our best love was with you while you were fighting our cause in South Africa along with Mr. Gandhi and others.' (Letters to Andrews), এই গান্ধীজীর সঙ্গে গুরুদেবের গভীর অন্তরের যোগ গ্রাম উন্নয়ন ও জনসেবার ক্ষেত্রে গান্ধীজীও তাঁর নিজ পরিবার ও শিষ্যবর্গকে সর্বাগ্রে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন, আর তিনি আজীবন গুরুদেবের আশ্রমের একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। সেই জন্যই অহরলাল 'বিশ্বভারতী'র সর্বাধ্যক্ষ এবং তাঁরই জন্যে 'বিশ্বভারতী' প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বাৎসরিক সাহায্য পায়। অথচ কবির জীবদ্দশায় অর্থসংকটে কত ভালো কাজ কবি করে যেতে পারেননি তা অনেকেই আমরা জানি। মার্চের শেষে পিয়ার্সন সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেই আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন। তিনি তখন দিল্লীর একটি চাকরী ছেড়ে (৪০০ টাকা মাইনে পেতেন) দিয়ে চালাঘরের ওই ছেলেগুলোর অভিভাবক হয়ে তক্তাপোষে শিশুদের সিংহাসন পাতলেন। শিশুদের কাছথেকেই তিনি বাংলা শিখেছিলেন এবং অচলায়তনের অভিনয়ে 'খেপারীর ডাল' ইংরেজি ভাবেতে ইংরেজি সুরে অভিনয় করেছিলেন। পরে তিনি বাংলা এত ভালো শিখেছিলেন (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে) যে কবির বিরাট উপন্যাস গোরা'র অনুবাদ করেন। যে সব ছেলেদের উপর তাড়িয়ে দেওয়ার শাস্তি কর্মকর্তারা জারি করে ছিলেন, গুরুদেবের বিশেষ আদেশে ভিক্ষা করে পিয়ার্সন এমনি অনেক দুর্দান্ত ছেলেকে মানুষ করেছেন। পরে তারা যখন স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জন করছে, তখন তারাই আমার কাছে পিয়ার্সন সাহেবের কথা বলেছে। ১৯২৩ সালের শেষে রোমা রোলার বাড়ীতে ভিলেনিউভ্‌ভ্যারলাঁতে (Villa Olga) পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আর সেখান থেকেই ইটালীর পথে ট্রেন থেকে পড়ে তিনি অকালে মারা যান। শিক্ষক পিয়ার্সনকে ভোলা চলবে না, অনেকক্ষেত্রেই তাঁকে মনে করতে হবে। ১৯১০ থেকে ২৩ পর্যন্ত ১৩ বৎসর তাঁকে অনেক ভাবে দেখেছি। আর তাঁর সহকর্মী ইংরেজ পাদ্রী সি. এফ. এণ্ড্রুজ তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত গুরুদেব ও তাঁর আশ্রমের কথা কত গভীরভাবে অনুভব করেছেন তাও দেখেছি। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ যুগ নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করেন, তাঁকে এই সময়কার অনেক জিনিষ খুঁজে বার করতে হবে। ৫০শে মার্চ ১৯১৫ সালে গান্ধীজী রেঙ্গুনে তাঁর বন্ধু ডাঃ মেটার সঙ্গে দেখা করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। এবং গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ৩রা এপ্রিল কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে গেলেন। ইতিমধ্যে সুকলে বসে কবি ফাল্গুনীর মহড়া দিচ্ছেন। (সবুজপত্রে তখন ফাল্গুনী ছাপা হয়ে গেছে)। ২৪শে-২৬শে এপ্রিল ১৯১৫ ফাল্গুনীর অভিনয়। স্কটিশচার্চ-কলেজে আমি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলাম ও ডাঃ মিত্রের কাছে ভাক লেনে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলাম। 'ইস্টারের ছুটিতে আমরা দলবলে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ফাল্গুনী অভিনয় দেখলাম। কবি নিজেই 'দর্দার', তাঁর সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন 'চন্দ্রহাস', আর দিজেন্দ্রনাথ, অজিত কুমার ; সন্তোষ, অজিত হালদার ও পিয়ার্সন প্রভৃতি নেমেছিলেন। পিয়ার্সন 'শান্তিনিকেতন' বইখানি ইংরেজিতে যখন লিখছেন, তখন যাদব বলে একটি ছাত্র টাইফয়েডে মারা গেল। তাকেই বইখানি উৎসর্গ করেছেন। ৯ই মে রবীন্দ্রনাথের ৫৪ বছরের জন্মদিন হয়ে গেল। ১০ই মে এণ্ড্রুজ দিল্লী থেকে এসে কলেরায় আক্রান্ত হলেন। সে কাহিনী পরে তিনি মৃত্যুর কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে "What I owe to Christ" বই-এ লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেছিলেন, পরে তিনি বায়োকেমিক ঔষধেও বিশেষ জ্ঞানলাভ

করেন। বহু গ্রামবাসী তাঁর কাছে ওষুধ পেয়ে বেঁচে গেছে, সেকথা আমরা শুনেছি। এণ্ড্রুজের জীবনরক্ষার জন্যে তিনি বর্ধমান থেকে ডাক্তার আনিয়ে ছিলেন এবং আশ্রমবন্ধু ডাঃ মিত্রও গিয়েছিলেন। এণ্ড্রুজকে কলকাতায় এনে নার্সিং হোমে রেখে সারিয়ে তোলা হয়।

৩রা জুন ১৯১৪ সালে ৫ম জর্জের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কবি 'চতুরঙ্গের' ছোট গল্প থেকে তুলির টানে 'ঘরে বাইরে' শেষ করে বাংলা গল্প সাহিত্যের যেন মোড় ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর প্রিয় শিলাইদহে পক্ষাধিককাল (জুলাই মাসে) কাটিয়ে এসে শোনেন, এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন যাবেন ফিজিদ্বীপে। সেখানকার অধিবাসীদের চেয়েও ভারতবাসীরা সংখ্যায় বেড়ে গেছে, তাদের অভাব অভিযোগ স্বচক্ষে দেখে ও শুনে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের দিয়েছিলেন। Overseas India' বিষয়ে গান্ধীজী তাঁর একজন পরিকৃৎ। ফিজির চিঠিপত্র পেয়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের মধ্যে জাপানীরা কি করছে এটা দেখবার জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ওকাকুরার ১৯০১-০২ সময় থেকে অনেক জাপানীর সঙ্গে কবি ও তাঁর শিল্পী ভ্রাতুষ্পুত্ররা সংযোগ করেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় 'Special Branch' তিনা দিতে দেরী করে তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। শেষে ১৯১৬তে কলকাতায় বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ সাহায্য করে কলকাতায় 'ফাল্গুনী' অভিনয় করে কবি পিয়ার্সন ও মুকুল দেকে নিয়ে জাপান যাত্রা করলেন। (জাপান যাত্রীর ডায়েরী)। জাপান থেকে এ্যামেরিকায় গিয়ে যখন তিনি দেখে ফিরলেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা সংকটতর অবস্থা চলছে, জার্মানী হারে বা জেতে—এই যেন মুখ্য সমস্যা। কিন্তু তার মধ্যে বিশ্বজনীন সমস্যা Competitive Imperialism-এর মর্মোদ্ঘাটন রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন তাঁর Nationalism গ্রন্থে।

• • • •

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কবি সক্রিয়ভাবে কিছুকালের জন্য রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সময় কবিতা গান প্রবন্ধ ও নাটকের ভিতর দিয়ে তিনি নির্ভীক্ ভাবে নিজমত ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেইযুগের লেখা বাঙালীকে যে শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েছিল, তা' জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ

অনুশীলন সমিতির

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে যে যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া হইত। সাধারণ সভ্যদিগের মধ্য হইতে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ বিশেষ কর্মী সংগ্রহ করা হইত। গুপ্ত কার্য্যের জন্য কালীমন্দিরে দীক্ষা দেওয়া হইত। দেবী সমক্ষে স্বীয় অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হইত। কোন যন্ত্রণা বা তথ্য প্রকাশ করিবে না, কোন প্রতারণা করিবে না, সমিতির বিরুদ্ধাচরণ করিবে না, বা রাজশক্তির গুপ্তচরবৃত্তি করিবে না, নিয়মভঙ্গকারী করিবে না। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা করিবে। কার্য্য সফল করিবার প্রয়াস পাইবে। এইরূপ মন্ত্রগুপ্তি শিক্ষা দেওয়া হইত যে, একজন সভ্য কি করিতেছে অন্য কেহ জানিতে পারিত না—এমন কি কেহ নিজেই কি করিতেছে তাহাও বিশেষভাবে বুঝিত না! কোথাও চিঠি দিয়া আসিল তাহাতে কি নির্দ্দেশ আছে জানা নাই। কোথাও জুতার বাক্স দিয়া আসিল তাহাতে কি আছে খুলিয়া দেখিবার হুকুম নাই—হয়ত পিস্তল থাকিতে পারে নচেৎ এত ভারী কেন? এইরূপে বিপ্লব কার্য্যের পরিচালনা হইত! কোন কোন বিশিষ্ট নেতা সংগোপনে পিছনে থাকিয়া এই সকল পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা Brain behind the organisation. সমিতির সভ্যদিগের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য :—

উৎসবে ব্যসনে চৈব
দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ
যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধব।

সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় সভ্যরা পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভ্যতা কষ্টি পাথরে যাচাই হইয়াছে। মহৎ উদ্দেশ্যে একত্রে কাজ না করিলে সভ্যতা দৃঢ় হয় না তজ্জন্য সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে যে প্রীতির নিবিড় বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল অন্যত্র সেরূপ সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু অনুশীলন সমিতির সর্বতোমুখী শিক্ষা ইহাতেই মাত্র পর্য্যবসিত ছিল না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নির্দ্দেশ মত নরনারায়ণের সেবায় সমিতির আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত দুঃস্থ পরিবারদিগকে সাহায্য দিবার জন্য দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করা হইত এবং সংগৃহীত চাল, ডাল, অনাথ বালকবালিকাও বিধবাদিগকে

বিতরণ করা হইত। (এই বিভাগটীই স্বতন্ত্রভাবে অধুনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার নামে অর্থসাহায্য দ্বারা জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত)।* বন্যা বা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক সভ্যগণকে রিলিফ ও চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য প্রেরণ করা হইত। সমিতির নানাবিধ সমাজ হিতৈষী ও জনসেবা কার্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নহে। উপরে কেবলমাত্র কতকগুলির ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভবপর হইল।

অনুশীলন সমিতিই বাংলাদেশে প্রথম স্বেচ্ছাসেবক প্রথা প্রচলন করে। বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ উৎসবে দর্শকবৃন্দের সেবা করিত ও কাঙ্গালী ভোজন পরিচালনা করিত। পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে টাউন হলে তিনদিন ব্যাপী এক সর্বধর্ম সম্মেলন হইয়াছিল। তাহার আয়োজন ও তত্ত্বাবধানের কার্যে অনুশীলন সমিতি প্রধান উদ্যোগী হয়। তাহার পর বাংলা ও মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যে প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য কলিকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।† তাহার পরিচালনা ভারও সমিতি গ্রহণ করে। এই সুযোগে বাল গঙ্গাধর তিলক, সাপার্দে এম. এস. মুঞ্জে প্রভৃতি মহারাষ্ট্র নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ সালে গ্রীষ্মকালে শিবাজী উৎসব হয়। তদুপলক্ষে উপরোক্ত তিনজন মহারাষ্ট্র ব্যক্তি কলকাতায় আসেন ও সমিতি পরিদর্শনে পরম প্রীত হন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাহাতে অনুশীলন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক দল সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

১৯০৮ সালে অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য অসংখ্য লোক সমাগম হইয়াছিল। তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ও জনসেবার জন্য সমিতির সভ্যেরা স্বেচ্ছাসেবক কার্যে ব্রতী হইয়া নেতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এই সকল কার্যে পরলোকগত দেশসেবক নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

অনুশীলন সমিতিই সর্ব প্রথম কলিকাতায় শ্রমজীবী বিদ্যালয় Working Men's Institution প্রবর্তন করে। এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ও কর্মী সোদপুর ভেষরা নিবাসী পরলোকগত শশিভূষণ রায় চৌধুরী। তাঁহারই উদ্যোগে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর জনগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাত্রে ও ছুটির দিনে সভ্যরা দরিদ্র শ্রমিক সন্তানদের লেখাপড়া শিখাইত। শিক্ষাব্রতী শ্রীসুশীলকুমার আচার্য মহাশয় ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইহা আরম্ভ করেন পরমচন্দ্র ঘোষ, যতীন শেঠ প্রভৃতি। এই নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কিরূপ ফলবতী হইয়াছিল তাহার একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই চলিবে। সিমলার জনৈক মুটিয়ার ছেলে যথাক্রমে ম্যাট্রিক, আই. এ. ও বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই তখনও তাহার পিতা মুটিয়াগিরি করিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দোলায়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া জাতিগঠন মূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা এই সময়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির অর্থদানে সম্ভবপর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ প্রমুখ সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতীগণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই শিক্ষা পরিষদের সহিত

---

* এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং প্রশংসনীয় নিষ্ঠার সহিত সেবাধর্ম প্রতিপালন করিতেছেন।

† পাস্তির মাঠ, বিধান সরণি। অধুনা সেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রাবাস।

অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। অনেক সভ্য উহা গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই শিক্ষায়তন পরবর্তীকালে College of Engineering and Technology, Jadavpur, নামে খ্যাতি অর্জন করে। অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুশীলন সমিতি সকল ক্ষেত্রেই কিরূপ নূতন পথ প্রদর্শক ছিল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছে তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই চলিবে। সাধারণ দুর্গোৎসব হইতে অথচ কোন প্রতিমা ছিল না। শক্তি আরাধনায় কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ছিল সম্বল। লাঠি, বর্শা, সড়কি, তরোয়াল, ছোরা, ভোজালি, খাঁড়া এইসব সাজাইয়া এক অপরূপ প্রতীক নির্মিত হইত। এবং এই বহুবলধারিণী দেবীর উপাসনা হইত। পূজার জন্য মহারাষ্ট্র হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইত এবং বৈদিকমন্ত্রে নূতন ধরণের পূজা হইত। এই সূত্রে অনুশীলন সমিতির কয়েকজন প্রধান পরিচালকদের নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসরৎচন্দ্র ঘোষ, ৺প্রিয়ব্রত সরকার, ৺পুলিন বিহারী মুখার্জি, শ্রীচন্দ্রমাধব সামন্ত, ডাঃ তারকনাথ দাস, শ্রীরসিকলাল দত্ত, শ্রীকালীচরণ সেন, শ্রীকামখ্যানাথ সেনগুপ্ত, শ্রীরাধানাথ হে, শ্রীনেপাল চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। (এইসূত্রে উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতায় সর্বপ্রথম সার্বজনীন দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১২৯৬ সালে। তিনি বড় লাঠি খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅনয় বসু প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা। ইহারা উভয়েই অনুশীলন সমিতির সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।)

এইরূপে অনুশীলন সমিতি বাংলার নবীন যুবক সম্প্রদায়কে নানারূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্যে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিল। সভ্যরা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু এক বিশিষ্ট অংশ এই সকল সাধারণ কার্যে সন্তুষ্ট রহিলেন না। বাংলায় বিপ্লববাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন সমিতি Recruiting centre-এ পরিণত হইল; ইহার ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সভ্য বাংলার বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন। মাণিকতলার 'যোগার আড্ডা' হইতে আরম্ভ করিয়া রডা কোম্পানীর পিস্তল সংগ্রহ (আত্মোন্নতি দ্বারা), তথাকথিত রাজনৈতিক ডাকাতি, রাজকর্মচারী হত্যা, প্রভৃতির দ্বারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবী ও সেনাদলের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও আমদানীর উদ্যোগ হইল। ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিবার জন্য জাপান জার্মানী প্রভৃতি বিদেশের সহিতও যোগাযোগ স্থাপিত হইল। এবং এই সমস্ত কঠিন বিপদজনক কার্য অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন সভ্যেরা কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিলেন। এই কার্যে ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রলোচন মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, বিনয়ভূষণ দত্ত, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন।

এই বিপ্লবের সংগঠন ক্রমবিকাশ, ষড়যন্ত্র, আয়োজন, কর্মপ্রণালী ও পরিণাম প্রভৃতি এক সুবিশাল ইতিহাস। ইহারই সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ৺রাসবিহারী বসু জাপান যান, তারকনাথ দাস আমেরিকা যান, ভূপতি মজুমদার সিঙ্গাপুর যান। ভারতীয় বিপ্লবের আর এক গুরুতর অধ্যায়—কানাডায় শিখদিগের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা। এই স্থানেই সুবিদিত গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। কোমাগাটা মারু জাহাজের ভারত অভিমুখে আগমন, বজবজে অবতরণ, এবং ইংরাজদিগের সহিত খণ্ডযুদ্ধ। এই সব ঘটনা কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

গদর পার্টির প্রধান উদ্যোক্তা লালা হরদয়াল-এর সহিত সমিতির বিপ্লবী স্বামী বিশ্বানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্পর্ক সর্দার অজিৎ সিং ও কিষণ সিংএর মারফত লালা হরদয়ালের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল।

এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন সভ্য বিদেশে চলিয়া যান। জাপান, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে গিয়া চাঁদা ও সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি চীনেও ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের পরামর্শ লওয়া হইল। ৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ৺বিনয়ভূষণ দত্ত জাভার জার্মান কন্‌সালের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্পর্ক বজায় রাখিতে গোয়াতে গিয়া ধরা পড়িয়া পুলিস নির্যাতনে প্রাণ হারাইলেন। অপর দিকে সুন্দরবনে ডাঃ শ্রীযতীন্দ্র ঘোষাল, শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি একদল গাছের উপর মাচা করিয়া দূরবীন দিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন—অস্ত্রের জাহাজ কখন আসিবে, মাল নামাইতে হইবে। এই সকল কার্যে হিন্দু জমিদার ও মুসলমান মাঝি মাল্লার যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।

এই সকল বৈদেশিক কার্যে যাহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম সভ্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তিনি ভারতের বাহিরে গিয়া রুশবিপ্লবে ও নবীন রুশ তন্ত্রে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরে Comrade M. N. Roy (মানবেন্দ্র রায়) নামে বিশ্ববিখ্যাত হন। তিনি Bolshevism ও Communism পরিচালনায় দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের বাহিরে অপরাপর অনেকে খ্যাতি লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন—জাপানে রাসবিহারী বসু, আমেরিকায় তারকনাথ দাস, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গাপুরে ভূপতি মজুমদার, ফণী চক্রবর্তী প্রভৃতি। এই নবজাগরণের সুযোগে অনেক বাঙ্গালী যুবক নানাবিধ শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন ও দেশে ফিরিয়া নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত বিপ্লববাদী ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় অনুশীলন সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তিনি এক সময়ে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লব পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইলে কিছুদিন তিনি নিরুদ্দেশ থাকিতে বাধ্য হন। তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য ২০,০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। এই অজ্ঞাতবাসকালে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ছদ্মবেশে, বিভিন্ন অবস্থায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশিত হইলে জনসাধারণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। শুনা যায় যাদুবাবুর অপূর্ব জীবন কাহিনীর কিছুমাত্র আভাষ লইয়া অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "পথের দাবী" লিখিয়াছেন। তাহাতে সব্যসাচীই যাদুবাবুর প্রতীক। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রজকে উপলক্ষ্য করিয়া My Brother's Face নামক পুস্তক লিখিয়া আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগতে অগ্রজের এই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

বিদেশী শাসকদিগের হস্তে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়া ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী পরবর্তী কালে রাঁচিতে বসবাস করিতে বাধ্য হন। (বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল)। তথায় চিকিৎসায় ব্রতী হন। ১৯৪৮ তিনি "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভবিষ্যতে বিপ্লবের ইতিহাস লিখিবার অনেক উপকরণের সন্ধান মিলিবে।*

---

*বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা (৭), সন ১৩৬৩ সাল। মূল্য বার টাকা।

এইসূত্রে আরও দু-একজনের নাম উল্লেখযোগ্য,—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ; তিনি বাল্যকালেও যেরূপ সরল স্বভাব অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এখনও সেইরূপ। বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নাড়ুলী মোহন মিত্র। ছাত্রমহলে তাঁহার সুনাম ও প্রতিপত্তি অবিসম্বাদী। ডঃ রসিকলাল দত্ত ডি, এসসি, Industrial Chemist to the Govt. of Bengal ইহারাও অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। এইরূপে এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে অনুশীলন সমিতির অপরিসীম প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তদানীন্তন সরকারী রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছিল যে, মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী যুবক শুধু কয়েকটি বোমা ও পিস্তল লইয়া নয়, পরন্তু ব্যাপকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা প্রায় অচল করিয়াছিল। ১৯১৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে একদিনে পেশোয়ার হইতে রাঙ্গুন পর্যন্ত সমস্ত সিপাহী বিদ্রোহের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

জগতের অন্যান্য পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে বাংলার বিপ্লব যেরূপ বিকল্প পরিবেশের মধ্যে, নানারূপ বাধা বিঘ্নের সম্মুখে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শক্তিমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব, দক্ষতা ও সফলতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গালীর অপূর্ব প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহামতি গোখলে একদা বলিয়াছিলেন "What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow." ১৯০৬ সালে লোকমান্য তিলক বলেন বাঙ্গালী যে খেলা খেলিবে তাহাতে জগৎ স্তম্ভিত হইবে। বস্তুতঃ বাংলার যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে তাহার মধ্যে Revolutionary genius অন্যতম। বিপ্লববাদেই বাংলার অসামান্য প্রতিভার পূর্ণবিকাশ। এই ক্ষেত্রে বাংলা যাহা সাধন করিয়াছে তাহা অনতিক্রম্য রহিয়া গিয়াছে।

রাজপুরুষেরা বিপ্লবীদিগকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিলেন। সমিতির বহু সভ্য রাজরোষে পতিত হইয়া অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, সর্বস্ব হারাইয়াছে, কারাগারে বন্দী বা অন্তরীণ, এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহাদের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ ও নিষ্কাম আত্মদান জাতীয় জীবনে নূতন উদ্দীপনা আনিয়াছিল।

১৯১৮ সালে ভারতের বিপ্লবের কারণ, প্রসার, প্রভাব, কর্মপদ্ধতি, উৎস প্রভৃতি অনুসন্ধান ও নির্ণয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট এক কমিটি গঠন করিলেন। বিলাতের জজ Sir Rowlatt এর নাম অনুসারে উহার নাম Rowlatt কমিটি হয়। উহার উপর বিপ্লব দমনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হইল। সংক্ষেপে উহাকে Sedition Report বলা হইত। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এই Report খানি অনুশীলন সমিতির ধারাবাহিক ইতিহাস বিপ্লবের সমস্ত ঘটনাবলী ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সহিত ইহাতে স্থান পাইল। কিন্তু সেই Rowlatt Report প্রকাশিত হওয়াতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বাংলার যুবক সম্প্রদায় ইহা হইতে বিপ্লবের নূতন প্রেরণা পাইল ও ত্রুটি বিচ্যুতির ইঙ্গিত পাইয়া তাহা সংশোধন করিয়া নূতন উদ্যমে বিপ্লবের কার্যে যোগদান করিল। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। অবশেষে ইহার কুফল (বা সুফল ?) লক্ষ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রকাশ বন্ধ করিলেন। সকল কপি বাজেয়াপ্ত করিলেন, অর্থাৎ নিজের বই নিজেই proscribe করিলেন। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্।

অনুশীলন সমিতির উপর শাসক সম্প্রদায়ের রোষদৃষ্টি পড়িল। ১৯০৮ সালে তাঁহারা সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন। ফলে তখনকার মত সমিতি বাহ্যত বন্ধ হইল বটে কিন্তু নানা স্থানে ছদ্মবেশে বহু বৎসর যাবৎ উহার কার্যকলাপ চলিয়াছিল।

বাংলাদেশের এই নব জাগরণের সময় বাংলার হিতকামী একজন ইংরাজ স্যার ভেনিয়েল হ্যামিলটন

(Sir Daniel Hamilton) সুন্দরবনে কৃষিকার্য্য কিরূপ লাভজনক তাহা প্রমাণ করিয়া বাঙ্গালী যুবকদিগকে চাকুরীর পরিবর্ত্তে উহাই জীবিকা উপার্জ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া পরামর্শ দেন। তদানীন্তন হাইকোর্টের বিচারপতি পরলোকগত শরৎচরণ মিত্র মহাশয়ও তাঁহার হরিণাভস্থিত জমিদারের স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে উহার সমর্থন করেন। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট Co-operative Act বা সমবায় আইন প্রণয়ন করেন। তাহারই সুযোগ লইয়া ও হ্যামিল্টন সাহেবের আন্তরিক সহায়তায় শরৎচরণ মিত্র মহাশয় ১৯০৯ সালে Bengal Youngmen's Zamindary Co-operative Society Ltd. প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা বাংলার দ্বিতীয় সমবায় সমিতি। ইহা মুখ্যতঃ অনুশীলন সমিতির সভ্য লইয়াই গঠিত। সতীশচন্দ্র ইহার সংগঠনেও সাহায্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত উহার কার্যকর্ম পরিচালনায় সহায়তা করেন। Daniel সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল Scotland এর আদর্শ অনুকরণে বাংলায় সমবায় সমিতি গঠন করা। তিনি বাঙ্গালী যুবকদিগকে চাকুরি মাত্র ভরসা করিতে নিষেধ করিতেন। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দিতেন তাঁহার বদান্যতার বিষয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই কার্য্যের সফলতার জন্য তিনি এক কোটি টাকা দান করিতে চাহিয়াছিলেন। অপর দিকে অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগের যোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে Daniel সাহেব এই প্রতিষ্ঠান গঠনের সম্পূর্ণ ভার এই সমিতির উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে এই কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। উক্ত এক কোটি টাকাও এই সমিতির হস্তে অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য ছিল।

[ক্রমশঃ

[শ্রীজীবনতারা হালদার প্রণীত 'বাংলার প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত।]

---

*লেখকের লিখনাঙ্কিত বাসভবনে ৩৫ বৎসর যাবৎ উহা কোন নাম বিনাই পরিচালিত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত উত্তর কলিকাতার হরিণাড়া শাখা অমরেন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাব নাম গ্রহণ করিয়া এই দীপ বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই ছদ্ম নাম ত্যাগ করিয়া পুনরায় হরিণাড়া অনুশীলন সমিতি নামে আত্মপ্রকাশ করে। অধুনা ইহা শুধু অনুশীলন সমিতি নাম ধারণ করিয়াছে। ইহা একটি যথারীতি রেজেষ্ট্রীকৃত সংস্থা এবং ইহার নিজস্ব ক্রীড়াক্ষেত্র ১৩নং ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৯ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত। এই কৃতিত্বের মূলে আছেন সমিতির অন্যতম সভ্য ৺কালাচাঁদ বসাক ও নিঃস্বার্থ কর্মীবৃন্দ। ঃ

পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ভারত মাতার বীর সন্তান যতীন্দ্রনাথের জীবন আদর্শ আজ দেশের যুবক-বৃদ্ধের প্রেরণার উৎস হোক্।

বাংলার যুবশক্তি তার পূর্ব গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেশ ও জনের কল্যাণে মহান আদর্শ গ্রহণ করুক্—এই কামনায় বিপ্লবীবীর যতীন্দ্রনাথের জীবন থেকে আবার আমাদের পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরলাম।

—সম্পাদক

বাঘা যতীন—একটি স্মরণীয় নাম

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার বিধানসরণিতে অবস্থিত আজাদ-হিন্দবাগে (হেদুয়া) বাংলার বিপ্লবীবীর বাঘা যতীনের মর্মর মূর্তিতে প্রায় নিত্যই দেখা যায় কে বা কারা নিঃশব্দে পুষ্পমাল্যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে যায়।

মনে মনে ভাবি এরা কারা? এই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার্ঘের মাঝে মহাকবির বাণীকে সত্য ভাষণে উদ্ভাসিত হতে দেখি, 'যে করিবে দান নিঃশেষে প্রাণ, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

১৯২৮ সনের সেই ৯ই সেপ্টেম্বর—যে তারিখটি বিপ্লবী মহা-জীবনের আত্মদান তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রোজ্জ্বল দিন। সেদিন থেকে আজকের দিনের পরিবর্তন অনেক। সেদিন দেশ ছিল পরাধীন—আজ আর আমাদের পরাধীনতার গ্লানি নেই। আমরা স্বাধীন। কিন্তু সেদিনের সেই মহৎ জীবনের প্রেরণা আজো আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে,—তাই সেদিনের ত্যাগ, চারিত্রিক মহিমা এবং স্বদেশ-প্রেমকে স্মরণ করে আজো আমরা বাঘা যতীনের মর্মর মূর্তিকে শ্রদ্ধায় ভরিয়ে রাখি। ভবিষ্যতেও রাখব। যুগ হতে যুগে এই ভাবধারার প্রবহমান গতি এই আবেগের স্পন্দন। বীরপূজার এই শ্রদ্ধার্ঘ আমাদের প্রাণের আকুতি—আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

তাই প্রতিদিন উত্তর কলকাতার আজাদ-হিন্দবাগ বা দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে বিপ্লবীবীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বিপ্লবী শহীদ যতীন নামের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদিত ফুলের মালার দিকে তাকিয়ে ভাবি—এরা তারা, এদেশেরই দেশমাতৃকার অনুরাগী সন্তানদল—যারা দিনের পর দিন এই নিঃশব্দ বিপ্লবের পূজারী।

পরাধীন দেশে অন্তরমুখীন দেশপ্রেম জাতির মধ্যে জাগরিত হয়েছিল—দেশের জনসাধারণের মধ্যে, তার বহিঃপ্রকাশে সবাইকে দেখা যায় নি বটে, কিন্তু দেশের মুক্তি-সাধনার যজ্ঞের প্রতি আবেগ সকলের মধ্যেই ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনসাধারণের মধ্যে আজো সে-আবেগ প্রতীয়মান ; তাই আজো শ্রদ্ধার অশ্রু-চন্দনে, পুষ্পমালার নৈবেদ্যে সাধারণ দেশবাসী দেশনেতার পূজা করে দেশপ্রেমের আবেগকে প্রকাশ করে।

স্বদেশ প্রেমিক বিপ্লবীবীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে একটি স্মরণীয় নাম।

যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার কয়া গ্রামের বাঙালি গৃহস্থের সন্তান যতীন্দ্রনাথ—বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহারা হয়ে কয়া গ্রামে মামার বাড়িতে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। বাল্যকাল থেকেই শরীর চর্চার প্রতি তাঁর অনুরাগ। 'ভেতো বাঙালি'—এ দুর্নাম মুছে ফেলার জন্যে তাঁর মানসিক গঠন গোড়া থেকেই। তাই খেলাধূলার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো—এসব শিক্ষাও লাভ করতে লাগলেন তিনি।

শক্তিমানেও মেধাবী ছাত্র যতীন্দ্রনাথ। কয়াগ্রাম থেকে এলেন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে মা মামা উকিল বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা লাভের জন্যে। এইখানে কিশোর কালেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের উন্মেষ। কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কৃষ্ণনগরে স্কুলে পড়া ছাত্রজীবন থেকেই যতীন্দ্রনাথের মনে আকুলতা, 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি!' এই জননী জন্মভূমি বন্দিনী—এর মুক্তি সাধনায় ব্যক্তির জীবন তুচ্ছ!

চারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশী গান যতীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পরাধীন ভারতে তখন স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছে। যতীন্দ্রনাথের মনে তার অগ্নিশিখার পরশ। তিনি কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে এফ-এ ক্লাসের ছাত্র।

বাংলার যুবক চিত্তে তখন অভূতপূর্ব এক স্পন্দন। প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর ক্ষেত্রনাথ গুহের আখড়ায় যতীন্দ্রনাথ ব্যায়াম চর্চা সুরু করলেন।

কৃষ্ণনগরের সেই কিশোর ছাত্র যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মনের সাহসে যাঁর ভরভর বলতে কিছুই নেই।

কৃষ্ণনগরের রাজপথে ছাড়া পাওয়া তেজিয়ান ঘোড়া ক্ষিপ্র বেগে ছুটে চলেছে সমস্ত পথে ত্রাসের সঞ্চার করে। পথচারি যে যেখানে পাচ্ছে প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে—কিশোর ছাত্র যতীন্দ্রনাথ বই খাতা বগলে নিয়ে তখন এ. ভি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছেন।

যতীন্দ্রনাথ বই খাতা রেখে ছুটন্ত ঘোড়ার রশি টেনে ধরলেন—বিদ্রোহী ঘোড়া পরাভব স্বীকার করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কয়াগ্রামে একবার বাঘের উৎপাত দেখা গেল। গ্রামবাসী বাঘের ভয়ে তটস্থ। বাঘ শিকার করতে যে ভদ্রলোক বন্দুক হাতে এগিয়ে এলেন কিশোর যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গী। গুলি খেয়ে আহত বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল যতীন্দ্রনাথের ওপর। যতীন্দ্রনাথ বাহু দিয়ে বাঘের গলা চেপে ধরে ভোজালী দ্বারা আঘাত করে বাঘটিকে মেরে ফেললেন। 'বাঘা যতীন'—পরাধীন ভারতের বন্ধন মুক্তির জন্যে তাই জীবনপণ করতে পেরেছিলেন।

কিছুদিনের জন্যে সরকারি চাকরি করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ; কিন্তু মনে-প্রাণে ছিলেন তিনি স্বাধীনচেতা। দেশ এবং জাতির প্রতি সত্রমবোধ তাঁর মর্মে মর্মে। সরকারি চাকরি-জীবনে চলেছেন তিনি দার্জিলিঙে। শিলিগুড়িতে এসে ট্রেন থেমেছে। ট্রেনের কামরায় একটি শিশু পিপাসা-কাতর; কিন্তু সে কামরায় কেউই নেমে জল আনতে সাহস পাচ্ছেন না পাছে ট্রেন ছেড়ে দেয়।

যতীন্দ্রনাথ জলপাত্র হাতে শিশুটির জন্যে জল সংগ্রহ করে ফিরছেন দ্রুত পদক্ষেপে—কয়েকজন গোরা সৈন্য ছিল প্লাটফর্মে। একই ট্রেনের যাত্রী। তাদের একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল যতীন্দ্রনাথের। জলপাত্র পড়ে গেল, কিন্তু শুধু তাই নয়, ক্রুদ্ধ গোরা সৈন্যরা তাঁকেও ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলে।

অপমানিত যতীন্দ্রনাথ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর প্রচণ্ডবেগে ঘুঁষি চালালেন গোরা সৈন্যের প্রতি। প্রবল মুষ্টি যুদ্ধ চলল। যতীন্দ্রনাথ একাই লড়ছেন। এবং সে লড়াইয়ে তিনি জয়ী হলেন। এই অসাধারণ তেজস্বী আত্ম-সম্মান জ্ঞানী, স্বদেশ-প্রেমিক বাঙালি বীর ক্ষত্রিয় তেজে বলীয়ান ছিলেন।

জীবন তাঁর শুধু দিনযাপনের নয়। বাংলা সন্তর্ষেষ্টের যৌবোজ্জ্বল হিসাবে শুরু হয় কর্ম-জীবন।

বিবাহ করে গার্হস্থ্য-জীবনেও প্রবেশ করেন যতীন্দ্রনাথ। এক কন্যা এবং দুই পুত্রের জনক তিনি।

কিন্তু এ-সবের কোন বন্ধনই তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়!'—যতীন্দ্রনাথ দীক্ষা নিলেন অগ্নি-মন্ত্রে। বাইশ বছরের যুবক যতীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন।

পিছনে পড়ে রইল ঘর-সংসার, চাকরি-বাকরি।

সন্ন্যাসী রাম দাসের শিষ্য শিবাজী সৈরিক পতাকাধারী—খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মুসলমান পদানত ভারতকে স্বাধীন এক হিন্দুরাজ্যে পরিণত করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য যতীন্দ্রনাথও সশস্ত্র বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে পণ করলেন ইংরাজ পদানত পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে তুলবেন।

সারা বাংলায় তখন বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব। কলকাতায় মানিকতলায় বোমা তৈরীর কারখানা। শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন কলকাতায়। ইনিই পরে স্বামী নিরালম্ব নামে পরিচিত হয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁর সংস্পর্শে এলেন। শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গেও বাঘা যতীনের যোগাযোগ ঘটল। মানিকতলার বোমা তৈরীর বাগান পুলিশ ঘেরাও করে ফেললে; কিন্তু যতীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল না।

সে মামলায় যতীন্দ্রনাথকে আসামী করে ধরা গেল না; কিন্তু হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলায় যতীন্দ্রনাথ হলেন প্রধান আসামী। মামলা চলল, মামলায় প্রমাণাভাবে রেহাই পেলেন যতীন্দ্রনাথ।

বিপ্লবীবীর যতীন্দ্রনাথ বা বাঘা যতীনের জীবন-কাহিনী বহু কথিত কীর্তিগাথা। বিপ্লবীদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, অকুতোভয় সাহসিকতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। রক্তনীর রক্ত দিয়ে তাঁরা নাম স্বাক্ষর করতেন। ধর্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতেন—জীবন মৃত্যু তাঁদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। দেশজননী স্বর্গাদপি গরিয়সী। সেই স্বর্গাপেক্ষা প্রিয় দেশ-জননীর বন্ধন মুক্তির জন্যে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম—তার মধ্যে আদর্শ নীতি এবং ধর্মবোধই ছিল প্রধান। হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলেছেন বাংলার বীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বার্থ, সংসার, ব্যক্তিগতলাভ, ক্ষমতার মোহ, দলবাজীর চক্রান্ত, নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারে নি। তাঁদের প্রতিটি কাজ তাই ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরা নয়, সমালোচনার বিষয়ও নয়।

বিপ্লবী সংস্থার কয়েকজন বিপ্লবী বৈদেশিক অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে কেমন করে বিশাল ইংরেজ রাজত্ব ভারতের বুক থেকে ধ্বংস করবেন—সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ ছিল না। শুধু ছিল অমিত বিক্রমের আত্ম-প্রত্যয় আর অসীম দেশপ্রেম—'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা।'

সেই কালিমা মোছাবার মহা প্রেরণায় প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জর্মানীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় সেখান থেকে আগ্নেয় অস্ত্র আমদানির পরিকল্পনা করলেন বাংলার বিপ্লবীদল। জাপানের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল সামরিক অস্ত্র সাহায্যের জন্যে।

যতীন্দ্রনাথ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী এঁদের পরিচালিত বিপ্লবীদল স্থির করলেন যুদ্ধকালীন সময়ে এঁরা ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব সুরু করবেন। কলকাতায় পার্থুরিয়াঘাটায় এই পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে যতীন্দ্রনাথ-এর গুপ্ত আলোচনা চক্র বসেছে। সেখানে গোয়েন্দা-বিভাগের গুপ্তচর নিরোধ হালদার উপস্থিত হয়ে যতীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই একজন বিপ্লবীর রিভলভারের গুলিতে নিরোধ হালদারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর

পূর্বে নিরোদ হালদার যতীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশ করে যায়। যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব-পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেছে।

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় গেছেন ব্যাংককে জর্মানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যে। সেই সময় কিতেন সাহিড়ী আমেরিকা ইউরোপ হয়ে ফিরেছেন। তিনি বাটাভিয়াতে জর্মান-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরেছেন। উত্তর ভারত বিপ্লব আন্দোলনের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। পিকলে ধরা পড়লেন, রাসবিহারী বসু বিদেশে পালালেন।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ কিন্তু দমলেন না।

আবার নব পরিকল্পনায় কাজ সুরু হল।

কলকাতায় বিপ্লবীদলের একটি আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা সংস্থা খোলা হয়েছিল হ্যারি ষ্ট্যাণ্ড নামে। এর মাধ্যমে গুপ্ত কাজ চলতে থাকে। বিপ্লবীবীর নরেন ভট্টাচার্য যিনি পরে এম, এন, রায় নামে খ্যাত বাটাভিয়া থেকে জানালেন যে তিরিশ হাজার রাইফেলস নিয়ে মেভারিক আসছে—সেই জাহাজ সুন্দরবনে রাইমঙ্গলে নোঙর করবে।

এম, এন, রায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠিক করলেন যে প্রেরিত অস্ত্রগুলি তিনভাগে ভাগ করে পূর্ববঙ্গের হাটিয়া, কলকাতা এবং উড়িষ্যার বালেশ্বরে প্রেরণ করা হবে এবং একযোগে আক্রমণ সুরু হবে।

বাংলাদেশে সৈন্যদের এ টে ওঠার সামর্থ সম্পর্কে বিপ্লবীদের মনে কোন সংশয় ছিল না; কিন্তু ভারতের সশস্ত্র রাজশক্তির সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হলে বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত তিনটি রেলওয়ে জীবন ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলওয়ে আটকাবেন, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় চক্রধরপুর থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এবং সতীশ চক্রবর্তী অন্যত্র যাবেন এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সেতু উড়িয়ে দেবেন।

কিন্তু বাটাভিয়া থেকে জর্মান-জাহাজ এসে পৌছালো না। উপরন্তু যতীন্দ্রনাথের সমস্ত পরিকল্পনা ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের নজরে এল। যতীন্দ্রনাথের কাছে খবর পৌছাল মেভারিক জাহাজ জাভায় ব্রিটিশ রণতরীর কাছে ধরা পড়ে গেছে।

যতীন্দ্রনাথই এই বিপ্লবীদলের নায়ক—পুলিশ তাই যতীন্দ্রনাথের তল্লাসে সর্বত্র অনুসন্ধানে রত। যতীন্দ্রনাথের ফটো ছেপে বিলি করা হল। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হল। অবশেষে বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খানাতল্লাস করে যতীন্দ্রনাথের আশ্রয়স্থলের সন্ধান পাওয়া গেল।

বালেশ্বর থেকে কুড়িমাইল দূরে কাপ্‌তী পোধার সেই গভীর জঙ্গল—সেই জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছেন বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারজন অনুগামী সহচর নিয়ে। বালেশ্বরের এই যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী।

কলকাতা গোয়েন্দা পুলিসের অধিকর্তা টেগার্ট, বালেশ্বরের জেলাশাসনকর্তা আর বিরাট সশস্ত্র পুলিস বাহিনী জঙ্গল ঘেরাও করে ফেলেছেন একদিকে, অপরদিকে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং জ্যোতিষ পাল।

দু'পক্ষে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ। চিত্তপ্রিয় আহত এবং নিহত—যতীন্দ্রনাথও আহত, গুলি ফুরিয়ে এসেছে।

যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর আর চারজন সঙ্গী ধরা পড়লেন। বালেশ্বর সরকারী হাসপাতালে আহত যতীন্দ্রনাথ শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করতে চেয়েছিলেন। বীরের প্রতি সম্মান দেখাতে ইংরেজ রাজপুরুষ টেগার্ট নিজে গিয়ে বুড়িবালাম নদীর জল নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবী বীর স্বাধীনতার শত্রুর কাছ থেকে সে জল গ্রহণ করে নি।

যতীন্দ্রনাথের জীবনের এ-সব কাহিনী অল্প বিস্তর অনেকেরই জানা আছে। তাঁর ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে; কিন্তু বিপ্লবীর আত্মিক ভাবধারা—সে ভাবধারা মৃত্যুহীন। সেই মৃত্যুহীন মহাজীবনের প্রতি পরম অনুরাগকে লক্ষ্য করেছি যতীন্দ্রনাথের প্রিয়তমা পত্নী শ্রদ্ধেয়া ইন্দুবালা দেবীকে দেখে। যতদিন শ্রীমতী ইন্দুবালা জীবিত ছিলেন তাঁর সিঁথিতে ছিলো স্বামী সৌভাগ্যবতীর এয়োতীর চিহ্ন—লাল টক্‌টকে সিঁদুর।

যুগের মহামানব বিপ্লবের যে আত্মিক দীক্ষা রেখে গেছেন—তারই ভাব সঞ্চারিত হতে বুঝি বা দেরি উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্কে। তাঁর মর্মর মূর্তির কণ্ঠে দোদুল্যমান টাটকা ফুলের মালা সেই ভাবের প্রতি অনুরাগের অর্ঘ্য।

জীবন থেকে জীবনে যে-ভাবধারা সঞ্চারিত হয় তা বাস্তব বা সাময়িক রাজনৈতিক কারণের বিপ্লব নয়, তা চিরদিনের এবং চিরকালের বৈপ্লবিক দেশপ্রেম—স্বামী বিবেকানন্দের তা উদাত্ত আহ্বান—'তুমি মরিয়া হও প্রস্তুত!' সন্ন্যাসীর আহ্বানে বাংলার যে রাজনৈতিক বিপ্লববাদ—তা সীমিত নয়,—তার প্রসার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, কাপুরুষতা থেকে সাহসিকতার অভ্যুত্থানে।

বন্দে মাতরম্!

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নাট্যদর্শকের দায়িত্ব

তুলসী লাহিড়ী

[বিগত যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার, নট ও সুরকার তুলসী লাহিড়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনী অগ্রহায়ণ সংখ্যা পল্লী-ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় তাঁর একটি সুপ্ত বিস্মৃত রচনার অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করে দেওয়া হল। লেখাটির মধ্যে তুলসীবাবুর নাট্যমননশীলতার পরিচয় পরিস্ফুট।]

নাটক দৃশ্যকাব্য। ঘটনা পরম্পরায়, বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে ও সংযোগে নাটকে যে পরিণতি হয় তাতে কাব্যরস সৃষ্টি হয়। রূপ ও ধ্বনি নাটকের প্রধান উপাদান। তাদের সুসমঞ্জস সমাবেশের ফলে দর্শকগণ যদি তাঁদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতির কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে নাটকের রসাস্বাদনে তৃপ্ত হন, তাহলেই নাটক সার্থক হয়।

ভাল নাটক, ভাল অভিনয়, ভালভাবে পরিবেশিত হয়ে দর্শকদের ভাল লাগলে এবং কখনো জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতসারে তাঁদের মনের পুষ্টির কারণ হলে তাকে কল্যাণকামী নাটক বলা যায়। নাটক কল্যাণকামী হয়ে সার্থক হতে হলে দর্শকের দায়িত্ব পরিবেশকদের চেয়ে কম নয়।

বিগত যুগের দর্শকদের তৃপ্তি না দিলেও, এযুগের দর্শকরা ভাল কিছুর স্বাদ না জানায় যা পাচ্ছেন তাতেই খুসী হচ্ছেন। এই অধোগতির ফলে আমরা এদেশের কত কিছু গৌরব করবার মত শিল্প হারিয়েছি, তা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে বহু দেশ আছে যেখানে নাটক নেই। এদেশের অনেক প্রদেশে ও যাত্রাই ছিল না। তাই আজ সিনেমার রং তামাসা সে সব প্রদেশে সহজে আসর জমিয়েছে। রসবোধের ছিটে ফোঁটা আজো বাংলাদেশে আছে তাই বিশ্বের রসের বাজারে তার কিছুটা স্বীকৃতি আছে। উচ্ছৃংখল, স্বার্থান্বেষী ও ব্যক্তিক ধনিদের খেয়াল খুশীতে সেটুকুও যাবে, না, বাংলার রসিক জনসাধারণ সচেষ্ট হয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, এইটাই আজ সমস্যা।

মঞ্চ মালিকরা দেশের ও দশের কল্যাণকামী হলে মাঝে মাঝে সুনাটক মঞ্চস্থ করে পরীক্ষা করতেন এবং নিরাপার ব্যথায়, দারিদ্রের দুঃখে আদর্শভ্রষ্ট জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে কিছুটা চেষ্টা করতেন। তার জায়গায় দেখতে পাচ্ছি নিলজ্জ ধোঁকাবাজি।

মানুষের প্রথম শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস কিছু সার্থক সৃষ্টি আনে না। তাকে নিরুৎসাহ করলে তার প্রেরণার উৎস বন্ধ করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে নষ্ট করা হয়। আবার শুধু উৎসাহ দিলেও, তার আত্মম্ভরিতা আসে এবং সে নিজেকে ক্ষণজন্মা মহাশক্তিধর ভাবতে সুরু করে নিজের সর্বনাশ নিজেই করে। তাই যাঁরা এই শিল্পের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্পর্ধা রাখেন তাঁদের প্রথমেই সুবিজ্ঞ সমালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে দর্শকের কাছে নিজেদের অক্ষমতা, দুর্বলতার কথা প্রকাশ করে তাঁদের সহানুভূতি চাইতে হবে।

উপবাস করে, কৃচ্ছসাধন করে যে তপস্যা করা যায়, এ শিল্পের তপস্যা ঠিক তা নয়। শিল্পীকে বা স্রষ্টাকে অন্ততঃ বাঁচার তাগিদে ব্যভিচারী হোতে না হয় এদিকে রসিক দর্শকদের দৃষ্টি রাখতে হবে। সার্থক নাটক দেখে দর্শকরাই যদি প্রচারের ভার নেন তবে অনেক প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন নবীন দলের কিছুটা ভার কমে। তাঁরা যথার্থ ভাল নাটক মঞ্চস্থ করবার সাহস পান। শুধু চাকচিক্যের মোহে না ভুলে যদি কিছু সংখ্যক দর্শকও নাটকের রসামৃতের সন্ধানে থাকেন, আমার বিশ্বাস, আজো তা তাঁরা পেতে পারেন। আশা, ভেজাল ও নকলের যুগে খাঁটিও হয়ত সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এরসকে নির্ভেজাল রাখার দায়িত্ব শুধু ব্যবসায়ী শিল্পীদেরই নয়, শিল্পরসিকদেরও।

রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' নামক একখানি নাটক অভিনীত হয়। এই তাঁহার প্রথম নাটক রচনা। বরোদার গাইকোয়াড় তৎস্থানস্থ রেসিডেন্টকে খাদ্যের সহিত হীরকচূর্ণ প্রদানে হত্যা চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হন, এই ঘটনা লইয়া নাটকখানি রচিত। এই নাটকাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রথম রেলগাড়ী দেখানো হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি সে সময়ে কলিকাতার পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টে কার্য্য করিতেন। তিনিই এই রেলগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পাছে অন্য কোন অভিনেতা চালাইতে গিয়া অকৃতকার্য হন সেজন্য তিনি স্বয়ং ড্রাইভার সাজিয়া ট্রেন চালাইতেন। তাঁহার কৃতিত্বে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এক রাত্রে হীরকচূর্ণ অভিনয় হইতেছে। যথাকালে রেলগাড়ী ঘুম ঘুমীরণ ও ঘস্ ঘস্ বংশীধ্বনি করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল, দর্শকগণ দেখিলেন, যোগেনবাবু ড্রাইভার সাজিয়া ট্রেন চালাইতেছেন, সবুজ নিশান হাতে স্বয়ং প্রযোজক অমৃতবাবু গার্ড সাজিয়া গাড়ীর পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু গাইকোয়াড় সাজিয়া কামরার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন,—রঙ্গমঞ্চে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া দর্শকবৃন্দ পরম আনন্দে করতালি দিতে লাগিলেন।

কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে হঠাৎ সেদিন সেমন কল খারাপ হইয়া গাড়ী চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া গেল। যোগেনবাবু নানারূপ কৌশল করিয়াও যখন সুবিধা করিতে পারিতেছেন না,—সহসা রঙ্গভূমে দর্শকগণ মধ্যে যখন বিদ্রূপসূচক হাস্যধ্বনি উঠিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় অমৃতলালবাবুর মাথায় হঠাৎ একটি উপস্থিতবুদ্ধি জোগাইল।—তিনি তৎক্ষণাৎ বিপদ ঘটনার সাংকেতিক নিদর্শন স্বরূপ লাল নিশান ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ অমৃতবাবুর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমৎকৃত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

* * *

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যে সময় কবিবর হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" মহাকাব্য নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হয় সে সময় যোগেনবাবু আর একবার তাঁহার ইনিভিজিবিলিটি মাথা খাটাইয়া ছিলেন,—কিন্তু অন্যের অসাবধানতায় তাহা দুর্ঘটনায় পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

বৃত্রসংহারে বর্ণিত আছে,—স্বর্গ-বিতাড়িতা শচীদেবী যে সময়ে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন সে সময় দানবরাজ বৃত্রের আদেশে তৎপুত্র রুদ্রপীড় শচীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হয়। সে শচী-পুত্র জয়ন্তকে পরাস্ত করিয়া এই হীন কার্য্য নিজে না করিয়া তাহার অনুচর নিকষজ নামক এক হৃদয়হীন দৈত্যকে আদেশ করে। নিকষজ শূন্য হইতে আসিয়া শচীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক গগন পথে লইয়া ঊর্দ্ধে অদৃশ্য হয়।

এই দৃশ্যটি দর্শক সমক্ষে প্রস্ফুটিত করিয়া দেখাইবার জন্য যোগেনবাবুর উপর ভার অর্পিত হয়। যোগেনবাবু কলকব্জা ঠিক করিয়া লইয়া, কার্য্য সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত স্বয়ং নিকষজ দৈত্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কাদম্বিনী নাম্নী অভিনেত্রী শচীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগেনবাবু তাঁহার ঘাড়ে ও কোমরে বেল্ট বাঁধিয়া দুইটি কড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন এবং আপনার পায়ে ও কোমরে হুক আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। কাদম্বিনীকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, "যখন আমি উপর হইতে নামিয়া আসিব তখন তুমি অভিনয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রতার সহিত কড়াগুলি লাগাইয়া লইবে।"

যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য অভিনয় হইতেছে, রুদ্রপীড়ের সহিত ভীষণ সংগ্রামে আহত ও ভূপতিত জয়ন্তকে দেখিয়া শচীদেবী সকরুণ বিলাপ করিতেছেন,—দর্শকগণ আর্দ্র নয়নে মুগ্ধ হইয়া সেই মর্ম্মভেদী অভিনয় দেখিতেছেন,—এমন সময়ে নিকষজ দৈত্যবেশী যোগেনবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সহসা সবলে শচীর কেশাকর্ষণ করিলেন। সহসা শূন্যপথে দৈত্যকে নামিতে দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন; তারপর দৈত্য যখন আসিয়া নির্ম্মমভাবে শচীদেবীর কেশাকর্ষণ করিল,—তখন ঘৃণায় ও ক্রোধে দর্শকগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—রঙ্গালয়ে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। দর্শকগণের এই প্রবল উত্তেজনা,—নাট্য-সংঘর্ষের এই অদ্ভুত উদ্দীপনা দর্শনে শচীবেশধারিণী কাদম্বিনীও এমনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার আর হুকে কড়া লাগাইবার কথা একেবারেই স্মরণ নাই।

এদিকে যোগেনবাবুর সংকেতে কল চলিতে আরম্ভ করিল। শচীদেবীর কেশ আকর্ষণ করিয়া দৈত্য উপরে উঠিতেছে। যখন চুলে বিলক্ষণ টান পড়িল, তখন কাদম্বিনীর চৈতন্য হইল—সে তো হুকে কড়া লাগাইয়া দেয় নাই! আবার যোগেনবাবুও যখন কাদম্বিনীর সমস্ত দেহভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন—কাদম্বিনী হুকে কড়া লাগাইয়া দেয় নাই, কেবলমাত্র সে তাঁহার মুষ্টি নিবদ্ধ কেশাকর্ষণে ঝুলিতেছে—তখন তিনি ত্রস্ত ও ভীত হইয়া প্রাণপণে কাদম্বিনীর চুলের মুঠি ধরিয়া রহিলেন। বিষম

আকাশে উল্কাপাতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হওয়ায় শূন্য পথে ছুটিতে ছুটিতে কাদম্বিনী উচ্চৈঃস্বরে পরিত্রাহি চিৎকার আরম্ভ করিলেন। এদিকে কাব্যামোদী দর্শকবৃন্দ হেমবাবুর কুমন্ত্রণায় বলিত—

"দানব-কবলে তথা,
নিরস্ত্র সুজন-সভা।
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শচী কলেবর।"

প্রত্যক্ষ মিলাইয়া পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সমবেত দর্শক মণ্ডলী শচীর প্রাণপণ আর্তনাদ—জীবন্ত অভিনয় জ্ঞান করিয়া নিদারুণ উল্লাস ও বিষম করতালি ধ্বনিতে রঙ্গালয়ের ছাদ পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেই হরণ-দৃশ্যেই অঙ্কের শেষ। ড্রপ পড়িবামাত্র সকলে ছুটিয়া গিয়া ষোড়শীমানা কাদম্বিনীকে ধরিয়া নামাইয়া ফেলিলেন।

নানা মুনির নানা মত

বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলনে এবছর বহু নাট্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে নানা মত নানা আলোচনা শোনা গেল। ২৬শে থেকে ২৮শে এপ্রিল তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনের প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকের আসনে ছিলেন যথাক্রমে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীবসন্ত রায়। নাটকের প্রয়োজনা ও নাট্যকারদের প্রতি নাট্যসংস্থাদের অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা করলেন যথাক্রমে নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ও নাট্যকার শ্রীসুনীল চক্রবর্তী। সভার প্রারম্ভে স্বর্গত কবীন্দ্র শ্রীসুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন অধ্যক্ষ পি. কে. গুহ। সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি যে ভাষণ দিলেন তার মধ্যে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী কিছু স্মৃতিচারণ করলেন। শ্রীবসন্ত রায় বললেন, বাংলায় নাটকের যেন দুর্ভিক্ষ এসেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বললেন, হ্যাঁ, অজস্র নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনয়ও হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে বাংলা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, বাংলায় নাটক লেখা হচ্ছে কিন্তু বাঙালীর নাটক লেখা হচ্ছে না। সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীবাসবিহারী সরকার তাঁর কার্যবিবরণীতে গত বছরকার নাট্যপ্রবাহের একটি চিত্তাকর্ষক লালতামারি পেশ করে জানালেন ১৯৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর বাংলা নাট্যশালার শত বর্ষ পূর্ণ হবে। জাতির নাট্যজীবনের ঐ মহাদিনটিকে যথোচিত নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন।

দ্বিতীয় দিনে সভাপতি ছিলেন ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অজিত ঘোষ। দুটি বিষয়ের আলোচনা হয়। আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় আংগিক ও অ্যাবসার্ড নাটক। প্রযোজক শ্রীঅমর ঘোষ নাট্য প্রযোজনায় আংগিকের ব্যবহার সমর্থন করলেন। অ্যাবসার্ড বা কিমিতি নাটকের আলোচনায় ডঃ অজিত ঘোষ বললেন, পছন্দ না করলেও অ্যাবসার্ড নাটক এদেশে এসেছে এবং তাকে উপেক্ষা করা চলেনা। ডঃ সাধন ভট্টাচার্য কিন্তু জোরের সঙ্গে বললেন, অ্যাবসার্ড নাটক বিকৃত মনোবৃত্তির পরিচায়ক, এদেশে তা চলবে না।

তৃতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল যাত্রা ও তার আধুনিকীকরণ। ঐদিন প্রধান অতিথি ছিলেন

যাত্রাজগতের এক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নট অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যে বহু যাত্রা নাটক থেকে আবৃত্তি করলেন, গান গাইলেন। একাশী বছর বয়সেও এখনো কী গলা, কী উচ্চারণ, কী বাণীর বিশুদ্ধতা। তাঁর সেই ভাষণ দিয়েই তিনি যেন প্রমাণ করে দিলেন যাত্রার অভিনয়টাই বড় কথা, আংগিক নয়।

অধ্যাপক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ও যাত্রা নাটকের প্রযোজক শ্রীঅমর ঘোষ যাত্রার আধুনিকীকরণের পক্ষে বললেন। তার বিরোধিতা করে এক যুক্তিপূর্ণ ভাষণে ডঃ অজিত ঘোষ বললেন, যাত্রার জাত মেরে তার আধুনিকীকরণ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

এই আলোচনার মধ্যে পূর্ববঙ্গ নিবাসী তরুণ নাট্যকার শ্রীসুতিময় বন্দ্যোপাধ্যায় এক উদ্দীপ্ত ভাষণে পূর্ববঙ্গের নাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করে বললেন, পূর্ব বাংলায় হিন্দু মুসলমান একত্র হোয়ে সেখানকার জঙ্গী শাসনকে অগ্রাহ্য করে বাংলা নাটকের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের জয়গান করছেন, মানুষের বিবেককে জাগাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

সভাপতি শ্রীমনোজ বসু সংক্ষেপে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

চতুর্থ দিনে নাটকের নানা বিষয় নানা সমস্যা নিয়ে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন ধরণের যেসব আলোচনা হল তাতে অংশ নিয়েছিলেন ঐদিনের সভাপতি ডঃ অজিত ঘোষ, প্রধান অতিথি শ্রীমন্মথ রায়, সম্পাদক শ্রীদাসবিহারী সরকার, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তু সেন, শ্রীসুধী প্রধান, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা, শ্রীউৎপল রায়, শ্রীরণজিৎ দত্ত ও শ্রীবাদল সরকার। এঁদের মধ্যে শ্রীদাসবিহারী সরকারের বক্তব্য ছিল ভিন্ন। তিনি বললেন, নাট্য ঐতিহ্যে, নাট্যানুরাগে এবং নাট্য সাধনায় বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অগ্রণী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরাজ্য এতাবৎ সরকারের কাছ থেকে কোন উল্লেখযোগ্য সহায়তা পায়নি। রবীন্দ্র সদনের উল্লেখ করে তিনি বললেন, এখানে মাঝে মাঝে শুধু নাচগান নাটকের অনুষ্ঠান না হোয়ে সেই সঙ্গে যদি প্রগতিবাদী নাট্য সংস্থাদের নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহলে তার মাধ্যমে অনেক শক্তিশালী নাট্যকার, পরিচালক, কলাকুশলী ও শিল্পীর উদ্ভব সম্ভব হবে এবং এরাজ্যের নাট্যপ্রবাহ আরো জোরদার ও উৎকর্ষ সম্পন্ন হোয়ে উঠবে। তিনি একটি পৃথক সাংস্কৃতিক মন্ত্রীদপ্তর সৃষ্টি করে বাংলার বিভিন্ন শিল্প ও নাট্য প্রবাহকে পরিপুষ্ট এবং সুসংবদ্ধ করবার জন্য রাজ্যসরকারের কাছে আবেদন জানালেন।

রবীন্দ্র সদন সম্পর্কে শ্রীসরকারের বক্তব্যকে সমর্থন করে শ্রীমন্মথ রায় বললেন, এবিষয়ে কিছু কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে। সদনের সংলগ্ন জমিতে একটি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে এবং পৌরসভাকে দিয়ে সদনের বড় বড় পার্কে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারে ঐ রকম একটি মঞ্চ স্থাপনের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

অতঃপর চারদিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে সম্পাদক শ্রীসরকার সকলকে ধন্যবাদ জানালেন।

অধিবেশনের চারদিনই প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল এবং ব্যবস্থাপনাও ছিল নিখুঁত ও আনন্দ দায়ক। শ্রীসরকার ছাড়া আর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করেছিল তাঁরা হলেন, কর্মসূচী প্রণয়নে শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রচারে শ্রীসাতকড়ি পাল, ব্যবস্থাপনায় শ্রীকানাই ধাপা ও রেকর্ডিং এবং মাইকের সুব্যবস্থায় শ্রীকমল চৌধুরী।

নাট্য প্রবাহ

জামসেদপুর : একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ২৩শে মার্চ থেকে ২৮শে পর্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী টেলকোর "সমূহ কল্যাণ সঙ্ঘ" তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে চতুর্থ বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন টেলকোর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (অন্তর্নাটক) নাট্যদূত (ছেঁড়া তমসুক) ধূমকেতু (উপসংহার) অগ্রদূত (বাস্তিক) প্রান্তিক (আমি এ চাইনি) ও বিষ্ণুপুরের দি বর্তিন (জানা), রাঁচীর বৈশাখী (কেয়া-কুল) হিন্দ ফ্রেণ্ডস ইউনিট (ব্যাড ম্যাটার) মিলনী (আমেন) ও ইউনিয়ন ক্লাব (রক্তে রোঁয়া ধান) এবং কোলকাতার নাট্য গোষ্ঠী খেয়া (সংঘাত)।

প্রধান বিচারপতি ছিলেন নবযুগের সুখ্যাত নাট্যকার শ্রীতরুণ রায় এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রবীর মিত্র ও প্রবীণ কৃতি অভিনয়শিল্পী শ্রীবিভূতি ঘোষ। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের নেপথ্যে ছিল শ্রীদামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রয়াস ও আন্তরিক শ্রীপ্রশান্ত কুমার বসুর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা।

• শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয়ের সম্মান লাভ ক'রে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক পান রাঁচীর "বৈশাখী"। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন কলকাতার 'খেয়া'।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মর্যাদায় ভূষিত হোয়ে ৫০ টাকা লাভ করেন শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় (কেয়াকুল)। পরবর্তী কুশলী অভিনেতা বিবেচিত হোয়ে ২৫৲ পুরস্কার পান শ্রীপ্রদীপ চক্রবর্তী (আমি এ চাইনি) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে ৫০৲ টাকা পুরস্কার পান শ্রীমতী পূর্ণিমা মল্লিক (প্রভা : আমেন)

দ্বিতীয়া অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন এবং ২৫৲ টাকা পুরস্কার পান শ্রীমতী নীলা চট্টোপাধ্যায় (কেয়াকুল)

শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে বিঘোষিত হন সর্বশ্রী দেবব্রত মুখোঃ ও বরুণ রায় এবং শ্রেষ্ঠ মঞ্চ সজ্জার জন্য স্বীকৃতি লাভ করেন।

এ-ছাড়া প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ব'লে অভিজ্ঞান পত্র পান : সর্বশ্রী সুরেশ মাইতি, পরিমল দত্ত, আবু দত্ত, অরুণ দত্ত, মন্দিনী মুখোপাধ্যায়, ভোলা চট্টোপাধ্যায়, কানু দাস, চন্দন সেনগুপ্ত, বাণী গুপ্ত, মহুশ্রী মিত্র, সুধাংশু সেন, গৌর সেন ও মনী দাসগুপ্ত।

জামসেদপুরে অভিনয়

টেলকোর 'বঙ্কিম' গত ১৫ই মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় গোলমড়ীর ইউনিং ক্লাবের 'বঙ্কিম-স্মৃতি' মঞ্চে অমিয়ভূষণের "ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না" ও শ্রীমনোজ মিত্রের "কালবিহঙ্গ" এই দু-খানি একাঙ্ক নাটিকার অভিনয়ের আয়োজন করেন। অভিনয় সুষ্ঠু। গোষ্ঠী-নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রকাশ পায় তাঁদের অভিনয়ে। শ্রীপ্রদীপ চক্রবর্তীর পরিচালনা নিষ্ঠার সাক্ষ্য বহে। শ্রীবাশিক দাসের অঙ্গসজ্জা চরিত্রানুগ। আবহ সঙ্গীত কালোপযোগী।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : সর্বশ্রী পঙ্কলোচন বসু, সুবেশ সরকার, শ্যামল সরকার, প্রদীপ চক্রবর্তী, পূর্ণানন্দ সিংহরায়, বহু চক্রবর্তী, কানু চক্রবর্তী, প্রদীপ দাসগুপ্ত, মন্টু চক্রবর্তী, অমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় খেয়া ও তুষার দাসগুপ্ত।

———

খেলাধূলা

জ্যোতির্ময়

খেলার মাঠে প্রার্থনা

প্রার্থনায় যে মনের বল ফিরে আসে, দৈব প্রেরণা আসে একথা জগতের সর্বত্র সবাই বোধ করি স্বীকার করেন। এমন কি দেখা গেছে, যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, তাঁরাও বিপাকে পড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

অবশ্য বিশেষে সর্বস্তরের মানুষই কখনো না কখনো ভগবানকে ডাকেন, প্রার্থনা জানান। খেলার মাঠে খেলোয়াড়রাও এই প্রার্থনার সার্থকতাকে মেনেছেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

১৯৪৩ সালে ইডেন উদ্যানে রনজি ট্রফির ফাইনাল খেলা হচ্ছে। বাংলা বনাম হোলকার। দুর্ধর্ষ দল হোলকার। তার অধিনায়ক ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-বীর কর্ণেল সি. কে. নাইডু।

হোলকার দল প্রথম ইনিংস-এ রাণের দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটেছে। এ ম্যাচ বুঝি হোলকার হারল। শেষ জুটি খেলতে নেমেছেন—হীরালাল গাইকোয়াড় আর বনওয়ারে। কিন্তু তাঁরা আর কতক্ষণ টিকবেন। অনেক সময় এখনো বাকী। বাংলা দল জয়ের আশায় উৎফুল্ল। উৎফুল্ল হাজার হাজার বাঙালী দর্শকও।

হোলকার-অধিনায়ক নাইডু ফিল্ড হোমে প্যাভিলিয়নে বসেছিলেন। বোধহয় মনে মনে প্রার্থনাই করছিলেন। ভগবৎ-ভক্ত ছিলেন তিনি। কলকাতায় এলেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল, কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসা।

হঠাৎ তিনি ছুটে মাঠের মধ্যে এলেন। তাঁর দলের শেষ দুই খেলোয়াড়কে ডেকে বললেন, তোমরা কী ভাগ্যবান। তোমাদের প্রার্থনা দেবী শুনেছেন। তোমাদের নিজেদের দলের মান রক্ষা করবার জন্যে ভগবতী কালী তোমাদের নির্বাচিত করেছেন, তোমাদের কী সৌভাগ্য, তোমরা আজ অতুল গৌরবের অধিকারী হবে। ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে সাবধানে খেলে যাও, কোন প্রলোভনে ভুলো না, উইকেট রক্ষা কর, সারা দিন ধরে খেল, সময় পার করে দেওয়া চাই।

খেলোয়াড় দু'জন মন দিয়ে শুনেছিলেন তাঁদের অধিনায়কের কথা, মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তারপর সারাদিন দু'জনে খেলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত আউট হননি। ফলে হোলকার সে বছর রনজি ট্রফি জয় করেছিল।

প্রার্থনায় যে কাজ হয় তার এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হোতে পারে?

মনে পড়ছে ১৯৬০ সালের অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের মাঠে সেই টেস্ট ম্যাচের কথা।

কোন টেস্ট ম্যাচে এ পর্যন্ত আর কখনো দু'দলের রাণ সংখ্যা সমান সমান হোয়ে খেলা শেষ হয়নি।

খেলার শেষ সময়ে সে কী উত্তেজনা! কে হারে, কে জেতে! চার রানের ব্যবধান! শেষ উইকেট! ওয়েষ্ট ইনডিজ খেলছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। শেষ রানে ব্যাট করছে অস্ট্রেলিয়া! শেষ উইকেটে কুড়ি রান দরকার! তাহলেই জিত। অল্পঅল্প রান এগোচ্ছে! এই বুঝি আউট। না আউট নয়। দু' এক রান, এমনি করে রান উঠতে উঠতে দু'দলের রান সংখ্যা সমান হল। আর এক রান করতে পারলেই অস্ট্রেলিয়া জিতবে। শেষ ওভারের শেষ বল। বল করছেন ওয়েষ্ট ইনডিজের মারাত্মক বোলার ওয়েসলি হল।

হঠাৎ দেখা গেল, শেষ ওভারের শেষ বলটি দেবার আগে হল থেমে দাঁড়িয়েছেন। গলায় ঝোলানো ছিল ক্রুশ চিহ্ন, বারবার সেটি মাথায় ঠেকাচ্ছেন আর মনে মনে বিড় বিড় করে কী যেন বলছেন। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তার পরেই ওয়েসলি হল তাঁর শেষ বলটি দিলেন। আউট হোয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার শেষ খেলোয়াড়, ম্যাচ তারা জিততে পারলো না!

বিপদের সময় ঈশ্বরের প্রতি এই নির্ভরতা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, অঘটন ঘটিয়েছে।

১৯৬৯ সালে দিল্লীতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারত তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী দল অস্ট্রেলিয়া। তাদের হারায় সাধ্য কার।

ভি. ভি. গিরি তখন দিল্লীর গভর্ণর। তিনি খেলা দেখতে এসেছেন। হঠাৎ একজন সাংবাদিক তাঁর কাছে ছুটে এলো। তার হাতে পুজোর প্রসাদ আর সিঁদুর মাখানো শালপাতা। সেই সিঁদুর সে গিরির কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, বেনকটেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে এই সিঁদুর আর প্রসাদ এনেছি! এই সিঁদুরের ফোঁটা যখন দিল্লীর সর্ব প্রধান নাগরিকের কপালে লাগিয়ে দিতে পেরেছি, তখন আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

সাংবাদিকের কাণ্ড দেখে সকলে অবাক। কিন্তু তার সন্দেহাতীত আন্তরিকতায় মনে মনে সবাই স্বয়ং গিরিও। ভক্তিভরে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করলেন। আশেপাশে যারা ছিল তারাও।

সেই খেলায় ভারত জয়লাভ করেছিল।

কোন খেলায় জয়লাভের পর খেলোয়াড়রা আনন্দে আবেগে খেলার অব্যবহিত পরেই বিগলিত চিত্তে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এমন নজীরেরও অভাব নেই।

অলিম্পিক হকিতে বত্রিশ বছর ধরে ভারতের প্রাধান্য। অপরাজেয় দল ভারতবর্ষ। তার সেই গৌরব ভাংলো ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে।

সেই খেলার শেষ সংকেত ধ্বনি যখন শোনা গেল, খেলা যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল, পাকিস্তান দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় মাঠের মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক প্রার্থনা জানাচ্ছে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

১৯৬২ সালে ক্যায়েরো সুলতান যখন উইম্বলডনের মহিলা সিংগলস খেলায় জয়ী হলেন তখন দেখা গেল খেলার শেষে তিনি অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। পরে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমি জয়ের আনন্দে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম।

এসিয়ার রেকর্ড অধিকারী তার-উত্তোলন বীর ঈশ্বরদাও একবার তাঁর খেলা আরম্ভ করবার আগে হঠাৎ রিং থেকে বেরিয়ে এলেন। রেফারী বললেন, যাও কোথায়, এক মিনিট দেরী হলে তোমার নাম কেটে দেব।

ঈশ্বরদাও সেকথায় কর্ণপাত করলেন না। ছুটে গেলেন যেখানে বসেছিলেন তাঁর গুরু। গুরুকে প্রণাম না করে, তাঁর আশীর্বাদ না নিয়ে কি খেলা সুরু করা যায় ?

বেচারী দেখলেন তাঁর কাণ্ড! কিছু বললেন না। ঈশ্বরদাও ফিরে এলেন রিংএ। বিজয়ীর সম্মান লাভ করলেন।

আধ্যাত্মিক নেতারাও খেলাকে সামান্য চোখে দেখেন নি। মনে পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা : "সর্বপ্রথমে চাই শরীরের শক্তি। আমাদের যুবকদের সেই শক্তি অর্জন করতে হবে। ধর্ম আসবে পরে। আমার যুবক-বন্ধুদের প্রতি আমার উপদেশ, শক্ত হও, সমর্থ হও, শারীরিক ক্ষমতা অর্জন কর। গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলার মধ্যে দিয়েই তোমরা তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছোবে, শরীরের শক্তি থাকবে, আসবে পরমার্থের চেতনা।"

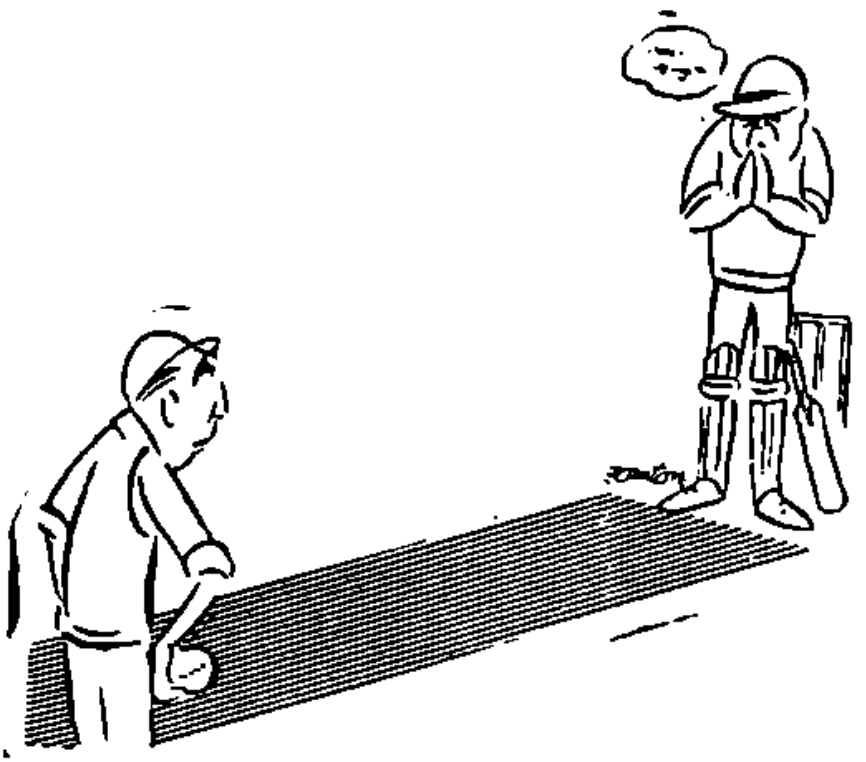

◀এই প্রথম▶

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবায়িত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেনা তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে দেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

মরীচিকা

ডাঃ কেশব বে

ছোট সংসার। দুটি প্রাণী সুবীর আর রীতা। ছিম-ছাম ঘর দোর। সহরের উপকণ্ঠে শিল্প নগরীতে ওদের বাস। বাড়ীর কাছেই কর্মস্থান। অমায়িক আচার-ব্যবহারের জন্য এই তরুণ-দম্পতি সকলেরই প্রিয়। উচ্চ শিক্ষিত সুবীরের মোটা মাইনে আর পদমর্যাদা তাকে স্ফীত-শির করেনি।

তাদের দেখে খুব সুখী আর আনন্দ-চঞ্চল মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা তা নয়। তাদের মনে সুখ নেই। বিশেষ ক'রে সুবীরের। সব কাজের ভেতর কেমন একটা হতাশা তার মনকে পীড়া দেয়, তার কর্ম-ক্ষমতাকে পঙ্গু করে। আজ পাঁচবছর বিবাহিত জীবনেও তাদের ঘরে কোন কমল-কলি বিকশিত হোলো না। কোন শিশুর হাসি নির্ঝরের আনন্দ-মুখর স্রোতধারায় তাদের মন স্নিগ্ধ হোলো না। এই অভাবের আঘাতটা রীতার চেয়ে অনেক বেশী সুবীরের। একটি শিশুর স্পর্শ লাভের জন্য সুবীরের আকাঙ্ক্ষা তীব্র।

সেই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ হয়ে গেল বলে সে রীতাকে দায়ী করে।

রীতারও জননী হবার সাধ আছে। তবে তার সন্তান লাভের আকুলতা সুবীরের মতো অতো তীব্র নয়। রীতা সুবীরকে অত্যন্ত ভালবাসে কিন্তু সুবীরকে সুখী ক'রতে না পেরে সদাই সঙ্কুচিত, নিজেকে সে অপরাধিনী ভাবে। মাঝে মাঝে সে সুবীরকে বলে, "চল না দুজনে কোন স্পেশালিষ্ট ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজেদের পরীক্ষা করাই? জেনে আসি কারণটা কি? এর জন্যে দায়ী কে? তুমি না আমি?"

"কি বললে? দায়ী আমিও হোতে পারি? কখনই না। জানো আমরা দশজন ভাই-বোন? আর আমার ভাইয়ের আর বোনের প্রত্যেকের চার-পাঁচটা ক'রে ছেলেমেয়ে? দুর্ভাগ্য আমার, পাঁচ বছর বিয়ে করার পরও এই তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি নিঃসন্তান। আমার বিশ্বাস যে তুমিই বন্ধ্যা। আমার মনে হয়, তুমি তোমার মা-বাপের একমাত্র সন্তান, আর সেই জন্য-ইতিহাসই তোমাকে আরও এক-পা এগিয়ে নিয়ে গেছে।"

সুবীরের এই অবৈজ্ঞানিক ও নিষ্করুণ মন্তব্যে রীতা মনে ভীষণ আঘাত পেল। সমস্ত দিন অজস্রধারে বুক ভাসালো কিন্তু কিছুতেই সুবীরের প্রতি বিরূপ হোতে পারলো না। কারণ সে জানে একটি শিশু লাভের জন্যে সুবীরের কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা। যদিও তাগা মাদুলী ও ব্রত-উপবাসের প্রতি সুবীরের কোন দিনই বিশ্বাস নেই, তবুও সুবীর এগুলো মাঝে মাঝে আনে—আর আনে রীতার জন্যে। সুবীরের মনে একটা গুপ্ত ধারণা 'কি জানি, হয়তো ফল ক'রতেও পারে'। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই বিফল হয়। সুবীর মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়, রীতাকে বলে, "তোমার যে কিছুতেই বিশ্বাস নেই"।

সত্যিই এ সবে রীতার বিশ্বাস নেই। কিন্তু সুবীরকে সে বাধা দিতে চায় না তাই বলে, "বারে, বিশ্বাস থাকবে না কেন, এই দেখো সব পরে আছি"। সে তার হাত ভর্তি অসংখ্য তাগা-মাদুলী দেখায়।

সুবীর ম্লান মুখে চুপ কোরে যায়।···রীতা লক্ষ্য করেছে বাড়ীর সামনে পার্কে কচি কচি ছেলেমেয়েরা যখন খেলা করে, জানলা দিয়ে সুবীর উন্মুখ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তার চোখ থেকে ঝরে পড়ে স্নেহ-বাৎসল্যের ধারা। কিন্তু পরে সে গভীর দীর্ঘশ্বাসে বাথাতুর হৃদয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে—একটি ফুটফুটে শিশু দেখে সুবীর থমকে দাঁড়িয়ে যায়। রীতা দিনের পর দিন নীরবে লক্ষ্য করেছে সুবীরের বেদনা-কাতর মুখ। এজন্যে রীতার মন হাহাকার করে ওঠে, কিন্তু সে যে নিরুপায়।

রীতার এখন একমাত্র চিন্তা সুবীরকে কেমন ক'রে সুখী করবে, তার হতাশ শুকনো মুখে কি ক'রে হাসি ফোটাবে। রীতা আপনাকে পরীক্ষা করাতে এক বিশেষজ্ঞ-ডাক্তারের কাছে গেল। কিন্তু পরীক্ষার ফল শোনবার আগে তার বুক কাঁপতে লাগলো। না-জানি সে কি শুনবে! হয়তো শুনবে এর জন্য সেই দায়ী। এ-অভিঘাত, এই শাস্তি সে কেমন ক'রে সইবে!

কিন্তু ডাক্তার উৎফুল্ল হোয়েই তাকে জানালেন, "না, আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই, যে-কোন দিনই আপনি মা হোতে পারেন—আর প্রসবের সময়েও কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।"

রীতা সুবীরকে না জানিয়েই নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছিলো, এবং সে যে বন্ধ্যা নয় তা জেনে একটা অসীম তৃপ্তি বোধ করেছিলো, কিন্তু এ-কথা তো সুবীরকে জানানো যায় না। তাতে যে তার পুরুষের গর্ব খর্ব হবে আর মনে সে অসহ্য ব্যথা পাবে। সুবীরের প্রতি রীতার অসীম প্রেম তাকে সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে বাধা দিলো।

রীতার মনে শান্তি নেই। পল্লী-মহিলাদের মিলনক্ষেত্র রূপে একটি "মহিলা-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। রীতা এখানে প্রায়ই আসে। এখানে মহিলাদের গৃহস্থালী থেকে আরম্ভ করে রাজনীতি, সমাজনীতি সব আলোচনা হয়। বিশেষ ক'রে মেয়েদের অনেক গোপন কথা পরস্পর খোলা-খুলি ভাবেই আলোচনা হয়। কথা প্রসঙ্গে সে শুনল যে কোলকাতায় আমেরিকা থেকে এক ডাক্তার এসেছে। ডাক্তার ঠিক নয় ওখানকার একজন গায়নোকোলজিস্টের ক্লিনিক্যাল এসিষ্টাণ্ট। তাকে একজন হাতুড়ে বল্লেই বলা যায়। এই ডাক্তার কিন্তু কৃত্রিম-জননে খুব ওস্তাদ। পুরুষ-বীর্য সে সংরক্ষণ করে এবং কৃত্রিম উপায়ে নারী-গর্ভে সঞ্চারিত করে। সন্তানহীনা নারীকে গর্ভবতী করায় অদ্যাবধি সাফল্য অর্জন ক'রেছে সে।

রীতা আগ্রহ সহকারে এই খবর শুনল এবং কৌশলে চিকিৎসকের ঠিকানা জেনে নিল।

• • • •

কৃত্রিম উপায়ে শিশু লাভ করে সুধীরকে উপহার দিয়ে, সুধীরের মুখে হাসি ফোটাতে, তার মনে স্ফূর্তি আনবার জন্যে, রীতা খুব উৎসাহ বোধ করল। সে মনে মনে এত উদ্দীপ্ত হোয়েছিল যে সে আর বেশীক্ষণ মহিলা সমিতিতে থাকতে পারলো না—তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো।.....কিন্তু পথে চ'লতে চ'লতে স্বামীর অজ্ঞাতে এতবড় দায়িত্ব নিতে কেমন দ্বিধা, কেমন একটা লজ্জা অনুভব ক'রলো। বাড়ীতে যখন পৌঁছলো—তার প্রবল উৎসাহের বেশীর ভাগটাই উবে গেছে।

বাড়ীতে ফিরে এসে রীতা দেখলে সুধীর আজ আগেই ফিরেছে এবং গুম্ হোয়ে বসে আছে। সে ভাবলে তার অদর্শনে বুঝি বা সুধীরের রাগ হোয়েছে। সে সুধীরের কাছে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে তার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বললে, "কি? রাগ হোয়েছে—বাড়ী ছিলুম না ব'লে? তা কি ক'রে জানবো বলো যে তুমি এতো শীগগির ফিরবে?"

সুধীর গম্ভীর ভাবেই রীতার বুক থেকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বিরস কণ্ঠে বললে, "না রাগ আর কি? ভালো লাগছিল না তাই চ'লে এলুম।" কথা বলতে বলতেই পকেট থেকে একটা খাম খাম খোলে বিনা মন্তব্যে রীতার দিকে এগিয়ে দিলো। রীতা খামের ভেতর থেকে একটা ছাপা চিঠি বার করে দেখলে যে সেটা সুধীরের পরের ভাই তার ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। তাতে সুগঠিত একটি ছেলের ছবি। রীতা উল্লসিত হোয়ে বললে, "বাঃ কি সুন্দর মিষ্টি ছবি? এতো দেখছি, পরশু দিন মুখে ভাত। চলো একটা খুব ভালো উপহার কিনে আনি।" সুধীর গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, "না, তার কোন দরকার নেই।"

"তার মানে? যাবে না নেমন্তন্নে?"

"না, কোন মুখে যাবো? অমঙ্গলের চোঁয়া, তাদের এই শুভ দিনে আর দিতে চাইনা। আমার অভিশপ্ত জীবন আমার একারই থাক।" কথার শেষে রীতার দিকে লক্ষ্যমাত্র না করে দ্রুতবেগে চলে গেল সুধীর।

সুধীরের কঠিন আচরণ ও নিষ্করুণ বাক্যবাণ রীতাকে ভীষণ আঘাত করলো। যে কথা, যে পরিকল্পনা সে একটু আগে প্রায় ভুলেই গিছলো—তা আবার নতুন ক'রে, স্পষ্ট ক'রে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সে প্রতিজ্ঞা করলো, যে কোনো মূল্যে তার এই নারীত্বের অপমানের অবসান করবে, সে স্থিরনিশ্চয়, সে মরীয়া।

পরের দিন সুধীর কাজে যাবার কিছুক্ষণ পরেই রীতা তার জমানো টাকা থেকে হাজার খানেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এবং কিছুক্ষণ পরেই কোলকাতার কৃত্রিম প্রজনন বিশারদের কাছে উপস্থিত হোল।

রীতা তাকে নিজের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করার পর, বিশারদ প্রথমে ঘাগু ব্যবসাদারের মত সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো যে, সে এ-কাজে ব্রতী। তারপর রীতার অকপট অনুরোধে বুঝল যে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন মোটা টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে রীতার গর্ভে পুরুষ-বীর্য সঞ্চারিত ক'রলো।

ঝোঁকের মাথায় এ-কাজের পরেই, রীতা কেমন যেন অশুচি মনে করতে লাগলো। একটা অবসাদ তাকে ঘিরে ধরলো।

রীতার বাড়ী ফেরবার পরেই সুধীর ফিরলো। রীতার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহারের জন্য সুধীর খুবই

অনুতপ্ত হোয়েছিলো। তাই সে বাড়ি ফিরে রীতাকে আদরে আদরে অস্থির ক'রে তুললো। রীতার ভারাক্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত, অশান্ত মন আবার আনন্দের স্বাদ পেলো।

দিন যায়……।

একদিন সকালে রীতা সুবীরকে বললে, "এই শুনছো?

"কি হয় নি?"

"আহা। কিছু বোঝ না?… …যাও আমি জানি না।"

সুবীর খুব হাল্কা ভাবেই বললে, "তোমার মাঝে মাঝে ও-রকম তো হয়। ও কিছু নয়।"

সুবীর কোন গুরুত্ব দিলো না—সে বিশ্বাসই করতে পারলে না কথাটা।

এমনি ক'রে দ্বিতীয় মাসও কাটলো। এবার সুবীরের মনে যেন ক্ষীণ আশা জাগলো।… একদিন সুবীর নিজে থেকেই প্রস্তাব করলে, "চলো না, ডাক্তারের কাছে যাই—পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক, জানা যাক্ সঠিক ব্যাপারটা কি?"

পরীক্ষার শেষে ডাক্তার জানালেন—রীতা মা হোতে চ'লেছে। শুনে সুবীরের আনন্দ দেখে কে? আনন্দের আতিশয্যে সে অফিসই কামাই করল। রীতা তো এমনিই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, এখন থেকে সুবীর তাকে রাণীর মর্য্যাদায় ভূষিত করল।

এমনি ক'রে দিন গড়িয়ে চলে। সে-দিন সকালে যখন রীতার ঘুম ভাঙলো তখন সুবীর ঘুমোচ্ছে। বিছানা থেকে উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব'সে এলোমেলো চুল কিছু পরিপাটী করছিলো। সুবীরের ঘুম ভাঙলো। সামনে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে চোখ পড়তেই দেখলে রীতা চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে।

……সুবীর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে—রীতাকে জড়িয়ে ধরে একটু শূন্যে তুলে একপাক ঘুরে মনের আনন্দে গেয়ে উঠল,—"তুমি যে আমার করেছো রাজা।"

"আঃ, ছাড়ো, পড়ে যাবো। কি যে করো? কিছু জান না, রাজা নয়, রাজা নয়, সম্রাট।"

"তাহোলে তো আরও ভালো।"

এই বলে সুবীর রীতাকে আরও এক পাক ঘুরিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে খাটের ওপর বসিয়ে দিলো।

"সকাল বেলায় কি মস্তিপনা আরম্ভ ক'রলে", বলতে বলতে রীতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সময় মতোই রীতা জননীর মর্য্যাদা লাভ ক'রলো। সুবীর আনন্দ-বিহ্বল, মনে মনে সে এখন গর্বিত, সে এখন পিতা।…অনেক দিন পরে অনেক আশার, তাদের একমাত্র ছেলেকে তারা চোখের আড়াল ক'রতে চায় না। রীতা এখন মহিলা সমিতিতে যাবার সময় পায় না। সুবীরের তো কথাই নাই। নেহাৎ অফিসে না গেলে নয় তাই যায়।

সুবীর আর রীতার তর্কের মীমাংসা কিছুতেই হয় না—বুবুল কার মতো দেখতে হোয়েছে? রীতার মতো না সুবীরের মতো।…তাদের অসুখী-ঘর এখন আনন্দে ভরপুর।

বুবুল এখন বেশ বড়ো হয়েছে।

গীতা, বুবুলকে তাদের দুজনের সন্তান হিসাবেই মানুষ করে আদর যত্ন করে। বুবুল যে সুধীরের সন্তান নয় সে-কথা একবারও তার মনে হয় না। বুবুলের জন্ম-ইতিহাস সে মনে প্রাণে একেবারেই ভুলে গেছে।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ সুধীর তলপেটে যন্ত্রণা অনুভব করলো। অল্প-সময় হোলে সুধীর গ্রাহ্যই ক'রতো না। কিন্তু এখন সে তার নিজের ও গীতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক, এখন যে তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত বুবুল। বুবুল যতো দিন না বড় হোচ্ছে, ততদিন তাদের অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হোতে হবে। গীতাকে কিছু না ব'লেই, সে ডাক্তার-বন্ধুর কাছে গেল। ডাক্তার সুধীরের অবস্থিতির কথা শুনে তার দেহের প্রতিটি অংশের এবং মল-মূত্র প্রভৃতির পরীক্ষা ক'রতে চাইলো। সুধীর তার উপদেশ সাগ্রহে গ্রহণ ক'রলো। ক'দিন পর সুধীর ডাক্তারের কাছে গেল এবং তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল জানতে চাইলো। সুধীরের ঘরে একটি সন্তান জন্ম-লাভ ক'রেছে সে-কথা ডাক্তার জানতো না। সুধীরের প্রশ্নে ডাক্তার বললে, "না, তোমার অসুখের তো কোন অস্তিত্ব পেলাম না। তবে একটা জিনিস আশ্চর্য্য হোল যে, যদি তোমার সন্তান লাভের ইচ্ছা থাকে তো একটা ছোট্ট অপারেশন দরকার—নইলে তুমি চিরদিনই নিঃসন্তান থাকবে।"

ডাক্তারের কথা শুনে সুধীর হো হো করে হেসে উঠলো। তারপরে ডাক্তারকে বললে "কি বললে, আমি সন্তানহীন? তুমি দেখছি ডাক্তার সাক্ষাৎ বরফানী।" সুধীর কথার শেষে আবার হেসে উঠলো।

ডাক্তার সুধীরের হাসি লক্ষ্য করে বললে, "ঠাট্টাই ক'রো আর যাই ক'রো- আমি যা বলবার তা বলাম।"

"জানো, আমার ছেলের বয়েস দেড় বছর।"

"রাখো তোমার চালাকী। আমি বিশ্বাস করি না।"

"সত্যি ব'লছি আমার ছেলের বয়েস দেড় বছর।"

"সত্যি ব'লছো তোমার ছেলে হোয়েছে? কিন্তু আমার ..." ডাক্তার কি যেন ভেবে থেমে গেল এবং বেশ গম্ভীর হোয়েই ব'সে রইলো।

সুধীর ডাক্তারের এই হঠাৎ গম্ভীর লক্ষ্য করে ব'ললে, "বেশ তোমার পরীক্ষা যে ভুল তার প্রমাণ করবার জন্যে অন্য ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাবো। আমি যে সন্তান নই, সে রিপোর্ট দেখালে তখন তো বিশ্বাস হবে?"

সুধীরের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই ডাক্তার চিন্তাকুল হ'য়ে ব'সে রইলো।

সুধীর সেখান থেকে বেরিয়ে তার মোটরখানিকে দ্রুতগতিতে তার পরিচিত চিকিৎসকের ক্লিনিক-এ গেল।

সুধীর ডাক্তারকে বললে—এখুনি সে নিজেকে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করাতে চায় এবং এখনি তার রিপোর্ট চাই।

ডাক্তার ব'ললে—"কেন, এতো তাড়া কিসের?"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং তার জন্যে আরজেন্ট চার্জ দিতেও আমি রাজী।"

"কিন্তু তাহ'লে পাঁচটা পর্যন্ত দেরী করতে হবে?"

"বেশ আমি পাঁচটা পর্যন্তই সবুর করতে রাজী"।

ডাক্তার সুবীরের রক্ত, মূত্র, প্রস্রাব প্রভৃতি এবং এক্স-রে ফটো নিলো এবং সুবীরের দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করল।

রিপোর্ট নেবার জন্য সুবীর বসবার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলো।···সুবীর যে বন্ধ্যা নয়, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, শুধু ডাক্তার-বন্ধুর সিদ্ধান্ত যে ভুল তা প্রমাণ করবার জন্যেই তার এই ভিড়।

ডাক্তারের বসবার ঘরে সংগৃহীত সাময়িক পত্রিকায় মনোনিবেশ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে সে পড়তে লাগলো। একটা বেশ মজার গল্পে ডুবে গিয়েছিলো। সময় যে কখন কেটে গেছে তার খেয়াল নেই। ভৃত্য এসে তাকে ডাক্তারের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

সুবীর ঘরে ঢুকে ডাক্তারের সামনে বসলো। ডাক্তার বললেন—"শরীর তো বেশ ভালই, কোন দোষই পাওয়া যাইনি।···তবে একটা গোলমাল দেখলুম।" একটু থেমে বললেন—"সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা নেই।"

সুবীরের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠলো। সে আর্ত-কণ্ঠে ব'লে উঠলো—"ডাক্তারবাবু, আমার সন্তানের ক্ষমতা নেই, সে-বিষয়ে কি আপনি নিভুল?"

"হ্যাঁ, আমি অভ্রান্ত।"···ডাক্তার হাত বাড়িয়ে রিপোর্টটা দিলেন।

সুবীরের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রতে লাগলো। তার চোখের সামনে থেকে বিশ্ব-সংসার যেন বিলুপ্ত হল। পকেট থেকে খানকয়েক দশটাকার নোট ডাক্তারের টেবিলের ওপর রেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সুবীরের চোখের সামনে দিগন্ত জোড়া অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দুটি অতি প্রিয় মুখ ভেসে উঠলো, বুবুলের আর গীতার।·····

তার মনের মধ্যে তখন একটাই চিন্তা, একটাই প্রশ্ন—"গীতা অবিশ্বাসিনী, গীতা ভ্রষ্টা? আর তার বুবুল জারজ!" ···এই ভাবনা তার জীবনকে বিষময় করে তুললো,—জীবনের প্রতি তার সব মমতা হারিয়ে গেল।

তখন সন্ধ্যা। পার্ক-স্ট্রীটে যান-বাহনের অত্যন্ত ভীড়। অন্যমনস্ক সুবীর ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে মোটরবাইকে চৌরঙ্গীর দিকে তীব্রগতিতে ছুটে চললো।···তার মন জুড়ে হাহাকার, "গীতা বিচারিণী—বুবুল জারজ!"···চৌরাস্তার সামনে একটা মাল-বোঝাই ট্রাক উল্কার মতো ছুটে আসছে।···সুবীরের হুঁস নেই ·····নক্ষত্র বেগে তার বাইক ছুটে চলেছে সেই ট্রাকের দিকে·····

পথের লোকজন চীৎকার করে উঠল—সামাল, সামাল।

কিন্তু সুবীরের কানে সে চীৎকার পৌঁছোলো না·····

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমিত্রার অবিবাহিত জীবনের সব ঘটনা জানা পরীক্ষিতের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন স্বামীর পক্ষেই তা সম্ভব হয়না। কিন্তু যতটুকু জানতে পেরেছে, তার মধ্যে কতটুকু বানিয়ে বলেছে, কতটুকু সে গোপন করে গেছে, সত্যসুন্দরের চিঠি পাওয়ার পরে তা যেন কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

কিন্তু বহুদিন পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার উগ্র ধারণাগুলোও যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত, পরিসংস্কৃত ও পরিশোধিত হয়ে গিয়েছে।

বহুদূরের ঘটনা বহুদূরের যাত্রীর কোলাহলের মত একটি প্রৌঢ় মানুষের কানে এসে পড়ল।

শৈবাল সেন খুব সহজভাবেই দোতালায় উঠে গেল আর অমরেশের বাড়ীর অমন জমাট আড্ডাটি হঠাৎ চমকে উঠে চুপ করে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। আড্ডাটাই যেন সহা ভাবনায় পড়ে গেল।

শৈবাল সেনের মত মেয়েদের দেখে সে কখন হাংলাপনা করেছে বলে তার মনে পড়ে না। শৈবাল যেমন মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে এমন সচরাচর দেখা যায় না। এ-সব জেনেশুনেও মেয়েরা কিন্তু বেশ অনায়াসেই ওর ঘরে গিয়ে পড়ে। আই. সি. এস. ছেলে, বড় চাকরিতে ঢুকেছে,—কাজেই ওদের চোখে শৈবালের একটা মান আছে সন্দেহ নেই কিন্তু ও যে এত কাণ্ড করে প্রথমে স্ত্রীকে সম্প্রতি ডাইভোর্স করেছে সে খবরও তো ওদের কানে গিয়েছে! মেয়েদের আক্রমণাত্মক উস্কানি না পেলে সাধারণতঃ ছেলেরা এত সাহস পায় না। এই সাহসের গোড়ার কথা ভেবে আজকের এই সাহিত্য আসরটি তাজ্জব বনে গেল। পরীক্ষিতও ওদের এই মনের কথাটি আন্দাজ করতে পেরেছিল।

চাকরির বাজারে শৈবাল সেন টেক্কা দিয়েছে সবার ওপরে সত্যি কিন্তু পরীক্ষিতও নেহাৎ কম যায় না,—সেও সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টে বেশ বড় চাকরিতেই ঢুকেছে। সুপুরুষ চেহারা পরীক্ষিতের—যেমন লম্বা তেমন সুন্দর। চেহারার দিক থেকে শৈবাল সেন পরীক্ষিতের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনা। তাছাড়া একটি বিষয়ে পরীক্ষিতের একটা আলাদা দাম আছে। সাহিত্য নিয়ে ও অনেকদিন থেকে নাড়াচাড়া করছে,—ছাই-ভস্ম যাই লিখুক সে, সাহিত্য-সমাজের জ্ঞানী-গুণীরা মনে করেন ওর লেখার মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি আছে। সাহিত্যের দিকে যে মানুষের এত ঝোঁক আছে, তা এ-বাড়ীতে আসার আগে পরীক্ষিতের ধারণা ছিল না,—এখানে এসে দেখল, তার অনুরক্ত ভক্তের অভাব নেই। অনুরক্ত ভক্তের প্রতি লেখকমাত্রেরই লোভের দুর্বলতা আছে আর তারই সুযোগ নিয়ে ওরা সকলে ওকে টেনে এনেছে এখানে। পরীক্ষিৎ নিজে ইচ্ছে করে আসেনি। পরীক্ষিতের সবল ও নিরাপদ স্বাতন্ত্র্যের স্বভাব দেখেই ওরা ওকে এখানে আনতে ভরসা পেয়েছিল। নইলে তখনকার এই আসরটির গোলমেলে অবস্থার মধ্যে ওর মত লোভনীয় চেহারার মানুষটিকে এনে ঢোকাত না।

অনেকদিন থেকে আসা-যাওয়া করছে বলে এ-আড্ডার অনেকেই এ-বাড়ীর লোক হয়ে গেছে। এ-বাড়ীর দুটি মেয়েকে ফ্রক পরা অবস্থা থেকে দেখে আসছে তারা। এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরে তারা অনুঢ়া, তন্বী ও সুন্দরী হয়ে উঠেছে। যারা দূরে আবছা হয়ে ছিল তারা হঠাৎ বড় স্পষ্ট হয়ে গেল। কেবল স্পষ্ট নয়, ওদের বয়সের কোথায় যেন অনিরাপদের রঙ ধরতে শুরু করেছে। এখন দেখেশুনে, বেশ ভেবে-চিন্তে একটা নতুন বন্ধুকে এ-বাড়ীতে আনতে হবে। ওরা আত্মীয় নয় অথচ ঘরের ছেলে হয়ে গেছে কাজেই

বাইরের মানুষকে এখানে আনতে হলে এখন তাদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। যত দায়িত্বই তাদের থাকুক তারা কিন্তু নীচের তলার এই ঘরটির সীমানা ছাড়িয়ে কখন দোতলার সিঁড়িতে পা বাড়ায়নি। সুমিত্রার বি. এ. পাশের পরে শৈবালের যে বাড়াবাড়িটা ওদের চোখে পড়েছে তা যে খুব বেশী অস্বাভাবিক তা পরীক্ষিৎ অন্ততঃ মনে করেনা। ও শিকার করতে বেরিয়েছে, খোঁজ পেয়েছে এ বাড়ীতে আর এ-বিষয়ে অমরেশ ও তার বাপমায়ের নীরব উৎসাহেরও সায় ছিল। যে অদৃশ্য ছায়া এই সব অনূঢ়া কন্যাদের পেছনে ক্রমাগত অনুসরণ করতে থাকে এবং অলক্ষিতে তাদেরকে নির্বাক নির্দেশ দেয়, যে তার নির্বাচনের প্রার্থীকে একমুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাওয়ার সুযোগ বা সুবিধে দেয় না, তাকে এই আড্ডার মানুষগুলো দেখতে পায়নি। ওরা অনেক কিছুই দেখতে পায়নি। বি. এ পরীক্ষার নম্বর জানার ব্যাপারে শৈবালের মেহনতকে ওরা দাম দেয়নি। অফিস যাওয়ার মুখে শৈবাল সুমিত্রাকে নিজের গাড়ীতে লিফট্ দিয়ে পরীক্ষার হলে বসিয়ে দিয়ে গেছে প্রত্যেকদিন। ইনটারভেলে সাহস দিয়ে এসেছে পরীক্ষার্থিনীকে। ওর পেছনে কয়েকটা বখাটে ছেলে লেগেছিল, ওকে অস্থির করে নাস্তানাবুদ করে করে তুলেছিল। এই বিরক্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিল এই শৈবাল সেনই—ও সুমিত্রার জন্যে কম খাটেনি। কেবল কি তাই? শৈবাল নিজের বোন প্রতিভাকে এনে ভিড়িয়ে দিয়েছিল অমরেশের কাছে। এবং অন্ততঃ সেইজন্যেই ওর চোখের মধ্যে যদি বিনিময়ের আবেদন ফুটে ওঠে এবং তা যদি অন্ততঃ অমরেশ সমর্থনযোগ্য মনে করে, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই।

পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের অমরেশের দহনাঠী শৈবাল, পরীক্ষিৎ ও সুধীনের মধ্যে বেশ একটু মাখামাখি মেলা-মেশা ছিল। এখানে এসে শৈবাল ও সুধীনের মধ্যে একটি নীরব রেষারেষির সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলছে। সেদিনের এই মজলিস গোষ্ঠির মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল কোটিপতি মাড়োয়ারীর ছেলে সুধীন। কেবল আশ্চর্য নয়, ও যেন রীতিমত চড়কে গেল। ওর দশ আঙুলের আংটীগুলোর জমকালো জৌলুস যেন অকস্মাৎ মিয়িয়ে পড়ল। এ-বাড়ীর আড্ডার মানুষগুলোর রেওয়াজ মত দেও মেয়েদেরকে তোয়াজ করবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওর অতিরিক্ত পুষ্ট নধর দেহের জন্যেই হোক কিংবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক। সে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। সেই জন্যে শেষ পর্যন্ত কেবল সুধীনই নয়, ওদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে পরীক্ষিতকে শৈবালের প্রতিদ্বন্দ্বী করে দাঁড় করিয়েছিল। ইশারা ইঙ্গিতে জানাতেও কসুর করেনি তারা। কিন্তু ওর উদ্ধত কৈবল্য ও অহঙ্কারী উদাসীনতা দেখে ওদের মনে হয়েছিল অন্ততঃ মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষের এভাব পৌরুষের বস্তুও নয় কিংবা পৌরুষের কাজও নয়। উদার হও, কিন্তু বোকা হয়ো না; চরিত্রবান হতে চাও—হও, কিন্তু ভণ্ড দেখিও না; প্রিন্সিপল্ দেখাতে চাও,—তা মন্দ নয়, ওরও একটা চাকচিক্য আছে কিন্তু ওটাকেও মাঝে মাঝে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে হয়,—ওতে ভয়ের কোন কারণ যাদের প্রিন্সিপল্ আছে তারা সকলেই এ-রকম করে থাকেন।

ওপরতলা থেকে শৈবাল আর সুমিত্রা নেমে এল অনেকক্ষণ পরে। চলেই যাচ্ছিল বাইরে হঠাৎ কি মনে করে ঘরে এসে ঢুকল তারা।

ঝকঝকে সোনার থালায় তাজা লাল গোলাপের মত বিকেলের আকাশ। আর এই আশ্চর্য বিকেলের সুন্দর মেয়েলি আকাশ হঠাৎ যেন খণ্ডিত হয়ে ছুটে এসে ওদেরই ঘরে ঘুরলো। সুখের যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে আজ সুমিত্রার সাজ গোজ অভিনব বিশেষত্বে অপূর্ব। এত সুন্দর লাগছে ওকে যে ওর পাশে যে শৈবাল দাঁড়িয়ে আছে তা যেন কারো চোখেই পড়ছে না।

শৈবালের কথা শুনে ওরা প্রথম ওকে দেখতে পেল।

"সুমিত্রাকে নিয়ে মেট্রোতে একটা ছবি দেখতে যাচ্ছিল।"

কি একটা বই থেকে কি যেন এতক্ষণ পড়ে শোনাচ্ছিল

পরীক্ষিৎ। আস্তে আস্তে তা বন্ধ করে পাশে রেখে দিল সে।

জিজ্ঞাসা করল,—

"কি বই ?"

"হেনরেটাস—সিনেমাটা দেখব দুজনে অত বড় বইটা পড়ে ফেলেছি।"

বইখানি রুচিসম্পন্ন নয় মোটেই, তবু এ-বই পড়েনি এমন একটি যুবকও এ-আড্ডাতে আছে কিনা সন্দেহ। ট্র্যাশ বই শুনেও আগাগোড়া পড়ে ফেলেছে অনেকেই এবং পড়ার পরে ট্র্যাশ বই বলে বিরক্তিও প্রকাশ করেছে সকলেই।

প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না সুধীন,—

"এখ সঙ্গে—."

মাথার ওপরে দুহাতে দরজার পাল্লাটা ধরে সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল। পাল্লাটা নড়ছে হাতের চাপে আর অল্প অল্প নড়ছে ওর লাল সিল্কের শাড়ীখানার সামনের কুঁচি। এবার যেন হঠাৎ একটু জোরেই সুমিত্রার শরীরটা নড়ে উঠল, হাতদুখানি নামিয়ে আনল সে, ক-ছুটো কুঁচকে গেল একটু। আর তখনই যেন সন্ধ্যা এসে গেল ঘরে—ঝাপ্‌সা হয়ে ম্লান হয়ে গেল অপরাহ্নের উজ্জ্বল রং।

"আপত্তি কি ?"—সুমিত্রার কথা শোনা গেল।

কেমন একরকম চিক্ চিক্ শব্দ করে সুধীন ঘাড় কাৎ করে জিব কেটে বলল,—

"আপত্তি কেন হবে ? বরং বোঝার সুবিধে হয়। শৈবাল বোঝাতে পারে ভাল।" সুমিত্রার মুখ সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল হঠাৎ। হাত তুলে রিষ্টওয়াচ দেখে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল,—

"আর দেরী করবেন না—খুব কিন্তু সময় নেই আর —ছটায় আরম্ভ।" পরীক্ষিৎ লক্ষ্য করল সুধীনের এই বক্তব্য শৈবাল যেন মনে মনে উপভোগ করেছে।

শৈবালও হাতের ঘড়ি দেখে বলল,—

"না! আর দেরী করবো না—পুরোটাই ওকে দেখাতে হবে। সুমিত্রার ইচ্ছেই সবচেয়ে বেশী—।"

ওর কথা শুনে সুমিত্রা যেন অবাক হয়ে গেল।

"আমার—?"

একটু থেমে শৈবালের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল,—

"হ্যাঁ আমার।"

ওর চলে যাওয়ার পর সুধীন আবার বক বক করে উঠল,—

"ম্যাজিক দেখাবে বলে ডেকে এনেছে অমরেশ। কোথায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে সে ?"

ওর কথা বলার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলল পরীক্ষিৎ।

"আমি এবার উঠব। ম্যাজিক দেখবার শখ নেই আমার!" সুধীনের গোঁ বেড়ে গেল।

"আমি না দেখে উঠব না—মানে,—অমরেশকে বুঝিয়ে ছাড়বো যে মেয়মহল করে ডেকে এনে নিজে অনুপস্থিত থেকে আড়ালে আবডালে ফূর্তি করা অন্যায়।"

"আড়ালে আবডালে ফূর্তি করছে না কি ?"

"ঠিকই করছে—ও-বিষয়ে আমার দিব্য দৃষ্টি আছে—বুঝতে পারি সবই—।"

উঠে পড়ল পরীক্ষিৎ। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বলল,—

"এই ম্যাজিকই বোধহয় দেখাচ্ছে তোমাকে। একেবারে বঞ্চিত করেনি সে। জানে তো এ-বিষয়ে তোমার দিব্য দৃষ্টি রয়েছে! এখানে বসেই তো বুঝতে পারছো সব।"

পেছন থেকে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ হল,—ভদ্রলোকের একটি পরিচিত বাদ্য ধ্বনি। কিন্তু পরীক্ষিৎ আর সেদিকে ফিরে তাকানোর অবসর পেল না। সামনের প্যাসেজ থেকে মোটা গলায় কে যেন ডেকে উঠল পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করে।

"চলে যাচ্ছ—?"

এ-বাড়ীর সকলেই যাকে মেমসাহেব বলে তিনিই সিঁড়ির কাছে খুব দামী শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই পরীক্ষিৎকে ডাকছেন। সে তার দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও কিন্তু ওর মনে হল না যে মেমসাহেবটির রং কালো। প্রসাধনের ফলে

পেরেছেন, দূর থেকেছেন আর চুল কাঁপিয়েছেন যে এখন আর তার আসল চেহারা আর সত্যিকারের বয়েস আন্দাজ করা যায় না। কমিশনারের স্ত্রী বলে তিনি কখন তার প্রেসটিজকে ঢিলে হতে দেননি। বুরোক্রেটিক যুগে অফিসার মহলে ওঁর নাম-ডাক প্রতাপ-প্রতিপত্তি কিনতে হয়েছে রীতিমত টাকা পয়সা খরচ করে। তিনি মনে করেন এরই জন্যে তার বোকা আর আহাম্মক কার্ট্রাশ কার্ট আই. সি. এস স্বামীকে তিনি এত বড় পদে তুলে আনতে পেরেছেন। কমিশনার সাহেবের মত এমন ভুখোড়, ধাপী ও কড়া অফিসারকে যে মহিলা অবলীলাক্রমে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, যে মহিলার সামনে সাহেব কেঁচো হয়ে যান—কথা হোঁচট খেতে থাকে,—তিনি নেহাৎ সোজা মানুষ নন—তাকে একটু সমীহ করে চলতে হয় অনেকেরই।

"তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

পত্নীকিঙ্করকে নিয়ে তিনি দুইং-রুমে বসলেন।

সেনসাহেব বলতে লাগলেন,—

"একটা পার্টি আছে আমাদের—ফিরতে খুব বেশী দেরী হবে না—আটটা, বড়জোর সাড়ে আটটার মধ্যেই ফিরবো। সাধনা একা রয়েছে বাড়ীতে—মেয়েটাকে একা ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি থাকতে পারবে ততক্ষণ?"

"আমি তো গাড়ী আনিনি!—সিনেমা দেখানোরও সময় নেই আর। ঘরের মধ্যে পেঁচার মত বসে গল্প-গুজব করতে কি ভাল লাগে কারো?"

"ও! বুঝেছি। তোমার থাকার মতলব নেই! কাজ থাকলে অবিশ্যি আলাদা কথা!—কাজ নেই তেমন কিছু,—তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।"

"না। তেমন কোন কাজ নেই। আপনি ঠিকই বলেছেন।

"তবে—?"

"মানে—।"

"কি মানে? মানে কি আছে এতে? —ভয়—? —লজ্জা? —আমি লক্ষ্য করেছি তুমি বড্ড shy। মেয়েরা হাতী-ঘোড়া বা বাঘ-ভালুক নয় যে একলা কাছে থাকলে খেয়ে ফেলবে। Shake off all these orthodox foolishness!—বাড়ীতে কেউ থাকলে অবিশ্যি তোমাকে বলতাম না!"

"অমরেশ তো আছে! শৈবালের বোনও তো আছে বাড়ীতে কোথাও।"

"কে?—প্রতিভা?"

"প্রতিভা মেয়েটি খুব ভাল। ও একাই একশো—খুব জমিয়ে রাখতে পারে!"

"বাজে। একদম বাজে

"বাজে কেন?"

"এ-মেয়েটিকে আমি সহ্য করতে পারি না—বড্ড পুরুষ ঘেঁষা মেয়ে!"

"তাই নাকি? তা তো জানতাম না।"

"ও জুটেছে অমরেশের মাথা খাওয়ার জন্যে—এ-সব আমি চাইনা,—তুমি স্পষ্ট বলে দিও।"

"যদি বলতে বলেন—বলবো, কাজ হবে না তাতে,—আপনি বললেই ভাল হবে।"

"সাহেব তো চুঁচো ভদ্রলোক হয়ে বসে থাকে,—যা কিছু অপ্রিয় কথা, অপ্রিয় কাজ আমাকেই করতে হয়। বেশ!—আমি বলবো! গরজ যখন আমার, আমাকেই বলতে হবে বৈ কি!—সাধনাকে কার কাছে রেখে যাই বলতো?—এখন,—সম্প্রতি এই আমার সমস্যা!"

"সমস্যা?"

"নয়?—বিয়ে না হওয়া অবধি মেয়ে মাত্রই একটা সমস্যা—আমাদের মত ঘরেই হোক বা সাধারণ গেরস্থ ঘরেই হোক! যার তার সঙ্গে তো চলাফেরা ঘোরাফেরা করতে দিতে পারি না! বাজে লোকের হাতে পড়ে জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, মায়েদের তো তা দেখতে হবে? আজকালকার মেয়েরা যে কিসে ভোলে আমি তো বুঝতেই পারি না! ভবিষ্যৎ দেখবার মত বুদ্ধি-সুদ্ধিও নেই ওদের মাথায়—বয়েসটাই খারাপ। —বুঝলে?"

"সুধীন ও-ঘরে বসে আছে, গাড়ীও আছে ওর।

ও-তো অনায়াসেই ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারে সাধনাকে! ঘরে বসে করবে কি? একটু ঘুরে আসুক না ওর সঙ্গে!"

এই স্থূলাঙ্গী মহিলাটির মুখ সেই মুহূর্তে বিতৃষ্ণায় বীভৎস হয়ে উঠল। আর পরীক্ষিতও স্পষ্ট দেখতে পেল ভদ্রমহিলাটির বয়েস অনেককাল আগেই মধ্য বয়েস পার হয়ে গেছে। মহিলাটি যেন ভীষণ একটি কুৎসিত রোগ ঢেকে রাখবার জন্যে ঠোঁটে লাগিয়েছেন লিপষ্টিক, ভুরুতে দিয়েছেন ব্রাউইক, মুখে একপাদা চুণের পলেস্তারার মত স্নো-ক্রীম মেখেছেন। কিন্তু ক্রোধের সময় যুবতীর মত সুন্দর দেখায় না ওকে,—তখন বার্দ্ধক্যের হতাশ্বাস ও হাহাকার যেন ওর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

উঠে দাঁড়ালেন বেয়ারাহেব।

"তুমি কিছুই বুঝতে পারনা! তুমি একজন Young and educated man—power of understanding এত কম কেন তোমার! career ভাল হবে কি করে? কি করে উন্নতি করবে জীবনে?"

ওর চলে যাওয়ার পরেও ওর মূর্ত্তিটা যেন ওকে তাড়া করে এল। এবং বাড়ী ফিরে যাবার সমস্ত রাস্তা ধরে চেহারা মাঝে মাঝে উগ্র হয়ে ভীষণভাবে দাঁত খিঁচিয়ে উঠতে লাগল।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে থমকে গেল। বাবা ভাল আছেন তো? কেমন কেমন লাগছে যেন বাড়ীটা বাড়ীর কারো জন্যে ভাবেনি এতদিন, একটি মমতার সুখস্পর্শ উদ্বেলনার মোহে অন্ধ হয়েছিল। সন্ধ্যার ভয়া একটি ভাবনা আজ যেন থর থর কেঁপে উঠল। একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মত কোন কাজই সে বাড়ীর সম্বন্ধে করেনি এতদিন। দূর থেকে রোশনাইর দক্ষিণ দিকের একটি ঘরের দিকে লক্ষ্য করল সে—যে ঘরের একটি খাটে তার বাবা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন আজ প্রায় দশবারো দিন হল। সামান্য জ্বর বলে ভাবনা করেনি সে এতদিন, বিব্রত হল আজ এই মুহূর্তে—এই সামান্য জ্বরটাই ছাড়ছে না কেন এখনও? কোন্ ডাক্তার দেখছে তা সে জানে না, অন্য দ্বিতীয় কোন নামজাদা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে কিনা সে প্রশ্নও সে জিজ্ঞাসা করেনি। অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরে এসে এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হ'ত। যখন ও ফিরত তখন তার বাবা ঘুমিয়ে থাকতেন। চোখে কোনদিনই এই ঘুমন্ত মানুষটিকে খারাপ বলে মনে হয়নি তার। তার বাবা শুয়ে আছেন বটে কিন্তু তার চেহারাতে কোনদিন অসুস্থতার চিহ্ন সে দেখতে পায়নি। দেখেছে তিনি সবল ও সুস্থই আছেন—দুর্বল হননি মোটেই। সেইজন্যেই কি ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করতে সে কুণ্ঠিত হয়েছিল? ভাবেনি পরীক্ষিৎ, চোখে ভাল দেখাই সব নয়, কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই সব কাজ শেষ হয় না,—মানুষকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়,—জানতে হয়, জানাতে হয়।

উদ্বিগ্ন মনকে টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে যেতে লাগল সে।

পরীক্ষিতের যেন একটা নেশা কাটল,—কি নেশা তা সে জানে না,—আর কি ভাবে এবং কেন কাটল তা-ও সে বুঝতে পারেনি সেদিন। মনে হল সে যেন এতদিন পরে মুক্ত হল,—কে মুক্তি দিল, কি করে মুক্ত হল তা বোঝাতে পারেনা।

সমস্ত বাড়ীটাই অভিমানে থম থম করছে যেন।

সামান্য একটু অসুখে সে অধির হয়ে হৈ-চৈ করেনি—এই তার অপরাধ। দাদা-বৌদির ওপর নির্ভরতার বিশ্বাস ছিল বলে সে উতলা হয়নি। ওর প্রকৃতিটা বড় অদ্ভুত লাগল,—কেন সে বাবার অসুখে অধির হতে পারেনি,—কেন সে আর সকলের মত উতলা হয়ে ওঠেনি! রোগীর ঘরের বিষণ্ণতার মধ্যে তার কি পড়ে থাকতে ভাল লাগত না? হয়তো তাই। বাইরে বেরুলেই একটা সাময়িক নিশ্চিন্ততা তার মনকে চমৎকার ভুলিয়ে রাখত।

সেদিন ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করে সে প্রথম জানতে পারল তার বাবার কঠিন অসুখ হয়েছে—বাঁচবার কোন আশা নেই। কথাটা শুনে হঠাৎ পরীক্ষিৎ যেন অন্ধ হয়ে গেল, স্নায়ুশিরার সব এলোপাথারি ছুটোছুটি করে উঠল অকস্মাৎ, গায়ের উত্তাপ ঝাঁ করে বেড়ে গেল সে

মুহূর্তে। ঘরে অনেক লোক, খবর পেয়ে অনেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবও এসেছে। ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে বাবার মাকের কাছে অক্সিজেনের কানেল। সবচেয়ে ভয় হয় নিজের অপরাধকে—আসন্ন মৃত্যুর ভয়ের চেয়েও বেশী। সবচেয়ে দুঃখ হল, তাকে সকলের চোখে অপদস্ত করে হীন করবার প্রবৃত্তি দেখে। আস্তে আস্তে বিছানার পাশে গিয়ে সে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের ঘরের বিছানাতে পড়ে সকলের অলক্ষ্যে কাঁদতে লাগল। নীরব চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল। ও-ঘর থেকে বাবার শ্বাস-প্রশ্বাসের একটানা গভীর শব্দ এ-ঘরেও শোনা যেতে লাগল। সে শব্দ বাড়তে লাগত ক্রমশঃ পরীক্ষিতের স্নায়ু ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে যেতে লাগল।

সে রাত্রে পরীক্ষিৎ অগাধ অচৈতন্যের মত ঘুমে কাটিয়েছে। ভোরে উঠে শুনল মধ্য রাতেই বাবা মারা গেছেন।

পরীক্ষিতের বাবা বড় এটর্নি ছিলেন। দুটি উপযুক্ত পুত্র, একটি পুত্র-বধূ ও একটি মাত্র নাতি রেখে মারা গেছেন। একটি প্রকাণ্ড বড় বাড়ী এবং প্রচুর অর্থও রেখে গেছেন তিনি। কাজেই তার পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্যে পুত্রদের সামর্থ্য পরীক্ষিত চওয়ার প্রয়োজন হল না।

কিছুদিন কেটে গেল। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে পরীক্ষিৎ প্রায়ই নিজের ঘরে একলা বসে থাকে। অনেক লোক এসেছে ওর বাবার মৃত্যুর পরে, সকলেই দেখা করে গেছে ওর দাদার সঙ্গে। পরীক্ষিতকে কেউ খোঁজ করেনি। ওর দুঃখটা খুব জোরালো বোধ করছে না বোধহয় কেউ। সকলেই জানে বিকেলটা ওর কোথায় কাটে আর কেন কাটে। ভেবেছে অনেকেই—

—আত্মীয়-স্বজন তো বটেই—এ-শোকের দুঃখ সেরে যেতে খুব বেশী সময় লাগবে না পরীক্ষিতের।

কিন্তু পরীক্ষিৎ কখন ভাবেনি একমাত্র তারই সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুমিত্রা একদিন এ-বাড়ীতে এসে উপস্থিত হবে। নিজের ঘরে বসে অফিসের কাজ করছিল সে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বৌদি সুমিত্রাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। ওর সাদাসিধে শান্ত ও সম্ভ্রান্ত সাজগোজ, গভীর ও নম্র মহানুভূতির দৃষ্টি, পরিচিতের স্বচ্ছন্দ ভাব একটি নতুন মানুষের নতুন আত্মীয়তার স্পর্শের মত সুমিত্রাকে প্রকাশ করল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে রইল।

সুমিত্রাই প্রথম কথা বলল,—

"আপনি তো অনেকদিন আমাদের ওখানে যান নি।"

পরীক্ষিতের মত শক্ত মানুষের চোখের কোনে কোনে দুঃখের বেদনা যেন সামান্য একটু লাল হয়ে উঠল। সুমিত্রা তা লক্ষ্য করে বলল,—

"আমাদের ওখানেই যেতে বলছি না কেবল,—যেখানেই হোক,—বাইরে বেরুলে হয়তো ভাল লাগবে আপনার।"

"তুমি ছাড়া এ-কয়দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে খুব বেশী লোক দেখা করতে আসে নি। সেইজন্যে অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখে। কেন দেখা করেনি জানো?"

"ঠিক জানি না—তবে—।"

"আমি বাবার শেষ সময়ে পুত্রের কোন কাজই করিনি—রোগ-শয্যায় যখন পড়ে ছিলেন, খুব বেশী কাছে যাইনি—সেবা-শুশ্রূষা যা কিছু করবার দাদা আর বৌদিই করেছেন। তাদের চোখে ঘুম ছিল না—যা কিছু দুশ্চিন্তা,—যা-কিছু দুর্ভাবনা তারা দুজন একাই বহন করেছেন। আমিও তো তারই সন্তান কিন্তু আমি তো তাদের মত এত ভাবিনি, কাছে গিয়ে বসিনি। তেমন করে, অসুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিনি ভাল করে, অসুখ যে এত গুরুতর হয়ে উঠেছে—সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, সে বিষয়ে তো একবারও খেয়াল হল না আমার। এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে এসেছ, এ আমার সৌভাগ্য—কিন্তু এ-সৌভাগ্যের যোগ্য নই আমি!"

"আমি আপনাকে খুব বেশী জানি না—কিন্তু যতটুকু জেনেছি…"

"সুমিত্রা! তুমি আমাকে খুব বেশী জানো না কিন্তু যেটুকু তুমি পরিচয় পেলে তাতে এই মানুষটার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা বলতে পার তুমি?"

সুমিত্রা মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইল,—পরীক্ষিতের চোখের দিকে তাকাতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হল তার। যে-চোখ পরীক্ষিতের আবেগের উচ্ছ্বাসকে সংবরণ করতে কষ্ট বোধ করছে তাকে না দেখার অবসর দিয়ে সুমিত্রা যেন একটি রুদ্ধ কপাট খুলে দিতে চাইল।

মাথা নীচু করেই সুমিত্রা বলতে লাগল,—

"যত গুরুতরই হোক, যত সাংঘাতিকই হোক, যত রহস্যময়ীনই হোক, আমি তার জীবনের একটি চিত্র—একটি আংশিক আর খণ্ড চিত্র দেখে তার সমস্ত জীবনকে বিচার করতাম না।"

"আমি কিন্তু করি—অন্ততঃ একজনের সম্বন্ধে করেছি—"

"না—না এ-ভুল করবেন না সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হবে তাকে—সে হয়তো তা নয়—সে হয়তো চায়নি যা দেখেছেন।"

ওর কথাতে অবাক হল পরীক্ষিৎ। যে ঘৃণ্যতম একটি দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সুমিত্রার কাছেও যেন তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। তার কথার আড়াল থেকে সুমিত্রার কৈফিয়ৎ যেন বড় বেশী ব্যক্তিগত হয়ে মিনতি করে উঠল।

"তোমার মত অন্তে ভাববে না কিন্তু আর একটু দেখেই সবখানি বিচার করে বলবে।"

"আপনিও—?"

"সবখানি কি সব সময় দেখতে পায় মানুষ? এত সময় কোথায়? অবসর কৈ এত? সুযোগও কি পায়?"

"তা হবে। সেইজন্যেই বোধহয় এরা কেউই আপনাকে বুঝতে পারেনি—"

"হ্যাঁ, সেইজন্যেই আমি কারো কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পাইনি—

—সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্যও নই আমি।"

"মাথার ওপরে নির্ভরযোগ্য কেউ থাকলে মানুষের দায়িত্ব অনেক কমে যায়। এজন্যে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক,—সেইজন্যেই তা তার আসল পরিচয় নয়।"

"কি রকম?"

"আপনার দাদা নির্ভরযোগ্য মানুষ, বোধহয় সেই জন্যেই আপনার এ-ভুলটা হয়েছে।"

"ভয়ানক ভুল! এই ভুলের জন্যে মনকে আর কিছুতেই বোঝাতে পারছিনা। চেষ্টা করছি বোঝাতে। কোন একটা দুর্লভ কারণ পেলে যেন বেঁচে যেতাম।"

"একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—প্রসঙ্গতের মত শোনাবে হয়তো—"

"না। তোমার মুখে আমার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে আজ।—বল।"

"এর জন্যে দুর্লভ দুঃখ যদি এসে থাকে, তাহলে আপনার এই মহার্ঘ্য মনের দাম দেবারও লোক অনেক পাওয়া যাবে।"

"তুমি দাম দেবে?"

"নিশ্চয়ই—আরো অনেকে।"

একটু থেমে সুমিত্রা আবার বলল,—

"লেখার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন আপনি—সাহিত্য নিয়ে মেতে ছিলেন—লেখার মত পেয়ে বসেছিল আপনাকে। সে-সবই বোধহয় ভুলিয়ে রেখেছিল দারুণ দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনাকে ভুলে থাকবার জন্যেই হয়তো নিজেকে এভাবে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সাহিত্যের সেবাতে—কে জানে—

হেসে উঠলো পরীক্ষিৎ,—

"মন্দ বলনি সুমিত্রা! আমার দোষ-ত্রুটির সুন্দর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল! সারাজীবন তোমার মত একজন ভাল এডভোকেটের দরকার আমার।"

বিদ্যুতের মত কি একটা কথা সুমিত্রার সারা মন জুড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চমকে চমকে উঠতে লাগল। তারপর একটি হারানো সত্যের মত ও যেন হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। চেতনাহত মনের কোনে কোনে অজস্রধারা বহু দুঃখ ধীরে ধীরে জমে উঠতে লাগল। একটি অসহায় মানুষের মাথার ওপরে যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল নতুন পাওয়া একটি বিস্ময়ের অনুভূতি।

সহজভাবে আপনার আবেগই সুমিত্রার মুখের রং গাঢ়

হয়ে উঠল। পরীক্ষিতের শেষের কথা এড়িয়ে সুমিত্রা তার শেষের কথার জের টেনে বলল,—

"কথাটা সত্যি নয় ?

"না—।"

"তবে ? সেখাটেস্টার আলোচনাটা তো হত আমাদের বাড়ীতে। আর সেইজন্যেই তো অনেক সাহিত্যিক আসতেন সেখানে। আপনার recent গল্পটার খুব প্রশংসা হয়েছে। আমাদের সকলের কাছেই তা ভাল লেগেছে—আমার কাছে তো খুবই।"

"সেইজন্যেই হয়তো যেতাম—।"

"কি জন্যে ?"

"তোমাকেই শোনাবার জন্যে হয়তো।"

"পাঠিকা হিসাবে আমি খুব খারাপ নই কিন্তু—তবে অতখানি সম্মানের যোগ্য কিনা জানি না—।"

"তবে দুঃখ এই—এ-পাঠিকাকে আর বেশীদিন ও-বাড়ীতে পাওয়া যাবে না।"

পরীক্ষিৎ ওর দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। দেখতে লাগল সুমিত্রাকে ওর নিভৃত ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়ে মনের কামনাকে সুরভিত করে তুলতে ইচ্ছে হল তার। ওর তন্বী শরীরের মধ্যে যে ভাবনা অদৃশ্য ও বিলীন হয়ে অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে তাকে একটু স্পর্শ করে দেখতে ইচ্ছে হল পরীক্ষিতের। সুমিত্রার নিটোল ঠোঁটের উষ্ণ রক্ত-কণা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখছে আজ। সেই স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ও যা বলবে সেই সুধাসিক্ত ধ্বনি শোনবার জন্যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ হয়ে রইল।

হঠাৎ সুমিত্রার কথা শুনতে পেল আবার,—

"পাওয়া হয়তো যাবে,—ও বাড়ীতে আসবোও হয়তো মাঝে মাঝে কিন্তু সে সুমিত্রা তো আর থাকবে না যাকে এতদিন দেখে এসেছেন !'

পরীক্ষিতের মন হঠাৎ, সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

"এ-বিয়েতে তোমার ইচ্ছে আছে তো ?"

"হ্যাঁ—।"

ওর কথা শুনে পরীক্ষিৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেবল স্তম্ভিতই নয়, ও যেন ভীষণ নাড়া খেয়ে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল। রূঢ় সত্য শাপদের মত অতর্কিতে ওকে আক্রমণ করে বসল,—যার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। একটি ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর জীব দেখলে মানুষের মনে যেমন বিকার জন্মে সুমিত্রাকে দেখে তার তেমনি একটা অনুভূতি হল। আজ মনে হয়, স্ত্রীলোকের নিষ্ঠুরতা একেবারে উদ্দেশ্যহীন নয়। —পুরুষের আসক্তিকে চাঙ্গা করে কার্যকরী করবার একটা অদ্ভুত কৌশল যেন। কিন্তু সেদিন সে অতিকষ্টে এই নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করে সুমিত্রাকে বলল,—

"সুখী হও! সুখী কর! তোমার ভালবাসা সার্থক হোক !'

তখন সুমিত্রা এর কোন উত্তর দেয়নি। গাড়ীতে উঠতে উঠতে সে বলেছিল,—

"এই আশীর্বাদ করুন যেন সার্থক হয় আমার ইচ্ছে আমার,—একান্তভাবে আমার,—গোপন,—তা যেন চিনতে ভুল করে না কেউ !'

বুধবারে ওদের রেজিষ্ট্রেশন করে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। পরীক্ষিৎ খামাখা ধরে নিয়েছিল সুমিত্রা সে তারিখের আগে অন্ততঃ দুচারবার ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে। কিন্তু সে তারিখও চলে গেল এবং তার আগে কোন ঘটনাও ঘটল না। রঙীন একটি আগ্রহ ক্রমে উদাসীনতায় বিবর্ণ হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে কোন আমন্ত্রণ আসেনি ও-পক্ষ থেকে, কোন আহ্বান এসে পরীক্ষিতকে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দিতেও যেন খুব বেশী রাজী নয়। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও কোন যোগাযোগ ছিল না—তাদের সঙ্গে দেখা করে ওদের বিষয় জানবার কোন ইচ্ছেও হল না তার। কেমন একটা বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা হতে লাগল ও-বাড়ীর সাহেব ও মেমসাহেবের ওপর। সুধীন, শৈবাল, অমরেশকেও ভাল লাগল না আর। সাধনাকে অত্যন্ত 'চীপ্' বলে মনে হল আর সুমিত্রাকেও খুব ভাল জাতের মেয়ে বলে মনে হল না তার। শৈবালের স্বভাব-চরিত্র আর তার আগের বিয়ের কথা জেনেশুনেও যে-মেয়ে তাকে জাল ফেলে পাকড়াও করতে পারে সে-মেয়ের মধ্যে যত আকর্ষণীয় বস্তুই থাকুক না কেন সে খুব

স্বাভাবিকও প্রকৃতস্থ নয়। কোন কোন প্রকৃতির মানুষ সমাজের অনুমোদিত স্বাভাবিক বিবাহ-বন্ধনে তৃপ্তি বোধ করে না, চরিত্রের মধ্যে নষ্ট স্বভাবের আভাস না পেলে তাদের প্রণয় যেন পরিমাণে উত্তেজিত হয় না,—বিকৃত অস্বাভাবিকতা একটা সুখের আবহ সৃষ্টি করে তাদের মনে। সুমিত্রা সেই জাতের মেয়ে, শৈবাল সেই জাতের পুরুষ। শান্ত, স্বাভাবিক, সরল ও সুস্থ মিলনের মধ্যে ওদের যাযাবর প্রণয় বেশীদিন বাঁচে না। তাই হ'ল ওদের দুজনের মিলন হয়েছে—ওদের বিবাহিত জীবন সুখী হবে কিনা তা পরীক্ষিৎ বলতে পারে না, কিন্তু ওদের প্রত্যেকের মনের ভিতরকার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য যে সুখী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

[ক্রমশঃ]

•

ইটালীর নেপল্‌স্ সহরে এক মেলায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ক্যারুসো বেড়াতে গেছেন।

মেলার এক পাশে এক বৃদ্ধ গায়ক প্রাণপণে গান জুড়েছে দুটো পয়সা পাবার জন্যে, কিন্তু গান তার জমছে না। শ্রোতা কেউ আসছে না।

একটু দূরে আর একজন সুবেশ তরুণ গায়ক বেহালা হাতে হাসি মুখে গান ধরেছে,—লোকের ভিড় সেখানেই বেশী।

বৃদ্ধের করুণ মুখ দেখে ক্যারুসোর মনে দুঃখ হোল। তিনি ভাবলেন: এখানে ত লোকে আমাকে চেনে না,—দেখা যাক্ বৃদ্ধকে একটু সাহায্য করা যায় কি না।

কারুসো গান ধরলেন বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মেলার লোকজন যেন চমকে গেল। এ কী কণ্ঠস্বর। ছুটে এল তারা বৃদ্ধের পাশে। শেষে এমন হোল, সব কিছু ফেলে লোকে ছুটে এল সেখানে। সেই তরুণ গায়কটিও।

টাকা পয়সা পড়তে লাগল বৃদ্ধের টুপিতে। টুপি উথলে উঠল।

বৃদ্ধ আনন্দে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখে কখন ক্যারুসো চলে গেছেন। তাঁর পরিচয় কেউ সেখানে পেল না।

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

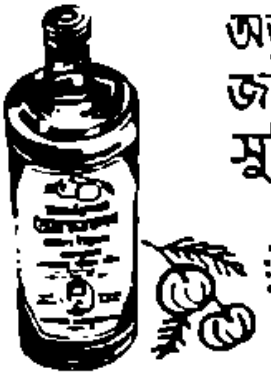

অতুলনীয় গুনাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্কতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা ১

৮

Regd. No. C3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু তৈরকর্ম নয় সুরুচির পরিচায়ক

গল্পভারতী

পঞ্চবিংশতি-বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

৬৫ বছর ধরে জনপ্রিয়-
আজও সবার সেরা

লিলি'র
থিন এরোরুট
বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোম্পানি প্রাঃ লিঃ । কলিকাতা-৪

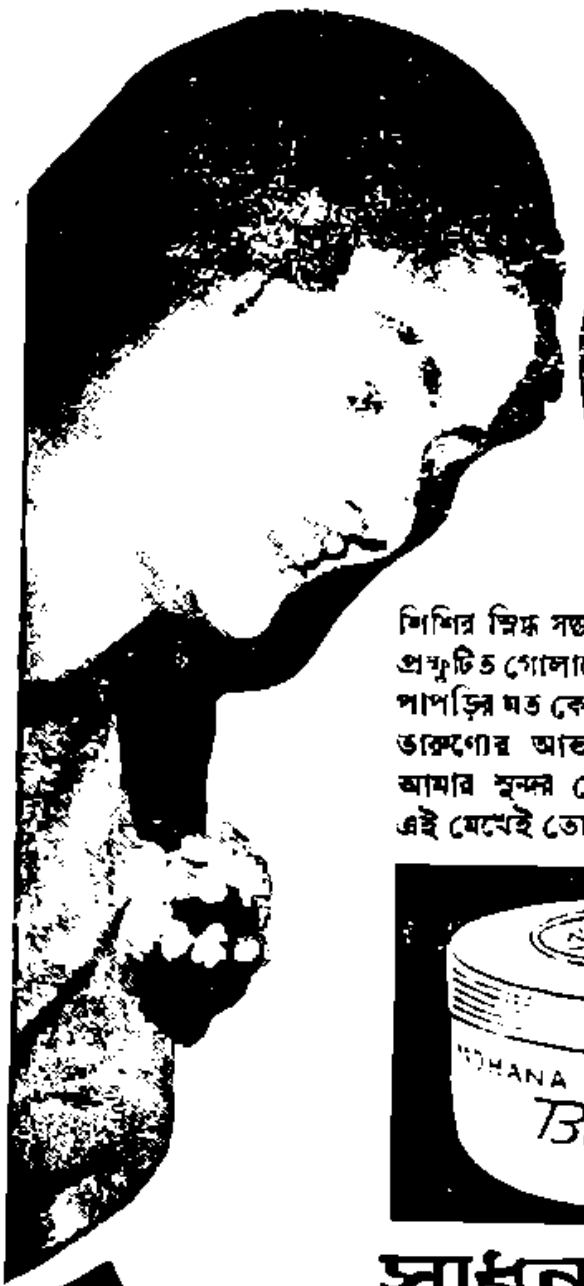

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

বাটার সর্বাধুনিক ওয়েদারপ্রুফ জুতো
সত্তরের দশকের জন্য

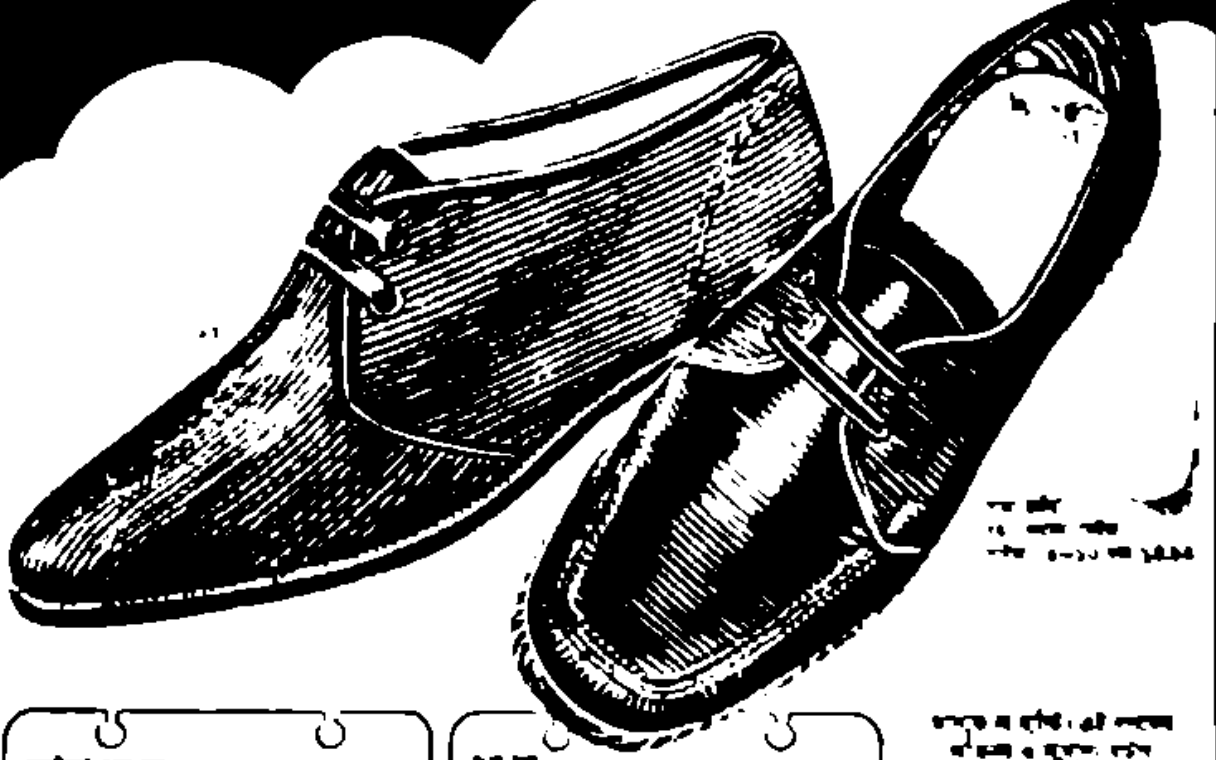

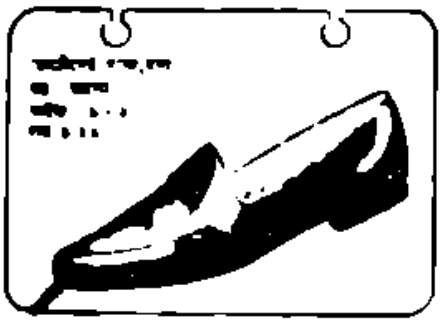

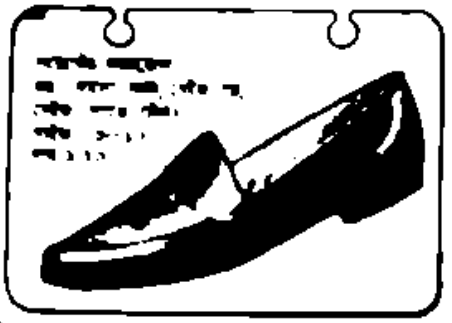

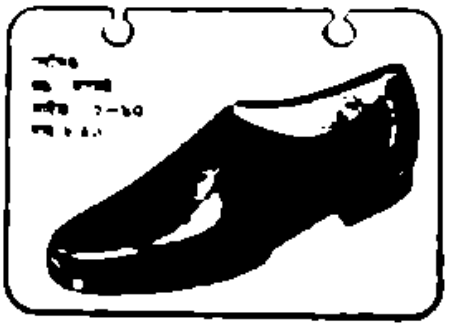

Bata

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

[illegible], JUNE, 1970

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] : ৭৫ টাকা

[illegible] : ৭৫ টাকা

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]-৯ হইতে [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

১, [illegible], [illegible]-৯ হইতে [illegible]

খেলে খাই-
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!

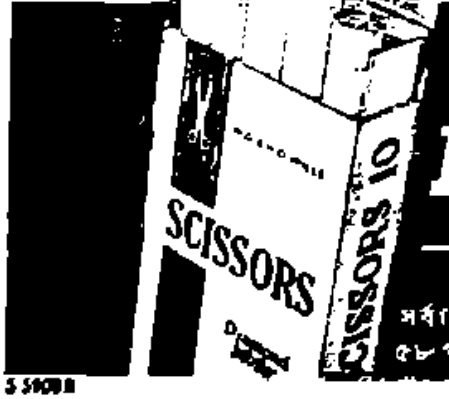

সিজার্স
সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা

সর্বাধিক দাম
৫৮ পয়সায় ১০টি

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—

কার্টুন

চিঠি শুধু চিঠি নয়

বন্যা কন্যা (উপন্যাস) —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ফিরে ফিরে চাই —প্রভাত মুখোপাধ্যায়

আবার সেই জেল —দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

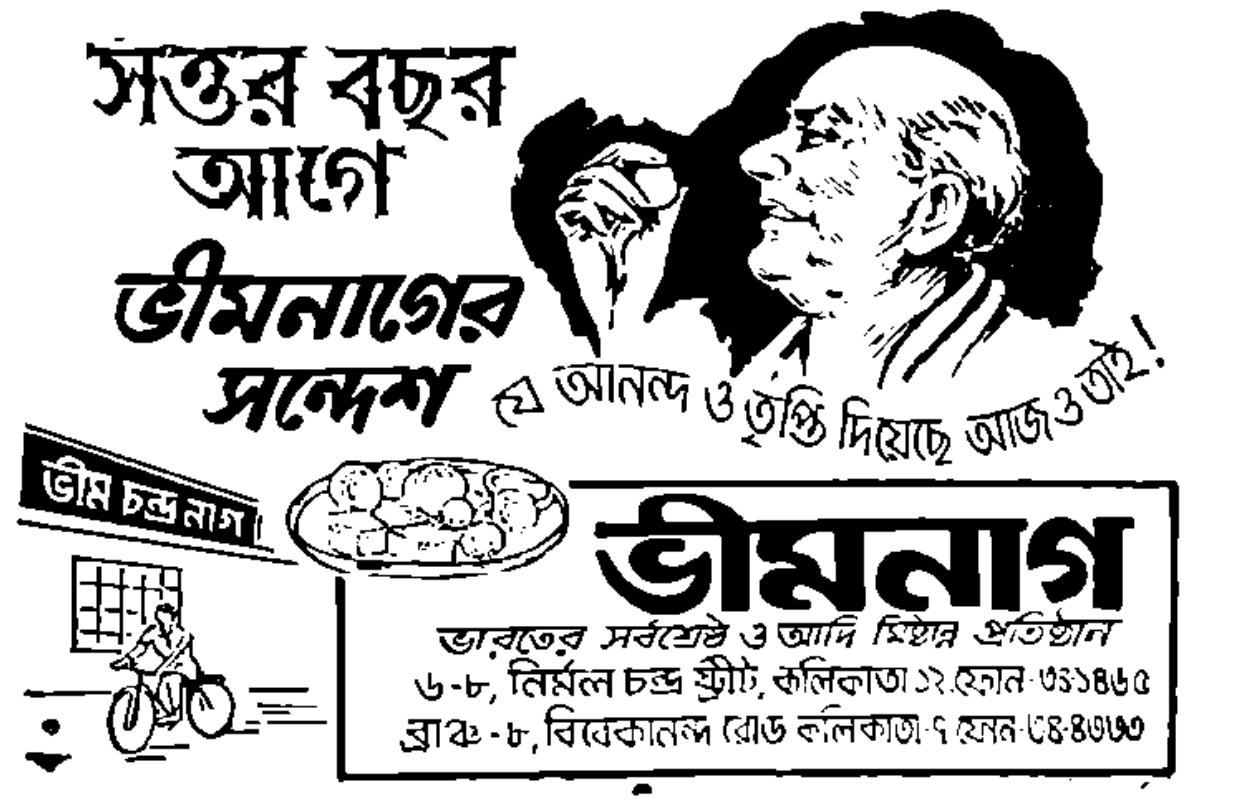

॥ সেরা লেখকের নূতন বই ॥

কাজী নজরুল ইসলামের
নূতন কাব্যগ্রন্থ
সন্ধ্যামালতী ৫৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নূতন নাটক সৃষ্টি
ভাগবতী তনু ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস
সেই মরুপ্রান্তে ১১৲

আবদুল জব্বারের
বাংলার চালচিত্র ১০৲
দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে রচনা
পাঠক মহলে বিপুল সাড়া তোলে।

প্রমথনাথ বিশীর রহস্যোপন্যাস
শাহী শিরোপা ৩॥

॥ বিখ্যাত বইয়ের নূতন মুদ্রণ ॥

প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস
কেরী সাহেবের মুন্সী (১৫শ মুদ্রণ) ১০৲

বিমল মিত্রের উপন্যাস
কুমারী ব্রত ৫৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস
শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা (৫ম মুঃ) ৭৲ **না** (৮ম মুঃ) ৩৲

সুশীলকুমার গুপ্তের
ঈশ্বরের আবাস ৬৲

শরদিন্দুর অনন্যসাধারণ উপন্যাস
আমি কান পেতে রই (৩য় মুঃ) ১৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর
নব্য ছন্দ ৫॥

দহন ও দীপ্তি ৬৲ **নারী ও নিয়তি** ৩৲

শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
মণিমহেশ ৬॥

শান্তাদেবীর
নগর পারে রূপনগর (তৃতীয় মুদ্রণ) ১৮৲

সৌমীকান্ত সরকারের
শ্রদ্ধাস্পদেষু ৫৲

বিমল মিত্রের
সাঁঝের মল্লিকা (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
একই পথের দুই প্রান্তে ৪৲

কড়ি দিয়ে কিনলাম নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

অবধূতের
নীলকণ্ঠ হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যালের উত্তর
হিমালয় চরিত ১১৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

এই সংখ্যায়

শনিবারের পাতা থেকে

বাংলা রঙ্গালয়ের নব-রূপায়ণ	—হেমেন্দ্রকুমার রায়	
মফস্বলিনয়ে শতবর্ষের পারিবারিক ঐতিহ্য	—অনাথ উপাধ্যায়	
যে কাহিনী চিরকালের :		
ট্রেজার আইল্যাণ্ড স্টিভেনসন	—শুভন রায়	
যাদের ছোট ভাবি	—নোটবিহারী চট্টোপাধ্যায়	১১৪৫
অতি সাধারণ	—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৪৯

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

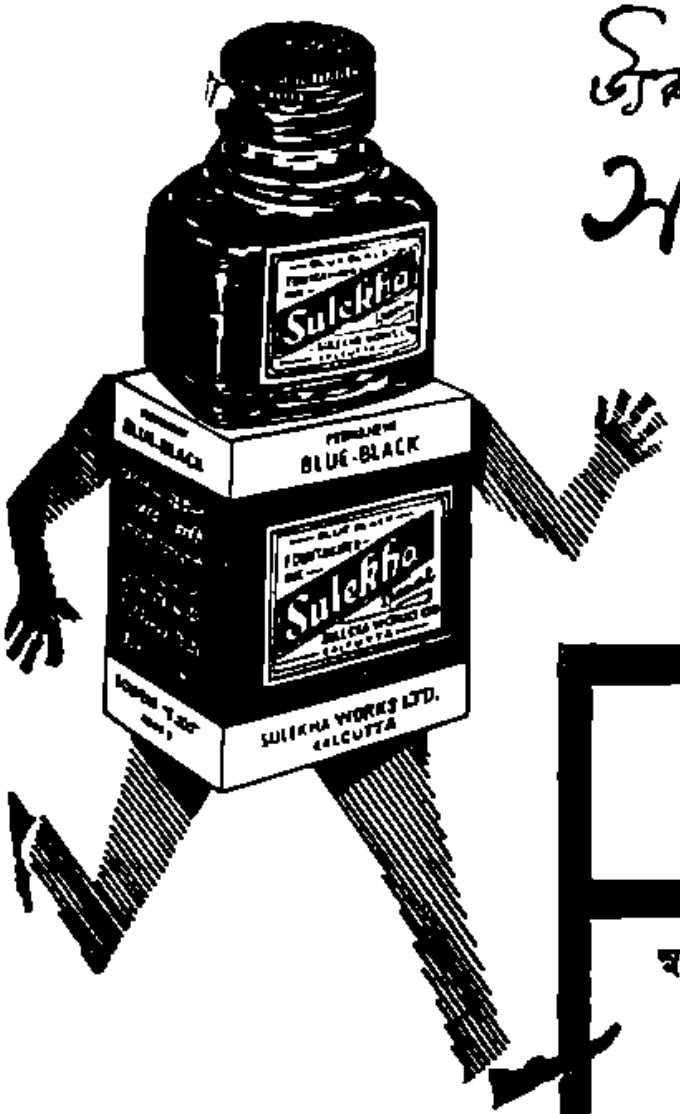

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেকসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

বেশমল

ফাউণ্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে ৫০, ৩০, ১২০, ৩০০ ও ৬১২০ এম-এল. শিশিতে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

এই সংখ্যায়

ম্যাপ —নির্মলেন্দু গৌতম

নাটমঞ্চ —অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুরাতন পাতা

বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো

গাঁয়ের কথা যায়না বোলা : ডেভিড হেয়ার অমিল মিয়োগি

কল্লোল কালি-কলম —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী

সন্দেশ বিক্রেতা

সিমলার বিখ্যাত

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

হেড অফিস : ৫৬/২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৪৫৩

শাখা :

৩/১, বেনোর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ১৩-৩ ...

৯৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, এভিনিউ,

কলিকাতা-৯

পোড়া .... কাটা .... পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

হাতের কাছে
রাখুন

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

এই সংখ্যায়

খেলাধূলা — জ্যোতির্ময়

বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এক পথ

(অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

এই প্রথম

গোপীবল্লভপুরের তরুবালা — শৈলজা চৌধুরী

অপরাহ্নবর্তী — সুবোধ সিংহ

মরণোল্লাস — স্বামী ওঙ্কারানন্দ

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ'ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিস।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

"ক্রোড়পত্র"

মজলিশ ●

আলপনা —গৌরী ভঞ্জ

হাতের কাজ হাসিরাশি দেবী

সুগন্ধ নির্বাচন —শকুন্তলা

একটি নির্ভরযোগ্য নাম তৈরি

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশগুচ্ছ ধ্বংস ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশবৃদ্ধিতে সব কাজ চুলের কোমলতা ও উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণ রাখবে ● চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ● বোম্বাই

কানপুর ● দিল্লী

মাথা ঠাণ্ডা রাখার কাজে
"মহাভৃঙ্গরাজ" অদ্বিতীয়।

ভৃঙ্গল মহাভৃঙ্গরাজ মাথার তেল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদমতে ক্যালকাটা
কেমিক্যালের আধুনিক কারখানায় তৈরি।

ভৃঙ্গল মাথার তেলে আছে
ভৃঙ্গরাজ পাতার রস, তিল তেল
এবং আরো ১২টি গাছগাছড়ার নির্যাস।
এ-সমস্তই মাথা ঠাণ্ডা
রাখে। চুল আরো
সজীব করে।

বিশুদ্ধ
আয়ুর্বেদমতে তৈরি
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি
মহাভৃঙ্গরাজ
মাথার তেল

রজত জয়ন্তী বর্ষ
পঞ্চবিংশতি বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাঙালীজাতি এই মহাপুরুষের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। সে কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। আমরা সেই মানবহৃদয় অমলাবান্ধব মৃত্যুঞ্জয়ী অমর পুরুষের শ্রীচরণে একটি প্রণাম নিবেদন করি।

ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

বিদ্যাসাগরের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, তিনি যে বাঙালী ঘরলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থ মানুষ।

আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না। আড়ম্বর করি, কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না। যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না। তুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারিনা। আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না। আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি। পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।...তিনি কিন্তু সর্ববিষয়ে ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

আজ তিনি বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয় বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষালাভ করিয়া যাইব।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অন্যের গৌরব, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব—এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

—রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সর্বগুণের আধার। শুধু একটা কথা শুনতে পাই—তাঁর নাকি কোনও ধর্মবিশ্বাস ছিল না।

কিন্তু সেকথা ভুল।

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদিন বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন 'লোকে বলছে, ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেদের জন্য 'বোধোদয়' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেছেন, তাতে ছেলেদের জানবার সবই আছে, নেই শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা।'

ঈশ্বরচন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

সংস্করণে থাকবে।'

ছিলও তাই।

বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ তিনি লিখে দিয়েছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন—ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নিজের ধর্মমত কাউকে দেখাতে বা জানতে দিতে চাইতেন না। সর্বদাই তিনি তা গোপনে রেখে চলতেন।

বিজয়কৃষ্ণ ধর্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করলে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি নাকি কি-একটা হয়েছ?'

প্রচারক হওয়াটাকে তিনি একটা বিভীষিকা মনে করতেন। উপদেষ্টা হলে মানুষের স্বাভাবিকতা নিশ্চয়ই নষ্ট হয়—এই ছিল তাঁর ধারণা।

এই নিয়ে একটি ভারি মজার গল্প আছে শুনুন।

একদিন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের পিতা চাঁদমোহন মৈত্র ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ীটি কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারছিলেন না। হঠাৎ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শশীভূষণ বসুর সঙ্গে দেখা। চাঁদমোহনবাবু জানতেন শশীবাবুও বাদুড়বাগানে থাকেন। তখন তাঁকে অনুরোধ করলেন, 'আপনি আমাকে বিদ্যাসাগর-মশায়ের বাড়ীটি দেখিয়ে দিন।'

আধঘণ্টা চেষ্টা করেও শশীবাবু বাড়ীটি খুঁজে বের করতে পারলেন না।

তারপর অনেক কষ্টে অন্য একটি লোকের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের বাড়ীটি তাঁরা বের করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সেইকথা শুনে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশীবাবুকে বলেছিলেন, তুমি এই বাদুড়বাগানেই বাস কর, অথচ এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে আমার বাড়ীতে আনতে পারনি। তুমি না ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক?—তুমি না মানুষকে পরলোকের পথ দেখাও? এইখানে এই জানা পথেই যখন এত ভুল, তখন অজানা পথে লোকজনকে চালান্ কর কেমন করে? তুমি বাপু এ-কাজ আর কোরো না। ধর্মপ্রচারকের ব্যবসা তুমি পরিত্যাগ কর! নইলে মানুষের দুর্ভোগের আর সীমা থাকবে না।

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের একজন মাষ্টারকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একদিন বলেছিলেন, তোমাদের বিদ্যাসাগরের কাছে আমাকে একবার নিয়ে যাবে?

মাষ্টার বললেন, কেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন কেন?

পরমহংসদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের কৃপা না হলে এরকম মানুষ জন্মায় না।

মাষ্টার সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে।

ঘোড়ার গাড়ী করে বিদ্যাসাগরের বাড়ীর পথে যেতে যেতে মাষ্টার বললেন, এই বাদুড়বাগান। এইটি রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ী।

রামকৃষ্ণ বললেন, এখন ও-সব আর ভাল লাগছে না। এখন শুধু বিদ্যাসাগর। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, প্রেম, জ্ঞান—যা শুধু মানুষকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। যেখানে যাচ্ছি, তিনি সেই বিদ্যার সমুদ্র।

—হাঁহে, আমার এই জামায় বোতাম নেই। কোনও দোষ হবে না তো?

মাষ্টার বললেন, না না আপনার কিছুতে দোষ হবে না।

বিদ্যাসাগর পরমহংসদেবকে কখনও দেখেনি! ভেবেছিলেন বুঝি গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী। এখন দেখলেন নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ, বোতামখোলা কোটের ওপর কোঁচার কাপড়টা কাঁধের ওপর তোলা। পায়ে চটি জুতো।

বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, খাল, বিল, নদী, নালা পেরিয়ে আজ আমরা সাগরে এসে মিলিলাম।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, সেই সাগরের নোনা জল খানিকটে নিয়ে যান।

রামকৃষ্ণ বললেন, না গো নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি হচ্ছ বিদ্যার সাগর। তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বগুণ হয় দয়া থেকে। তোমার অন্নদান, বিদ্যাদানের কথা আমি শুনেছি। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ওইতেই ভগবান লাভ। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। তোমার কিন্তু দয়ার জন্যে, তাই তো তুমি সিদ্ধ গো—

বিদ্যাসাগর অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমি সিদ্ধ? আমি আবার ভগবানের জন্যে সাধন করলুম কবে?

রামকৃষ্ণ বললেন, আলু পটল সিদ্ধ হলে কি হয়? নরম হয়। তুমিও তেমনি নরম হয়ে গেছে। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় গলে জল হয়ে যায়। তুমি সিদ্ধ নও তো কে সিদ্ধ? তুমি মাতৃভক্ত। মায়ের জন্য তুমি কাঁদো। পরের জন্য চোখে যার জল আসে সে নিশ্চয়ই সিদ্ধ পুরুষ।

বিদ্যাসাগর বললেন, কিন্তু জানেন তো—কলাই বাটা সেদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি তেমন নও। তুমি ধরকচা-পড়া পণ্ডিত নও। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে। তুমি সেরকম নও। তোমার বিদ্যার ঐশ্বর্য্য—দয়া ভক্তি বৈরাগ্য খুঁজছো। তুমি জ্ঞানময় পুরুষ, তুমি ধর্মবিশ্বাসী—ঈশ্বর প্রেমিক।

কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে এই কথা বলেছিলেন, দু'চারজন অজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাঁর নামে অথবা দোষারোপ করে বলেন—তিনি ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না—তাঁরা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

অন্তরীক্ষে

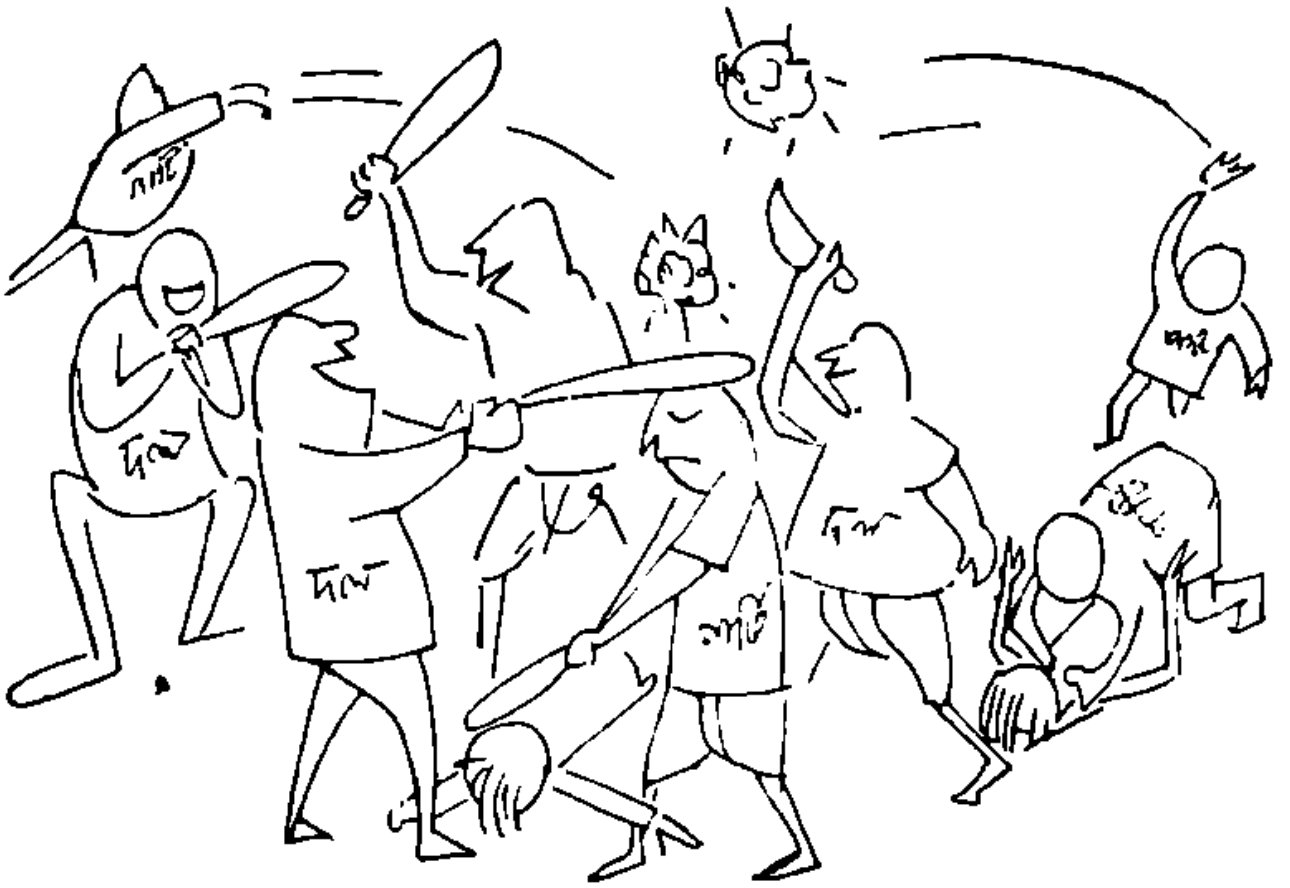

এক প্রাণ এক তান

কত আশা।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসা।

হায়। আজ আর পালাবারও পথ নেই।

চিঠি শুধু চিঠি নয়

(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শতবার্ষিকী আগতপ্রায়। জীবনী সাহিত্যে অদ্বিতীয় গল্পভারতীর ভূতপূর্ব সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের লেখা দেশবন্ধুর জীবনী গল্পভারতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা বাংলা সাহিত্যেএক অবিস্মরণীয় কীর্তি হয়ে আছে। তারপরও গল্পভারতী অনেকবার অনেকভাবে দেশবন্ধুকে স্মরণ করেছে।

আজকালকার মানুষ দেশবন্ধুকে জানেন না। যাঁরা জানতেন তাঁরাও আজ ভুলতে বসেছেন। কিন্তু একদিন ছিল যেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু সারা ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ঐতিহাসিক মামলার সময় থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি যে স্বার্থত্যাগ, যে বদান্যতা, যে স্বদেশপ্রেম দ্বারা রাজ-চক্রবর্তীর গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারাদণ্ড হয় তখন দেশবরেণ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শ্রীবাসন্তী দেবীকে যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রখানি প্রকাশ করে আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে স্মরণ করার সুযোগ পেয়ে ধন্য বোধ করছি।

"প্রিয় ভগ্নি,

আমার মনে যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম।

আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস-স্মরণীয় মোকর্দ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন, সেইদিন হইতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, দীন দরিদ্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে তবুও চিরদিনই তাঁহার প্রতি আমি আকর্ষণ অনুভব

করিয়াছি। তিনি বাংলা দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত রায়ের এই অগ্নি-পরীক্ষার দিনে, তাঁহার প্রতি স্বতই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে। আমি জানি, আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত রায়ের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না, কেননা লোক সমাজ ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাস করি। চিরজীবন একান্তভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধহয় সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

আপনি আপনার দুঃখ অপূর্ব সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাঙ্গালার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি মনে প্রাণে আশা করি যে কলঙ্কের আমাদের মাতৃভূমির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব।

১৪।১২।২১

ভবদীয়—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বন্যাকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা বদল করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল।

যাবার আগে ছোটবৌদি শাশুড়ীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে দম্পতিকে পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে গিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে বসিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বন্ধু দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের সুখে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে ছদিন জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা

অনুরাগ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিলনা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে খেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন ঘুমঘোরের মধ্য থেকে ফুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বন্ধু-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের সর্ত পালন করল না। বিরোধ ঘুমায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হলনা। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি বাবদ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশিকরে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম নাবনি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার দরুন চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বম্বেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়েদিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তর্লোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শক্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে

পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় রুদ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল– এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা তালা লাগাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। যেমন সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবচেতনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুবীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযূষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযূষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুবীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে বাঙ্ময় করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুবীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। নেহাৎপক্ষে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের মা বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবজ্যোতি তাকে নিউটন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে। দেবজ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুবীরকে খবর দিল। সুবীর উদাসীন রইল। তার বিতৃষ্ণার কারণ পীযূষ দত্তের কাছে গিয়েছিল 'অবচেতনা'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে আর পীযূষ তাতে রাজি হয়নি যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার ঝগড়া হয় আর সুবীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্দীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে হিমাংশু গিয়ে শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু গর্ভের সন্তান বেঁচে নেই।

নার্সিং হোমে অপারেশনের আগে ডাক্তারকে বনছায়া অনুরোধ করল যেন তাকে আর সন্তানধারণ করতে না হয়। ডাক্তার সেই রকম ছুরি চালাল। নার্সিং হোমে যতদিন ছিল বনছায়ার কোনো খোঁজ নেয়নি সুবীর। সন্দীপই সব দেখাশোনা করেছে। তারপর যখন ছুটি পেল বনছায়া সন্দীপের সঙ্গে সন্দীপের বাড়িতে গিয়েই উঠল।]

একত্রিশ

বনছায়া নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়ে স্বগৃহে ফিরে যায়নি, গিয়েছে সন্দীপ সেনের বাড়িতে, এখবর পেয়ে হিমাংশু একেবারে ক্ষেপে গেল। কে সন্দীপ সেন? তার ওখানে বসবাস করতে যায় সে কোন সুবাদে? স্পর্ধা কী মেয়েটার—দিনে দুপুরে প্রকাশ্য ডাকাতির চেয়েও নির্লজ্জ কাণ্ড করে বসেছে! অথচ কিনা তাকে মত স্বামী দাঁড়িয়ে! স্বামীটা কী? মানুষ না ন্যাপ্‌কিন পোষ্ট?

রূপে-যাদুে মেয়েটাকে সুধীর বিভ্রান্ত করে রেখে এটা তো হিমাংশুর না-চাওয়া নয়। মেয়েটার অহঙ্কার চূর্ণ হোক, দেহে-মনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মেয়েটা পথে বেরিয়ে আসুক, এ তো তার গোপনতম স্বপ্ন। বলতে কি, এ চরমতম নাটকের উদ্বোধনেই তো সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহের বীজ বুনেছে, পেতেছে নানারকম সংঘর্ষের ফাঁদ—মদ ধরিয়েছে, মেয়েমানুষ লাগিয়েছে। কত দিন ওদের কলহের কাহিনী শুনতে-শুনতে গর্জে উঠেছে—অমন অবাধ উদ্ধত স্ত্রীকে বাড়ির বার করে দিতে পারে না লোকটা? মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না? হিমাংশু বুঝি মনের সুদূরতম কোণে আশা করত, নির্যাতিত হয়ে বনছায়া তার কাছে এসে প্রতিকার খুঁজবে আর বিতাড়িত হলে নিঃস্বের মত দাঁড়াবে এসে তার দরজায়। কিন্তু এ কী হল? কে সন্দীপ সেন? কী তার অধিকার?

নার্সিং হোমে অভিরাম তো বনছায়াকে বলেছিল হিমাংশুর কথা। বলেছিল, 'বোস সাহেব এসেছিলেন খোঁজ নিতে।'

বনছায়া ক্লান্তস্বরে বলেছিল, 'তাঁর অনেক দয়া।'

অভিরাম আরো একটু বলেছিল। বলেছিল, 'বললেন, যদি কখনো কোনো দরকার হয় তাঁকে যেন জানান।'

ক্ষীণ একটু হেসেছিল বনছায়া। প্রথমেই তো বলকে জানানো দরকার তাঁর এমন্নি স্ত্রীর চিকিৎসার কোনোই দায়িত্ব নিচ্ছে না, বাঁচল কি মরল একবেলা আসছেও না উঁকি মারতে। না, বলেনি কিছু মুখ ফুটে। যদি মনের টানে না আসে তবে শাসনের জোরে বেঁধে আনার লাভ কী! হাসিটি মিলিয়ে যেতে-যেতে যেন নীরবে বললে, কারু সাহায্যের দরকার হবে না, আমি নিজেই নিজেকে পারব উদ্ধার করতে।

রিপোর্ট দেবার সময় অভিরাম অবশ্য বাড়িয়ে বলেছিল। সে জানে কেমনটি বললে বোস সাহেব খুশি হবেন। তাই সে বললে, 'আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন শুনে মা খুব সাহস পেলেন, বললেন, দরকার বুঝলেই খবর দেবে আপনাকে।'

আর কখন দরকার বুঝবে! সন্তান দুইয়ে কৃশ শরীরে নিঃস্বের মত বেরিয়ে গেল নার্সিং হোম থেকে, তবুও তো একবার মনে করলনা! তখন তার আর বাধা কী ছিল! তার সেই প্রেমিক স্বামী তো তখন যবনিকার অন্তরালে চলে গিয়েছে, হয়তো বা একেবারে যবনিকারই বাইরে। তার কথা আর কে ভাবে! তবু যদি বুকভাঙা বাপের বাড়িতে ঠাঁই হয়েছে। সেখানেও তো দরজা বন্ধ। আর কোনো সহায় আত্মীয়ের কথাও তো শুনিনি। কোনো হোম বা হস্টেলে চট করে জায়গা পাওয়া চারটিখানি কথা নয়, তাছাড়া তার এই ভগ্ন স্বাস্থ্যে সেটা নিরাপদও হতনা। তখন ওই তো উপযুক্ত সময় ছিল হিমাংশুকে স্মরণ করার। স্মরণ করার পদ্ধতিটাও কত সহজ ছিল। শুধু তাকে একবার টেলিফোন করে সংক্ষেপে একটু জানানো। হালো, মিস্টার বোস? আমি বনছায়া। নার্সিং হোম থেকে বলছি। আপনি তো সব জানেন—আপনার

এমনটি, আমার স্বামী, আমাকে 'ডেজার্ট'—পরিত্যাগ করেছেন। যদি দয়া করে আমার একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দেন।

একবার বলে দেখলে পারত। দেখলে পারত কোন রাজকীয় আরামে তাকে হিমাংশু অধিষ্ঠিত করে। কত তাকে মিশিয়ে রাখে, নিশ্চিন্তে রাখে। কত তাকে স্বাধীনতা দেয়! অভাবের, আঘাতের, অপমানের ধুলোটুকুও কাছে ঘেঁসতে দেয় না।

একদিন তার একটা মুখের কথায় হিমাংশু কে-না-কে-এক সুবীরকে চাকরি দিয়েছিল। এবং তাতে সে নিজে প্রতারিত হয়েছে কেননা সুবীরের চাকরিকে সে নষ্ট করেনি এবং ক্রমে-ক্রমে তার উন্নতি ঘটিয়েছে—সেও সমস্তই বনছায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে, বনছায়ারই সাংসারিক সুখের জন্যে। অথচ হিমাংশুর উপর কিনা এখনো বনছায়ার বিশ্বাস নেই! কিন্তু প্রথমে আশ্বাস দিয়ে পরে বঞ্চনা করার সময় বনছায়া কি হিমাংশুর মহত্বে বিশ্বাস করেনি? বিশ্বাস করেনি যে এক ছুঁচকে চাকরি দিয়ে সেই মুহূর্তেই আবার তা সে কেড়ে নিতে পারবে না? কেননা সুবীর নিজে তো নিরপরাধ, তার চাকরি খেয়ে তাকে বেকার করে দিতে বিবেকে বাধবে হিমাংশুর। সে বিবেক কি মহত্বের বিবেক নয়? সে বিচারবুদ্ধি কি নিঃস্বার্থ ছিলনা?

কোথা থেকে কে জানে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল—নিজেই হঠাৎ চমকে উঠল হিমাংশু। কিন্তু আর ওসব কথা এখন ওঠে কী করে? বনছায়ার প্রেমের প্রাসাদ তো এখন মেঘের প্রাসাদের মত উড়ে গিয়েছে। এখন তো বনছায়া পথে—একাকিনী। সাময়িকভাবে সন্দীপ সেনের আশ্রয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কে সন্দীপ সেন, তার দাবি কিসে? আইনে, না, ধর্মে, না, ভালোবাসায়?

বেল টিপল হিমাংশু। বললে, 'সুবীরবাবুকে ডেকে দাও।'

সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে সুবীর এসে হাজির।

চেহারা দেখে মনে হয় না কোনো অশান্তির মধ্যে আছে। বেশ স্বাস্থ্যপুষ্ট নিশ্চিন্ত চেহারা। বীরবিক্রম মনোভাব।

কাছাকাছি হতেই কেন-কে-জানে মুখের সিগারেটটা ফেলে দিল সুবীর।

হিমাংশু তাকে বসতে বললে না। শুধু বললে, 'সন্ধে সাতটায় আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

ঠিক-ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় গিয়েছে সুবীর। মনে হচ্ছে কীরকম যেন গম্ভীর পরিবেশ। আর-আর দিন মধু আসত, আজ বেল টিপতে বেয়ারা ট্রেতে করে চা নিয়ে এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে হিমাংশু জিজ্ঞেস করলে, 'বনছায়া কোথায়?'

আপনার স্ত্রী কোথায় নয়—একেবারে নাম ধরে বললে। তা বাপের বাড়ির আত্মীয় লোক, ছাত্রাবস্থার বন্ধু, নাম বলতে বাধা নেই। তবু কেমন যেন অন্য-রকম লাগল। সুবীরের ইচ্ছে হল বলে, জানিনা। কিন্তু সাহস পেলনা। বললে, 'সে তার সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে আছে।'

'সাহিত্যিক বন্ধুর নাম নেই?'

'নাম সন্দীপ সেন।'

'করে কী?'

'কোন একটা অফিসে কেরানিগিরি করে।'

'অবস্থা কেমন?'

'এমনিতে ভালো নয়। তবে দু-দুটো বেস্ট-সেলার উপন্যাস লিখে ইদানি কামাচ্ছে দু পয়সা—তার পর সিনেমা, অনুবাদ—'

পরের গুণকীর্তন করতে হবেনা, থামিয়ে দিল হিমাংশু। 'বিয়ে করেছে?'

'করেনি বলেই শুনেছি।'

'আপনার স্ত্রী তার বাড়িতে আছে! কী শুনছেন?' হিমাংশু স্পষ্ট হল: 'বাড়িতে আছে, না, সঙ্গে আছে?'

এক মুহূর্তও চিন্তা করল না সুবীর। বললে, 'বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই, তখন সঙ্গেই আছে বলতে হয়।'

'বলতে আপনার বাধল না একটুও?' মুখিয়ে উঠল হিমাংশু।

'সত্য কথা বলতে বাধবে কেন?'

'সত্য! সত্য কথা! আপনার স্বামিত্ব সত্য নয়? আপনার স্বামিত্বের এই অমর্যাদা সত্য নয়?'

নিরুপায় চোখে এদিক-ওদিক তাকাল সুবীর। বললে, 'তা আমি কী করতে পারি?'

'কী করতে পারেন জানে? একটা পরপুরুষ আপনার চোখের উপর দিয়ে আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল, আপনি কিছুই করতে পারেন না? গুট করতে পারেন না।'

একটু বুঝি রাগ মেশাল সুবীর: 'বন্ধুক কই যে গুট করব?'

ছুরার টানল হিমাংশু। বললে, 'আমি আমার রিভলভার দিচ্ছি, আপনি আপনার স্ত্রী-চোর সন্দীপ সেনকে গুলি করুন।'

আকাশ থেকে পড়ল সুবীর: 'গুলি করব?'

'আপনার স্বামিত্বের অধিকার যে ক্ষুণ্ণ করল তাকে আপনি ছেড়ে দেবেন? আপনার স্ত্রীর সতীত্ব আপনি আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করবেন না?'

এসব কথার কোনো মানে হয় না বলে সুবীর অন্য দিকে তাকাল। বললে, 'সন্দীপ সেনের দোষ কী। সে তো জোর করে বনছায়াকে নিয়ে যায়নি, বনছায়া নিজের ইচ্ছায়ই তার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে।'

'নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে গিয়েছে!' তিক্ততার সঙ্গে পুনরুক্তি করল হিমাংশু: 'কিন্তু তার এই ইচ্ছা হল কেন? কত তার অনাদর অপমান করেছেন তার ঠিক আছে? আপনার অত্যাচারে অসহায় বোধ করেই সে ছেড়েছে আপনাকে।'

এক মুহূর্ত হতচকিতের মত বসে রইল সুবীর। হিমাংশু তো চিরদিন বনছায়ার বিপক্ষেই চলেছে, আজ তার হঠাৎ পক্ষ নিচ্ছে কেন বুঝতে পারল না। তবু কথার জবাব তো দিতে হবে—আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি যা খুশি ব্যবহার করেছি, তাতে আপনার কী—এই কথা বলে তো উঠে যাওয়া চলবে না। তাই সুবীর মন্থরস্বরে বললে, 'অপমান-অত্যাচারের কথা সব বাজে কথা।'

'বাজে কথা?' হিমাংশু গর্জে উঠল: 'নার্সিং হোমে আপনি ওর দেখাশোনা করেছেন?'

'আমি কেন করতে যাব?' সরল নির্লিপ্ত মুখে বললে সুবীর, 'ও তো আমার অধীনে আমার অফিসের নার্সিং হোমে ঢুকল না। ও সন্দীপ সেনের পরামর্শে ওদের অফিসের নিউ-ডনে গিয়ে ঢুকল। সেখানে কী সুবিধে ওরাই জানে। কই অত নামকরা নার্সিং হোমে কী হল? পেটের ছেলেটা তো বাঁচাতে পারল না।'

'তার জন্যে আপনার মনে কোনো ক্ষোভ আছে বলে তো মনে হয় না।'

'বনছায়ারও ক্ষোভ নেই।'

'ক্ষোভ নেই? গর্ভধারিণী মায়ের ক্ষোভ নেই?'

'নেই, কেননা এ সন্তান অবাঞ্ছনীয়।'

'তার মানে—আপনি কী বলতে চান?' টানা ধনুকের মত আঁট হয়ে রইল হিমাংশু।

'বলতে চাই, বিয়ের আগে থেকেই লক্ষীপ সেনের সঙ্গে বনছায়ার চেনাজানা চলাফেরা ছিল। তাই তো লক্ষীপ সেন রক্ত দিয়েছে, টাকা দিয়েছে—এ ছেলে যে—'

'শাট আপ!' তুমুল গর্জে উঠল হিমাংশু: 'টেক মিন ওয়ার্ডস্—'

আশ্চর্য সংযমে খানিটা হজম করল সুবীর। কিন্তু কথাটা ফিরিয়ে নিল না। বললে, 'ছেলেটার দেহ তো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, নইলে ব্লাড টেস্ট করে বোঝা যেত হোয়াট ইজ হোয়াট।'

'থামুন।' হিমাংশু আবার চমকে উঠল: 'দশ মাস পরে প্রসব বেদনা শুরু হবার পর বুঝি এ সত্য টের পেলেন?'

'সত্য তার জীবনে কখন ও কত দেরি করে আসে কেউ বলতে পারে না।'

বাইরে যতই রাগ দেখাক অন্তরে তৃপ্তির স্পর্শ পেল হিমাংশু। যখন এই হীনতম সন্দেহ দেখা দিয়েছে তখন ওদের সম্পর্ক আর কোনোদিন জোড় খাবে না। আর এখন তো আর সন্দেহের কুয়াশা নয়, এখন তো প্রত্যক্ষের দ্বিপ্রহর।

'বেশ তো, আপনার স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তার বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের নালিশ করুন।'

চেয়ারে গা-হাত-পা ছেড়ে দিল সুবীর। বললে, 'আমার আর এ ব্যাপারে উৎসাহ নেই।'

'সে কী আপনি পাপকে শাসন করবেন না? শাস্তি দেবেন না?'

'শাস্তি কোথায়?' দিব্যি হাসল সুবীর: 'আমি ডিভোর্সের ডিক্রি পেলে, ওদের তো সুবিধে, ওরা তখন মজা করে বিয়ে করে বসবে।'

'তা, পরে বনছায়া যাকেই বিয়ে করুক, তাতে আপনার কী আসে যায়? আপনার আসে যায় যদি আপনি এক নষ্ট স্ত্রীর স্বামী বলে সমাজে পরিচিত থাকেন। লক্ষীপ সেন বনছায়াকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবে আর লোকে বলবে এই দেখ লক্ষীপ সেন সুবীর গুহর বউয়ের সঙ্গে লটাপটি খাচ্ছে।'

'কী মজা, তবু ওরা বিয়ে করতে পারবে না।' শব্দ করে হেসে উঠল সুবীর: 'সন্তান করতে পারবে না।'

'আপনিও তো আর বিয়ে করতে পারবেন না।'

'আমার বিয়ে!' দু'হাত তুলে অদৃষ্টের উদ্দেশে নমস্কার করল সুবীর।

'আপনার স্বাধীনতা খর্বিত হয়ে থাকবে এ আপনি বরদাস্ত করবেন?' স্পষ্ট ঘৃণায় মুখ বাঁকা করল হিমাংশু: 'আপনি কি মানুষ?'

'আদালত যাওয়া ভীষণ হাঙ্গামা। আমার ওসব পোষাবে না। যদি বনছায়া চায় তো ও বিচ্ছেদ করে নিক। আমার আপত্তি নেই।'

'না, আপনি অ্যাগ্রিভড্ পার্টি, অ্যাডালটারি আপনার পক্ষিটিভ চার্জ—আপনাকেই আদালতে যেতে হবে নইলে আপনাকে কেউ পুরুষ বলবে না, নপুংসক বলবে।'

'বলুক। লোকের বলায় কী হয়?' ঔদাস্যে উড়িয়ে দিতে চাইল সুবীর।

'না, একটা প্রেস্টিজের প্রশ্ন আছে, শুধু আপনার নয়, আমাদের কার্যের প্রেস্টিজ। এখন এ নিয়ে কথা উঠবে, তাতে যদি এ কথা চালু হয় আমরা আমাদের অফিসারের পজিশন ডিফিকেট করিনি, আমাদের অফিসর আসলে স্ত্রী-পীড়ক, বা, উলটো করে বললে, অন্যায়ের শাসনে অনিচ্ছুক, তা হলে সেটা বিশেষ প্রতিমধুর হবে না।'

ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়েও বাইরে প্রকাশ করল না সুবীর। বললে, 'আমাকে তবে কী করতে

'আপনাকে এই কার্ডটা দিচ্ছি—আমাদের কার্যের উচিত—ত্রিদিব ব্যানার্জি, তাঁর সঙ্গে সময়মত দেখা করুন। সব শুনে তিনিই আপনাকে ঠিকমত গ্যাডভাইস দেবেন। কোনো ভি লাগবে না, আমি তাঁকে ফোনে বলে রাখব।'

'ঠিক আছে।' হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিল সুবীর।

আর কোনো কথা নেই। আগেকার সেই অন্তরঙ্গ পরিবেশের উত্তাপও আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। ধ যে কি যাবে না দ্বিধা করছে, হিংশ্রান্ত রুক্ষস্বরে বলে বসল, 'এবার তবে যান।'

সুবীর উঠে পড়ল। দ্রুতপায়ে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

ক'পা এগিয়ে গেল হিমাংশু। ইচ্ছে হল পিছন থেকে ধাক্কা মেরে সুবীরকে ফেলে দেয় নিচে। ও কেমন গড়িয়ে পড়তে পড়তে থেমে যায় তাই দুচোখ ভরে দেখে।

শিকার এক শ্বাপদের গুহা থেকে বেরিয়ে আরেক শ্বাপদের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দেখা যাক তাকে এবার বাইরে খোলা মাঠে আনা যায় কিনা। সন্দীপ সেনের বিপক্ষে এখনো কোনো আইন নেই অধিকার নেই, তাকে পরাস্ত করা তত কঠিন হবে না। আসলে শিকারই যে অনাসক্ত।

আবার বেল টিপল হিমাংশু।

বেয়ারা ড্রিঙ্কস নিয়ে এল।

বস-এর পয়সায় মদ খাওয়া হল না—না হোক, সুবীর নিজের পয়সায়ই টানল দু পাত্র। রাত্রে যা খাবার তাও সামান্য খেয়ে নিল। তারপর একা হবার জন্য একা-একা বাড়ি ফিরল।

তার আর সংসার নেই। ঠাকুর-চাকর নেই। দুপুরের খাওয়া অফিস-ক্যান্টিনে খায়, রাতের খাওয়া হোটেলে। দু বেলার চা পাড়ার দোকানে, এখানে-ওখানে। যা পারে নিজেই ঝাঁটপাট দেয়, ধোয়াকাচা করে। বিছানার যা চেহারা, তাতে নিতান্ত মদ খায় বলেই ঘুমোনো চলে। বন্ধুবান্ধবেরা যখন আসে তখন তারা হাতে-হাতে কিছু সাহায্য করে! কিন্তু এখন মদ দিতে পারে না বলে তারাও আর আসে না। বিনিময়ে কিছু চাই না তবুও তোমার কাছে আসি এমন বন্ধু বুঝি হয় না।

সুবীরের এখন খুব টাকার টানাটানি। একার মাইনে তো, তায়আবার খরচের কোনো বিধি-পদ্ধতি নেই। ধুলোর মত সিগারেটের ধোঁয়ার মত উড়ে যাচ্ছে টাকা। মদেই চলে যাচ্ছে বেশি, তারপর ট্যাক্সিতে। বসকে বলে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোন একটা হোটেলে উঠে যাবে ভাবছে। এখন বসকে রাজি করানো।

আর কেউ না আসুক, একজন এসেছে। সে তার কবিতা।

বিছানায় বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কবিতা লিখছে সুবীর, বহু ধরণার কে কড়া নাড়ল।

ঘড়িতে দেখল রাত সাতে নটা।

এত রাতে তার কাছে কে এল? নিঃসঙ্গতা তো সঙ্গে থেকে এসেই বসে আছে, এ এল আবার কোন ব্যর্থতা!

শব্দটা উপেক্ষা করল সুধীর। ভাবল বুকের মধ্যেকার আর কোনো আওয়াজ শুনেছে।

আবার শব্দ হল। একটু বুঝি বা মরিয়া, বিলম্বিত।

দরজা খুলে কী না জানি দেখবে! তাকে না জানি দেখবে!

'এ কী, তুমি!' দু পা পিছিয়ে গেল সুধীর।

'তোমার জন্য জীবন মন কেমন করছিল। তাই তোমাকে দেখতে চলে এলাম।' লাবণি নিজেই দরজা বন্ধ করে ভিতরে ঢোকাবে এসে বসল।

মনোমোহন সেজেছে লাবণি। সচরাচর যেমন উৎকট সাজে তেমনি নয়, কেমন একটি কোমল মৃদুতা দিয়ে নিজেকে মণ্ডিত করেছে।

'তোমাকে আমি কী দিতে পারি?' সুধীর তাকাল হাসিমুখে।

'কিছু না। শুধু তোমার মুখের একটু হাসি, মিষ্টি দুটো কথা।'

'একটা বোতলে খানিকটা হুইস্কি আছে, দেব তোমাকে? খাবে?'

'না। মদ আমি ছেড়ে দিয়েছি।' চারদিকে তাকাল লাবণি: 'আমার এখন অমৃতের তৃষ্ণা।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে? চলোনা কোনো হোটেলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।'

'না, আর হোটেল নয়, তোমার বাড়িতে থাকব।'

'থাকবে?'

'উঃ, কী সুন্দর নির্জন তোমার বাড়ি।' দুচোখে অপার্থিব মোহ নিয়ে লাবণি বললে, 'আর কী সুন্দর তোমার যৌবন! আর কত সুন্দর না জানি তোমার ভালোবাসা!'

'আজ রাতে এখানে থাকো। গাড়িকে বলে দাও কাল সকালে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু রাতে অন্ধকারে আমরা যাব কোথায়?'

'সে এক গহন-গভীরের দেশে—যাব আনন্দধামে।' সুধীর লাবণির হাত চেপে ধরল: 'যখন এসেইছ যেওনা। থাকো।'

'আমাকে আগে বিয়ে করো, তারপর।'

'বিয়ে?'

'হ্যাঁ, বিয়েই তো খুঁজছি আমি, খুঁজছি আমার নটবর আনন্দকিশোরকে। নইলে টাকা দিয়ে পাওয়া কি পাওয়া? টাকায় যে বিক্রি হচ্ছি সে হচ্ছে কোনোখানে বিনা মূল্যে চিরদিনের জন্যে বন্দী হব বলে। তুমি আমার সেই বিনা দামের ঠিকাদার হবে?'

'হব।'

'বেশ, আজ যাই, আরেকদিন আসব। তোমার ঘরদোর সব গুছিয়ে দেব, বিছানা পরিপাটি করে পেতে দেব, লোকজন রেখে সংসার পত্তন করব।'

'আর তুমি—তুমি থাকবেনা?'

'আমি থাকব বলেই তো এত তোড়জোড়। কিন্তু আমাকে তুমি কীভাবে রাখবে? টাকায় না বিনাদামে?'

'বিনাদামে। ভালোবাসায়।'

'তাহলে বিয়ের দিন দেখ। এখন তো পথ পরিষ্কার হয়েছে, আর তবে বাধা কী। দেখ না কৃত্রিম মেয়ে কী অকৃত্রিম ভালোবাসতে পারে।' বলে উঠে পড়ে লাবণি নিজের থেকেই সুবীরকে পরিপূর্ণ চুম্বন করল।

একটা কবিতার মতই চলে গেল লাবণি।

মাতাল হলেও সুবীরের বুঝতে বাকি রইলনা এ এক ছলনার কারুকলা। চতুর্দিকে এ তো শুধু ছলনারই রাজপাট। হয় অল্পস্থায়ী নয় দীর্ঘস্থায়ী। এক মুহূর্তের চুম্বন, নয়, এক সন্ধ্যার প্রেমালাপ। হয় এক রাত্রির সম্ভোগ, নয়, কটি দিনের ঘর-সংসার। যেটুকু আসে সেটুকুই বহুমূল্য।

সকালে উঠে উকিলের কার্ডটা একবার নজর করে পড়ল সুবীর। ভাবল একবার ঘুরে এলে কেমন হয়?'

ত্রিদিববাবু সব শুনে বললেন, 'ম্যাজালটারির গ্রাউণ্ডে ডিভোর্স পাওয়া কঠিন হবে মনে হয়।'

'কেন?'

'ম্যাজালটারির প্রমাণ কী?'

'দুজনে এক বাড়িতে থাকে এই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

'খুব একটা সন্দেহের কারণ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সন্দেহই কিছু প্রমাণ নয়। দুজনে এক ঘরে থাকে এটা বেশ ভালো প্রমাণ—আর যদি দেখাতে পারেন দুজনে এক বিছানায় শোয় তা হলে আর কথা নেই, ডিক্রিমাত। এসব ব্যাপারে তো আই-উইটনেস থাকেনা, শুধু অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে ওরা দেখাবে বাড়ি দোতলা, উপরে থাকে সন্দীপ নিচে বনছায়া আর বনছায়া থাকে ভাড়াটে হিসেবে, রসিদ দেখাবে। বিশ্বাস্য নয় বটে, কিন্তু তাই বলে তাতে ম্যাজালটারি হবে না। তাছাড়া ওদের আলাদা হাঁড়ি, আর সন্দীপের ফ্ল্যাটে আপাতত কোনো তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও বনছায়ার ফ্ল্যাটে চব্বিশ ঘণ্টার ঠেক দাই আছে—'

'ও কিছু নয়।'

'তা জানি। কিন্তু অনুমান প্রমাণ হবে না।'

'তবে কী উপায়?' সুবীর প্রায় হতাশের মত চেঁচিয়ে উঠল।

'উপায় হচ্ছে রেস্টিটিউশান অফ কনযুগ্যাল রাইটস চাওয়া। স্ত্রী ফিরে পাবার মামলা করা। সেই মামলার ডিক্রির পর দুবছরের মধ্যে স্ত্রী ফেরত না এলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ।'

'কিন্তু যদি ফেরত আসে?'

'তা হলে স্ত্রী। নো ডিভোর্স।'

'কী সর্বনাশ!' সুবীর আবার আতঙ্ক দেখল: 'ও যেমন অঁাহাবাজ মেয়ে ডিক্রি ভেস্তে দিতে ঠিক সটান ফিরে আসবে।'

তাঁর বহুলঙ্ঘিত অভিজ্ঞতার স্তূপের উপর থেকে ত্রিদিববাবু বললেন, 'ও আর ফেরে না। যদি বা এমনিতে ফিরত, মামলার পোড়ানিতে আরো ঘুরে সরে যায়।'

'তাহলে আমি কী করব?'

'ভেবে দেখুন।'

(ক্রমশঃ)

ফিরে ফিরে চাই

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মুস্কিল হয়েছে নববর্ষ নিয়ে। ভারত-সরকার আমাদের বাংলার কলি সন-তারিখ বাতিল করে দিয়ে চৈত্রমাসের ২৩-এ নববর্ষের প্রথমদিন বলে ঘোষণা করেছেন। শকাব্দের গণনা বাঙালী মানছে না, তারা হিজরী থেকে পাওয়া মুসলমানী ফসলি অব্দ ও হিন্দুজ্যোতিষ এবং নটিক্যাল এলমেনাকের গণনা দিয়ে গাঁথা গোঁজামিল পঞ্জিকাকেই মেনে চলেছে। এবং তার সেকালে অজ্ঞাত। তাই ওপর প্রেসের সিদ্ধান্ত মতে নববর্ষ মেনে চলতো।

সেদিন ছিল বিকালে গোষ্টবিহার ও সন্ধ্যায় হালখাতা। আজ নগরের বাসিন্দার কাছে বোধহয় দুটো শব্দই অস্পষ্ট। আমাদের গ্রাম-জীবনের বড় অংশ অধিকার করে ছিল গরু—দুধের জন্য গাইগরু, চাষের জন্য বলদ—আর প্রজননের জন্য ছিল—ধর্মের ষাঁড়। শহরের রাস্তা দিয়ে ধর্মের ষাঁড়রা রাজকীয় চালে ঘুরে বেড়াত। লোকে একমুঠো খৈল বা খুদ মুখে ধরে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। 'ধর্মের ষাঁড়' সে-যুগে পিতা-পিতামহের শ্রাদ্ধের সময়ে উৎসর্গ করতো। সমাজ তাদের সেবার ভার নিত—সে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়াতো, আহার সংগ্রহ করতো। মাঝে মাঝে দেখেছি দুই পাড়ার দুই মাতব্বর ষাঁড়ের লড়াই—বোধহয় সীমান্ত পার হয়ে কোনো দুঃসাহসিক এসেছে—তাই লড়াই। শুনেছি বহু মূল্যবান ফসল ষাঁড় উৎসর্গ করা হচ্ছে শাস্ত্র নির্দেশ। অবশেষে একটি কাঠের গায়ে লক্ষ দিয়ে বৃষ এঁকে ও খোদাই করে নদীর ধারে পুঁতে এলো,—পূর্ব পুরুষরা ধন্য হয়ে গেলেন। এখন বৃষকাষ্ঠটুকুও কেউ চোকে না, পুরোহিতকে দক্ষিণা দিলেই সব শুদ্ধ হয়ে যায়!

বলছিলাম গোষ্টবিহারের কথা। এটা গোয়ালাদের উৎসব—সেকালে খুব জাঁকিয়ে হতো আমাদের পাড়ায়। সন্ধ্যার মুখে মিছিল বের হতো। গরুর গাড়ির উপর মযূরের মত বিরাট দেহ—বাঁশ, বাখারি দড়ায়, চাটাই দিয়ে তৈরী—তার উপর খবরের কাগজ এঁটে রঙের ছোপ দিয়ে ময়ূর আঁকা। ময়ূরের লম্বা লম্বা পালক, বাঁকা ঠোঁট সবই করা হয়েছে রঙ দিয়ে! সেই ময়ূরপঙ্খীর উপরে মাথায় বসে ওস্তাদ দল। গান গাইবে। সে গানের সঙ্গে বাজবে ঢোল আর কাঁসি। দুই পাড়ার দুটো দল—লালু কুমড়ো আমাদের পাড়ার মোড়ল—আজকালকার ভাষায় নেতা। লালু কুমড়োর বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে। বড় চাষী। বিরাট খড়ের ঘর পুড়ে গেল একদিন রাতে। তারপর লালু কুমড়ো চালা ঘরটায় খোলা দিয়ে তার উপর চুন বালির মাস্তারা লাগিয়ে পাকা করে ফেলে। তার সংসারে ছিল দুই ভাইপো কালিদাস ও হরিদাস যমদূতের মত চেহারা। তখনকার দিনে ভাল স্বাস্থ্যটা পুলিসের চোখে অপরাধ। তাই দুই ভাই জেল খাটে—কেন জানিনে। মনে পড়ছে বেঁটেখাটো কালো পাথর-কাটা দেহ কালিদাসকে কনেষ্টবল নিয়ে যাচ্ছে—হাতকড়া দিতে সাহস পাচ্ছে না—বলছে 'চলো, কোথায় নিয়ে যাবে।' সে স্বাস্থ্যের মানুষ লোপ পেয়েছে।

লালু কুমড়োর প্রতিদ্বন্দ্বী ওপাড়ার লোকদের ময়ূরপঙ্খী চলেছে—গান ধরেছে তারা, 'লালু

কুমড়ো ভাই, তোর মতো বোকা হাবড়া আর তো দেখি নাই'। মানুষকে বোকা হাবড়া বলতে পারলে গ্রাম্য রসিকতা সার্থক হয়েছে মনে করতো। পাকুরেদের দল তাই গানের কলি গাওয়ার পরেই দোয়ারেরা উচ্চস্বরে পদটা ধরতো, আর বায়েনরা ঢোল কাঁসি বাজিয়ে উচ্চতর আওয়াজ তুলতো। আমরা ভদ্রলোক। রাস্তায় নেমে জনতার সঙ্গে মিশে বা তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব দেখতে পারিনে—আমরা বাবার কাছে দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়, মা ভিতরের ঘরের মুক্ত জানলা ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করছেন, বৈঠকখানা বা বাইরের ঘরে এসে তার বড় জানালা দিয়ে যে দেখবেন—তাও সম্ভব হতো না। পর্দা আভিজাত্য।

সভ্যতার স্পর্শে গোষ্ঠলীলা আজ সে শহরে লুপ্ত। এখন গোয়ালাদের অবস্থা ভাল হয়েছে—অনেকেরই পাকা-বাড়ি। অধিকাংশই গোয়ালাগিরির হীন কার্য ছেড়ে 'শিক্ষিত' হয়েছে। স্বাধীন ব্যবসা থেকে মাসিক বেতন এখন কাম্য তাদের কাছে। ভাগ্যে শহরের উপকণ্ঠে উদ্বাস্তুরা এসে ঘর-বাড়ি তৈরী করেছে তাই এখন তারাই ভদ্রদের ঘরে দুধ জোগায়। আর আমাদের এই অঞ্চলে বাঙালীর খাদ্য দুধ-মাছের সরবরাহের ভার নিয়েছে উত্তর-ভারতের গোপজাতিরা, তাদের কেউ অফিসের পিওন, কেউ স্টেট বিজলী বাতির কর্মী, দুধ বিক্রী করে জমিজমা কিনে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। এখন যে শহরে বাস করি তার উপকণ্ঠে হিন্দু-মুসলমানের বাস। দুধের ব্যবসা কেউ করে না, কালেভদ্রে দুধ সময়ে সময়ে বিক্রী করে, স্থায়ী ব্যবসা কেউ চালায় না। কেন জানি না।

গোষ্ঠ বিহারের শোভাযাত্রা চলে গেল। এবার আমরা চললাম ছোট বাজারে—হালখাতার টাকা দিতে। সাধারণতঃ 'উঠনো' খাওয়াই রীতি ছিল। হাত-চিঠিতে প্রয়োজনীয় মালের ফর্দ করে দোকানে পাঠানো হতো, ভৃত্যে সে সব আনতো। মাসের শেষে টাকা দেওয়ার নিয়ম। দেখতাম বাকি পড়তো। ভাগিয়ে আসে ময়রীরা, নববর্ষের দিন বা নূতন খাতা খোলার দিন কিছু টাকা দেওয়া ছিল নিয়ম। তাই দাদা ও কাকাদের সঙ্গে আমিও বের হতাম। এর গূঢ় কারণ সেদিন দোকানে গেলেই জলখাবার দিত খেতে। শহরের রাস্তায় কখনো জল পড়তো না। সেদিন দোকানীরা জল দিয়ে রাস্তা কাদা করে দিত। রহমন মোল্লার দরির দোকান। তার ওখানে গেলে গোলাপজল ছাড়ি করে ছিটিয়ে দিতেন মাথায় গায়ে—বেশ মজা লাগতো। রহমন মোল্লা মুসলমান—তার খাতক সবই হিন্দু ভদ্রেরা। মুসলমান তো হিন্দুকে খাবার দিতে পারেন না—হিন্দুর জাত যাবে! তাই পাশেই হিন্দু বাঙালী ময়রার দোকানে বন্দোবস্ত করে রেখেছেন রহমন। যে আসছে সেখানে বসে খাচ্ছে। এক পেট মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরে কা'রা কোথায় কি খেয়েছে তাই নিয়ে চলতো আলোচনা। তখন মানুষের পয়সা ছিল কম, খাদ্য ছিল প্রচুর আর বোধহয় মনটাও ছিল উদার। আজকাল মনে হয় খাদ্যাভাবে মানুষের মনটাও হয়ে গিয়েছে আত্মকেন্দ্রিক।

শহরের বারোয়ারি উৎসবের মধ্যে সব থেকে মনে পড়ে ছোট বাজারের রাধাবল্লভ-তলার মেলা। রাধাবল্লভ ছিলেন স্থানীয় কাঁসারীদের ঠাকুর। একদা সমাজে কাঁসারীদের ছিল বিশিষ্ট স্থান। বাঙালী ঘরের নিত্যনৈমিত্তিক বাসনপত্র পূজার যাবতীয় তৈজসাদি তৈরী হতো এদের কারখানায়। কাঁসারি পাড়া কাঁসারিটোলা এবং কলকাতার 'কাঁসারিপাড়া' পাড়া এই শিল্পীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সে শিল্প আজ মৃত্যুমুখী। রুচির বদল হয়েছে—চীনামাটির পেয়ালা পিরীচ এবং স্টেনলেস স্টীলের বাসনপত্র ব্যবহার করছি। থালার কাঁসার বাসনে আধুনিক অতিথিদের ভোজ্য দেওয়ার রেওয়াজ লোপ পেয়েছে। উচ্চবিত্তদের কথা বাদ দিলাম। পিয়ের লোটি তাঁর 'ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ' নামে কলকাতা বই-এ যে কথা লিখেছিলেন, তা স্মরণ হচ্ছে—পাশ্চাত্য আসবাবের নিকৃষ্ট জিনিষ আমদানী করে ধনীরা তাঁদের ঘরবাড়ি দোকানে পরিণত করেছেন।

মধ্যবিত্তরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। নকলের নকল আসবাবপত্র বাসন-কোসন ঘরে এনে তুলছেন। মন্তব্যটি মর্মে মর্মে সত্য। তাদের নিম্নবিত্তেরা সংস্কার বশে বিবাহাদি সময়ে কাঁসা পিতলের বাসনপত্র যৌতুক বা দান সামগ্রীতে দিচ্ছে, তাই কিছু চাহিদা এখনো আছে। নকল স্টেনলেস স্টীল কাঁসার স্থান যখন দখল করবে, তখন এই কাঁসার শিল্প একেবারেই মিটে যাবে। এই বুনিয়াদী শিল্পীদের নূতন বাস্তুশিল্পে শিক্ষিত করবার কোনো প্রয়াস দেখতে পাচ্ছিনে প্রায়াকলে—সর্বত্র Cottage industry পরিণত হচ্ছে Small industry-তে। Power loom তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রাধাবল্লভ ঠাকুরের মন্দির—তার সামনেই নাটমন্দির। স্কুলে যাবার সময় রোজ মন্দিরের বারান্দায় মাথা ঠুকতাম—যেন দিনটা ভাল যায়! তবে পরীক্ষার কয়দিন প্রণাম করার সময়টা বোধহয় বেশি লাগতো। তখন 'ধনং দেহি যশং দেহি, রূপং দেহি,' বলার বয়স হয়নি, এবং তা যে ঠাকুর-দেবতার কাছে চাইতে হয় তাও বাপ-মা'র কাছে শুনি নি—তাই নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বলতাম, 'ঠাকুর অঙ্কের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিও।' রাধাবল্লভ অষ্টধাতুর মূর্তি, ড্যাব্-ড্যাবিয়ে তাকিয়ে থাকেন। অমন কাতর প্রার্থনা শুনতে পেলে কি আর অঙ্কের পরীক্ষায় ফেল্ করতাম! শুনতাম 'শূন্য' সঙ্কেতটা সংখ্যার পরে বসলে তিনি ধামে-ধরে তারি হন। আর আগে বসলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হন—আমার ভাগ্যে সংখ্যাহীন শূন্যতাই জুটতো।

ছোটবাজারের বারোয়ারি মেলা চলতো তিন দিন। মেলা বসতে শুরু করতো কয়দিন আগে থেকে। আর ভাঙতে সময় নিতো আরও বেশিদিন। বারোয়ারি পূজা বা উৎসব খুব প্রাচীন সংস্কার নয়, ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয় গুপ্তিপাড়ায়; সেখানে তখন ব্রাহ্মণদের প্রবল প্রতাপ। তাঁরা চিরাচরিত শাস্ত্রবিধি ছাড়া নূতন ধরণের দেবী পূজা প্রবর্তন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যারো বন্ধু বা ইয়ার মিলে চাঁদা সংগ্রহ করে 'জগদ্ধাত্রী' নামে নূতন দেবী-মূর্তি গড়ে পূজা শুরু করেন। বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে নানা রকমের গান বাজনা আনিয়ে সাতদিন মহাসমারোহে বারোয়ারি পূজা সম্পন্ন হলো। একালে এই বারোয়ারি পূজা প্রবর্তিত হয় শহরে গ্রামে নানা দেবতাকে কেন্দ্র করে।

আজ বারোয়ারির স্থান নিয়েই সার্বজনীন পূজা। এটার প্রবর্তক মহারাষ্ট্র। মহামান্য তিলক মারাঠীদের গণপতি পূজাকে কেন্দ্র করে নবহিন্দু জাতীয়তা ভাব উদ্রিক্ত করবার জন্য পুণানগরে এটি শুরু করেন গত শতাব্দীর শেষ ভাগে। আজ বাংলাদেশে সার্বজনীন দুর্গা পূজা, কালী পূজা সরস্বতী পূজা শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে—এদের প্রবর্তক স্থানীয় 'ক্লাব'। আজ পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব—অফিসে কারখানায় ক্লাব। এই ক্লাবে সদস্যদের চেষ্টায় 'সার্বজনীন' পূজা আজ রোগমুক্ত ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লাব হয়েছে মিলনভূমি। ক্লাব হয়েছে দলাদলির কেন্দ্র। এই ক্লাব থেকে পত্রিকা বের হয়। 'ফাংশন' হয়—সবের থিয়েটারও করেন সদস্যরা মিলে। বারোয়ারি ছিল সত্যকার সার্বজনীন পূজা। এখন বলগত সার্বজনীন পূজায়—'সর্বজনী' পূজা পান কি?

শহরের বারোয়ারি পূজার সময়ে রাস্তার ধারে মাটির পুতুল-সঙের প্রদর্শনী। সামাজিক দুর্নীতি প্রভৃতির বাঙ্গ দেখানো হতো এই পুতুল দিয়ে। দুই-একটি পুতুল রুচি বিরুদ্ধ হলেও বেশির ভাগ ছিল অন্যায় অবিচারের প্রতি কষাঘাত। স্থানীয় কুম্ভকারেরাই এসব গড়তো। তাদের আত্মীয় কুটুম্বরাই ছিলেন নায়করা মৃৎ-শিল্পী।

মেলার মধ্যে 'পুতুলনাচ' দেখতে খুব ভাল লাগতো। বাঁশের চাঁচ বা দরমা-আঁটা অন্তরালের পিছনে দাঁড়িয়ে লোকে পুতুল নাচাচ্ছে—রাজা রাণী এলেন, হাত নাড়তে নাড়তে—নারদ আসছেন ঢেঁকিতে। ঘাড়

দাড়ি নড়ছে মনে হয় যেন কথা বলছেন। মন্থরা কৈকেয়ীকে পরামর্শ দিচ্ছে—রুষ্টহার দিচ্ছেন রাণী—ওদিক কুঁজিকে নিগ্রহ করছেন—এই ধরণের সব। তখন তো সিনেমা ছিল না, তাই লোকে এই পুতুল নাচ দেখেই খুশী হতো। বৃদ্ধবয়সে বিদেশে উচ্চাঙ্গের পুতুল নাচ (Puppet show) দেখেছি। কিন্তু বাল্যকালের দেখা ছবিগুলি আজও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আজকাল এদেশেও পুতুল নাচের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বায়স্কোপ সিনেমা তখন অজ্ঞাত। মেলার মাঝে একটা তাঁবুতে ছবি দেখানো হচ্ছে শুনলাম। ভিতরে ঢুকে দেখি তাঁবুর তিনদিকে ছোটছোট ফোকরে লোকে কি দেখছে। দেখলাম যেন বিদেশের ছবি—একটা বাগানের ছবি—বড় বড় পাতাবাহারে গাছ—তার উপর জল পড়ছে! কিভাবে যে এই মায়া সৃষ্টি হচ্ছিল, তা আজও রহস্যময়।

অদূরে একটা ছাউনিতে খুব ভিড়। শুনলাম কলের গান। দেখি লোকে কানে ডাক্তারের স্টেথেস্কোপের মতো রবারের নল কানে দিয়ে বসে গান শুনছে। আমার দেখেই মনে হয় কয়েক মাস পূর্বে এটা তো আমাদের বাসায় দেখেছিলাম। দুই পরদেশী হিন্দুস্থানী এসেছিল আমাদের বাড়ি এই যন্ত্র নিয়ে। আমরা তো শুনলাম, পাড়ার লোকেও শুনলে কানে নল লাগিয়ে। তখন বলতো এই যন্ত্রকে ফোনো গ্রাফ—গোল-গোল রেকর্ড (Cylinder Record) ভরে দিয়ে কল চালিয়ে দিল, কানে নল লাগিয়ে শুনতে হতো। ডিস্ক রেকর্ড ও গ্রামোফোনের উপর বিরাট 'মেগাফোন'-এর প্রবর্তন পরে হয়, আজ সেই মেগাফোন-এর দরকার হয় না—বাক্সের ভিতর থেকেই শব্দ বেরিয়ে আসে।

বারোয়ারি মেলায় প্রথম দেখলাম 'চা' প্রচারের আয়োজন। সিংহল, আসাম, দার্জিলিঙে চায়ের বাগান খুলেছে সাহেবরা। কিন্তু চায়ের কথা জানে কে; বাজার গড়তে বা খরিদ্দার জোটাতে হবে তো! লোকে তো জানে যে 'চা' নামে-একটা পানীয় আছে। তাই সাহেব-কোম্পানীর এজেন্ট বা প্রচারকরা মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চা-এর গুণগান গেয়ে। "বিনাপয়সায় চা খেয়ে যাও—যাবার সময়ে এক পয়সা দিয়ে এক প্যাকেট শুকনো চা কিনে নাও, বাড়িতে গিয়ে গরম জলে দাও, কেবল লাগবে একটু দুধ-চিনি, তাও দেওয়া আছে চায়ের পাতার সঙ্গে—চার বাটি চা পাবে।" বৃটিশ শিল্পপতিদের প্রচার কর্ম কীভাবে সফল হয়েছে তা আজ সকলেরই জানা। সকালে এক পেয়ালা চা না-খেতে পেলে কাজেই মন যায় না, দেহ মনের জড়তা যায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেই। বাঙালি রিকশাওয়ালা—পাড়ায় থাকে—ভোরে ডাকলাম—বললে, 'চা খাইনি বাবু এখনো'। অদূরে ছিল অ-বাঙালী রিকশা-চালক—ইঙ্গিত মাত্র এসে গেল।

আমরা ছোটবেলা থেকে বাড়িতে চা খাওয়ার রেওয়াজ দেখেছি। শুনেছি আমার মা নাকি চা-এর অভ্যাস নিয়ে এসেছিলেন এ-বাড়িতে। তিনি ডেপুটির মেয়ে—তাই সেকালে তাদের বৃহত্তর বাঙলাদেশের যেখানে-সেখানে যখন-তখন হুকুম মতো ঘুরতে হতো। ডাক্তাররা বলতেন, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, চা খাবেন। আফিমও নাকি অরাসুর বলে প্রচার করেন পোর্তুগীজ বা চীন মুলুকে। চা-এর জল সিদ্ধ হতো লোহার কাৎলিতে, চা ভিজানো হতো এনামেলের চা-পাত্রে বা টী-পটে; চা খাওয়া হতো এনামেলের কাপ-এ। বাসনপত্রের তলায় কাগজে ছাপা থাকতো মেড্ ইন্ অষ্ট্রিয়া। আয়রমান হোক, দুইীতশ হোক, সবাই ব্রিটিশ-ভারতে তাদের শিল্প সামগ্রী প্রসারের জন্য ইংরেজিতে লিখতেন 'মেড্ ইন্…'। চীনামাটির বাসন আজকাল কী সুলভ হয়েছে। ফলকাতার ফুটপাতেও বিক্রী হতে দেখা যায়। কিন্তু সেকালে দুর্লভ ছিল এ সামগ্রী। কারণ 'চায়না ক্লে' আসতো ব্রিটেন থেকে। এই চীনামাটি বা কেওলিন মাটির পাত্র তৈরি করার বিদ্যা ছিল চীনাদের একচেটিয়া। তারপর সেই কাক বিদ্যা ক্রমোপে আমরা পায়। আমরা সেই বিদেশী

চীনামাটির পাত্র দেখেছি বড়লোকের বাড়িতে, সাহেবের কুঠিতে। আজ চাকা ঘুরে গেছে। ভারতে উৎকৃষ্ট চীনামাটির পাত্র তৈরী হচ্ছে—মহীশূরের ফ্যাক্টরির মাল দোকানে ঘরে ঘরে সাজানো দেখা যায়।

আমাদের সময়ে লিপটনের চা ছিল অভিজাত। লিপটনের চা-বাগিচা ছিল সিংহলে। লোকটি আসলে নাকি আইরিশ, জন্মস্থান স্কটদেশে, এনার্জন করে মার্কিন মুলুকে ও এশিয়ায় এসে সিংহলে চা, কফি কোকোর বাগান ক'রে লক্ষপতি হয়। চা আসতো টিনের কৌটায়, উপরে সবুজ কাগজ মোড়া, তাতে বাগানের ছাপা ছবি। সেকালে টিনের উপর নানারঙের ছবি ছাপাবার বিদ্যা আবিষ্কৃত হয় নি,—আজ কিন্তু বেটাল বক্স কোম্পানির প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়ে বহুল প্রচার লাভ করেছে। সেকাল একালে অনেক পার্থক্য। চা-এর দাম ছিল দশ-বারো আনা পাউণ্ড। উৎকৃষ্ট চা—চা খেয়ে বলতাম 'আঃ' কী আরাম।' রায়ানন্দ চাটুজ্যে তাঁর বর্ণপরিচয়ে আঃ শব্দের যে ছবি দেন সেটার কথা মনে হলে চা খেতে খেতে 'আঃ কী আরাম' বলতে গেলেই হেসে ফেলি। পেয়ালা যার হাতে ছিল, তাঁর রূপ বর্ণনা করলাম না। নামটি ছিল রামধন।

কণ্ঠে যার সুর খুঁজে না পায়, সে-ও গান শুনতে শুনতে মনে মনে গুনগুনিয়ে গায়। নৃত্য দেখে নাচতে ইচ্ছা করে। লোকলজ্জাভয়ে আসন ছাড়তে পারে না, তবে হাতে তাল দিয়ে, পা দুলিয়ে যতটা উপভোগ করা যায় তা করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রাজনারায়ণবাবুর হাত ধরে ভগবৎ ভক্তির গান শুনে নাচতে দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তো নাচতেন, নাচাতেন। অভিনয় করা ও অভিনয় দেখা—এ দুটো বোধহয় মানুষের জন্মগত ইচ্ছা। তাই ছোটবেলায় দেখতাম যাত্রা অভিনয়। খুব ছোট বেলার মনে পড়ছে, আমাদের বাড়িতে বাইরের উঠোনে যাত্রা হতো। রাজার এক মজেলের যাত্রার দল ছিল—তিনি অভিনয় দেখাতেন। রাস্তার উপর থেকে বিছিয়ে লোকজন বসে, আমরা বারান্দায় বসি। মা ভিতর-ঘরের ছোট জানলা ফাঁক করে দেখতেন। এইটুকু মনে আছে।

ছোটবাজারের রাধাবল্লভতলায় যাত্রা হতো—দেখতে যেতাম বাবার সঙ্গে। মনে আছে বিদ্যাসুন্দরের পালা হচ্ছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়ি বয়স হলে, বুদ্ধি হলে। কিন্তু যে বয়সে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দেখি, তার অর্থ বুঝবার বয়স হয়নি তখনও। রাজপুত্র সুন্দর যে সেজেছিল তার নাম শুনেছিলাম গগন—অতি সুপুরুষ—রাজপুত্র খাসা মানিয়েছিল। বিদ্যা যে সেজেছিল, ফুটফুটে একটি ছেলে। মালিনী সাজতো বৃদ্ধ অধিকারী—অসাধারণ শক্তিমান। গোঁফদাড়ি সব কামানো, তার উপর খানিকটা রঙ মাখা। কিছুই এসে যেতো না—সে পরিবেশে। অসম্ভবকে সম্ভব করার ছেলেমানুষী যা আজকাল থিয়েটারে উৎকট হয়ে উঠেছে, সেরকম বৈজ্ঞানিক বর্বরতা তখনো চালু হয়নি নাট্য-জগতে। মালিনী যখন হাততালি দিয়ে নেচে নেচে অযুরে বাগানের বর্ণনা দিত, মুগ্ধ হয়ে শুনতাম সে গান। সুন্দর কি অপরাধ করেছে বুঝিনি ভাল করে; এইটুকু বুঝলাম রাজকন্যা বিদ্যাকে ভালবেসেছে বলে রাজার হুকুমে সুন্দরকে বধ করা হবে। বড় হয়ে যখন কারণটা পড়লাম—তখন মনে হলো যেচারা বিদ্যা আধুনিক কালে জন্মালে অত হাঙ্গামায় পড়তে হতো না। সুন্দরকে বেঁধে সৈন্যরা নিয়ে এসেছে শ্মশানে কাটবার জন্য। কী উদ্বেগে দেখছি! দিনমানে অভিনয় হচ্ছে চারদিকে লোকারণ্য, সমস্ত ছাড়িয়ে গেছে অভিনয়।

যাত্রার সব থেকে বিরক্তিকর ছিল জুড়িদের গান। সাদা পাঞ্জাবি, চাপকান পরে অনেকগুলো সোনা ও রূপোর মেডেল বুলিয়ে আসরে আসেন। গুণী ছিলেন নিশ্চয়ই, গানও হয়তো ভালোই গাইতেন, সে-গান উপভোগ করবার সমঝদারও হয়তো ছিলেন—কিন্তু আমরা ভাবতাম থামলে বাঁচি। ভাল গান শুনে বাবাকে রুমালে টাকা বেঁধে 'পেলা' দিতে দেখতাম। তখন ওস্তাদরা আরও উৎসাহিত হয়ে কানে হাত

দিয়ে কত প্রকার বসরৎ করতেন। গল্প শুনতাম, এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট যাংলা যাত্রা দেখতে এসেছেন—যাঙলা বুঝতেন বলে তাঁর ধারণা। কারণ যাঙলায় সরকারী পরীক্ষা পাস করে যাঙলা দেশে যাহাল রয়েছেন। যাত্রা শুনছেন, এমন সময়ে ছুড়ির দল সামনে এসে গান ধরলো—সাহেব উত্যক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'মোক্তার লোককো বৈঠায়ে দেও।' তাঁর ধারণা হয়েছিল স্থানীয় আদালতে মোক্তারবাবুরা তাঁর চিত্ত বিনোদন করবার জন্ত গান ধরেছেন।

যাত্রার দলে থাকতো একদল ছোকরা ; তারা জরির বুটি-দেওয়া পোষাক পরে গান গাইতো। সে কালে তো মাইক্ ছিল না—তাই তীব্রস্বরে গান গায় আসর জমাবার জন্ত। পিছন থেকে বেহালাবাদক মাঝে মাঝে ছড়ের আঘাতে কী ইঙ্গিত করছে, আর বেচারারা আরও চিৎকার করছে—গলার শির ফুলে উঠছে। ছোকরাদের দেখে মনে হতো, ওদের কত মজা—কত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বড়ো হয়ে তাদের সম্বন্ধে গল্প পড়ে ও কাহিনী শুনে জেনেছিলাম কী দুঃসহ জীবন যাপন করতো এই হতভাগ্যরা। এদের মধ্যে দেখতে যারা সুন্দর তারা মেয়েদের ভূমিকায় নামতো। সখী সেজে নাচ্‌তো। আজকাল 'ফাঙ্কশনে' কত রকম নাচ দেখছি। সেকালে 'খেমটা' নাচ ছিল চলিত কথায় কেবল কোমর ঘুরে পাছা দুলিয়ে নাচ। বিদ্যা তার ঘরে সুন্দরের চিত্ত বিনোদনের জন্ত এইভাবে নৃত্য করেছিল।

বহুকাল পরে ধনী বন্ধুগৃহে বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে লখনৌ-এর বাঈজীদের নাচ দেখেছি। জয়পুরের মন্ত্রী-মহাশয়ের উদ্যান বাটিকায় উঁচুদরের নাচ দেখেছিলাম। শান্তিনিকেতনে দেখেছি বালা-সরস্বতীর নৃত্য, উদয়শঙ্কর সিম্‌কীর নৃত্য—বিদেশে দেখেছি ব্যালে নৃত্য।

রবিবার সকালে আসতো বোষ্টম-বোষ্টমী গ্রামের কোন আখড়া থেকে। যাযাবার বলে তীব্র মধুর কণ্ঠে গান গাইতো বোষ্টমী, দোহার দিত মোটা গলায় বোষ্টম। বোষ্টমীর ঠাসা শরীর, পরা কাপড় বেশ আঁট-সাঁট করে পরা, মাথার খোঁপা উপরে কুঁচি এঁটে বাঁধা। বোষ্টমের হাতে গোপীযন্ত্র, বোষ্টমীর হাতে খঞ্জনী, আঙুলে জড়িয়ে রেখেছে সুতো দিয়ে। এরা হরেকেষ্টের মতো গৃহী বোষ্টম নয়—আসলে এরা বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত। তীর্থ এদের ঘোষপাড়ায়। ঘোষপাড়ার কথা পরে বলব।

কার্তিক মাসে ভোরবেলা এক বোষ্টম করতাল বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম শুনিয়ে পথ দিয়ে চলে যেতো। প্রতিদিন শুনতে শুনতে ছড়ার অনেকটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের নামে যত পদাবলী, কীর্তনাদি রচিত হয়েছে, মনে হয় না আর কোনো হিন্দু অবতারের ভাগ্যে এত স্তুতিবাদ জুটেছে।

আমাদের শহরের কাছাকাছি তিনটি তীর্থস্থান—শান্তিপুর, আড়ংঘাটা ও ঘোষপাড়া। এসব জায়গার খবর পেতাম আমাদের 'ঝি' দুটির কাছ থেকে। দুটি নিকটের এক গ্রামের মেয়ে। সদ্‌গোপের বাল-বিধবা। আমাদের ঘরে থাকতো বাড়ির লোকের মতো—আমি যখন খুব ছোট, তখন সে কাজে আসে। মনে আছে তার পিঠে চড়ে তার গলা জড়িয়ে আছি, সে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। শান্তিপুরের রাসমেলা, আড়ংঘাটার যুগল-কিশোর ও ঘোষপাড়ার সতীমার স্থান। এমন কি ত্রিবেণীতে স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা তার কাছ থেকেই শুনতাম। থালায় ভাত মেখে দলা পাকিয়ে খাওয়ার, আর গল্প বলে বিশ্বাস্ত অবিশ্বাস্ত শতেক রকমের। শান্তিপুরের রাস, আড়া-রাস এদিকের লোকের প্রধান আকর্ষণ। আমি তো একবার যাই ছোটবেলায়। বাবার এক মক্কেল ছেলে গোঁসাই ছিলেন গোঁসাই বংশের। তাঁরই নিমন্ত্রণে সকলেই যাই। তখন চুনি পেরিয়ে সড়ক ধরে যেতে হতো। শান্তিপুর রেলপথ মিলিত হয়নি। খেয়া নৌকায় নদী পেরিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে—যাই শান্তিপুরে। গোঁসাই ঘোর বিষয়ী ; মামলা মোকদ্দমা

লেগেই থাকতো প্রজাদের সঙ্গে অথবা পরিষদের সঙ্গে –অদ্বৈতাচার্য বংশধররা সবাই গোঁসাই। গোঁসাই-এর বাড়ির দোতলায় বসে রাসযাত্রার মিছিল দেখি। সেটা বোধ হয় রাস-উৎসবের শেষ দিন। গোঁসাইদের নিজ নিজ ঘরের বিগ্রহগুলিকে চতুর্দোলায় তুলে শোভাযাত্রা চলেছে—সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ জনাকীর্ণ। তাঁরা রাস দেখবার জন্য বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে এমন-কি মণিপুর থেকেও বৈষ্ণবরা আসতো সেকালে। দুটি কিনে আনলো মাটির পুতুল—যার জন্য খ্যাত ছিল এ-অঞ্চল। বড় হয়ে শান্তিপুর গেছি—সম্মানীয় অতিথিরূপে, —পুরাতন গ্রামকে খুঁজে পেলাম না—দেখলাম আধুনিক শহর—পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা শহরের মতই।

স্কুলে পড়ি। নদীর ধারে, খেয়াঘাটের উপরেই স্কুল। পাশ দিয়ে রাস্তা—নদী পারাপারের খেয়াঘাট। দেখছি লোক রাসলীলা দেখতে চলেছে। তীর্থযাত্রীরা যখন ফিরতো তখনই তাদের দেখতাম উৎসুক নয়নে। শুনতাম যাত্রীদের মধ্যে কলেরা মহামারী রূপে দিয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির আদেশে শান্তিপুর থেকে যারা আসছে, তাদের কাউকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না; মোড়ে মোড়ে পুলিস দাঁড়িয়ে। চৌমাথায় কাঠের গুঁড়িতে আগুন দিয়ে গন্ধক পোড়ানো হচ্ছে—যেন কলেরার বীজাণু আকাশে ঘুরছে। যাত্রীরা ধোঁয়ার গন্ধে শোধন হবে! লোকা রেল-স্টেশনে যাচ্ছে—সেখান থেকে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে যাবে। শুনলাম স্টেশনের কাছে হোটেলে সব আশ্রয় নিয়েছে। সেখানেও কলেরা দেখা দিয়েছে। সত্য মিথ্যা কত কথা আতঙ্কিত শহরবাসীরা রটাচ্ছে। কোথা থেকে মা এসেছে সদ্য বিবাহিত পুত্র-পুত্রবধূকে নিয়ে হোটেলে ছেলেকে চিরতরে রেখে কিশোরী বধূকে বিধবার সাজ পরিয়ে দেশে ফিরেছে। বাপ-মাকে নিয়ে ছেলে এসেছে। বাপমাকে রেখে ছেলে একলা ফিরলো দেশে। সেকালে কলেরার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। ডাক্তারদের ধারণা ছিল ওলাওঠা রোগে জল খেতে দিতে নেই; অথচ দেহের সমস্ত জল নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে বলে রোগী জলের জন্য ছটফট করছে, তৃষ্ণার জলও পেলোনা, বাঁচতেও পারলো না। আজকাল গবর্ণমেণ্ট কঠোরভাবে যাত্রীদের জন্য বলবৎ, কলেরার ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা আবশ্যিক করায় তীর্থযাত্রে এইসব ব্যাধিতে মৃত্যুহার নেই বললেই চলে।

আড়ংঘাটায় যাইনি। দুটি যেতো যুগলকিশোরের মেলায়। জ্যৈষ্ঠমাসে মেলা। চুনী নদীর ধারে যুগলকিশোর মন্দির। দুটি প্রতিবৎসরই যেতো। মা বলতেন, ওখানে গিয়ে পুজো দিলে আর-জন্মে বিধবা জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়না। তাই সেখানে বিধবাদেরই ভিড় হয় বেশি। দুটিও সেইজন্য যায় যুগলকিশোর সম্বন্ধে কত গল্প শুনতাম। কে একজন তীর্থ করতে যায় উত্তর ভারতে। বৃন্দাবনে তৈরী করে পাথরের ঘোড়াই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি এনে নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্গীরা এলো বাংলা দেশে লুটতে; তারা হিন্দু হলেও লুণ্ঠনকারী। তাই ভয়ে লোকটি বিগ্রহ নিয়ে চলে আসেন চুপি নদীর তীরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি। সেই আত্মীয় বন্ধুর সাহায্যে মন্দির গড়া হয়। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুনলেন এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ আছেন একা। তাই তিনি রাধাকে এনে বসিয়ে দিলেন বামে। সেইথেকে নাম হল 'যুগলকিশোর'। শ্রীকৃষ্ণকে কিশোর বলা হয়েছে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও কাব্যে।

আরও কত গল্প শুনি। তার মধ্যে একটা কাহিনী আমাদের শহরের সঙ্গে যুক্ত। একবার যুগলকিশোরের ব্রহ্মত্রের ধানের গোলায় লাগে আগুন। পুরোহিত ভাবলেন সব নষ্ট হয়েছে, তাই সোনার গোলাটা বিক্রী করে দিলেন; কিনলেন রাধাঘাটের এক তিলি কৃষ্ণপত্তি। এই কৃষ্ণপত্তি শহরের পালচৌধুরী পরিবারের আদিপুরুষ। ধনে মানে গড়ে উঠলো এই শহর।

যুগল-কিশোর-কিশোরী বা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যুগ পূজার ইতিহাস আর আলোচনা করলাম না

স্মৃতিকথাই বলা যাক। মনে আছে ছুটি হলে থেকে আমার ও দাদার জন্য আনতো টিনের রেলগাড়ি, কালো রঙকরা ছড়ি বেঁধে টানলে চলে, তাই পেয়েই সেটি এঘর-ওঘর টেনে বেড়াই। ছোট বোন বীণার জন্য আনে মাটির পুতুল। সেসব পুতুল আর দেখা যায় না,—বাতিকগ্রস্ত কয়েকজন লোক এই সব সংগ্রহ করে ঘর ভরতি করে, তা দেখতে আসে শিল্প-রসিকরা। এখন প্লাষ্টিকের খেলনা পুতুল হাটে-বাজারে মেলায় দোকানে রাশিরাশি দেখা যায়।

বারো মাসে তেরো পার্বণের কথা দিয়ে সুরু করেছি এইপালা এবার। তাই কয়েকটা পূজা-পার্বণের কথাই বলা যাক্। বারোয়ারি ছাড়া আর সব পূজা পার্বণ ছিল নিজ নিজ পরিবারের কৃত্য দুর্গাপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা। যার যেমন বিত্ত সাধ্যমতো আয়োজন করতো। আমরা দেখতে যেতাম, প্রসাদ খেতাম এই পর্যন্ত। সরস্বতী পূজা হতো প্রত্যেক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু ঘরে। ভক্তিভরে নিষ্পন্ন হতো সেপূজা। তবে আমাদের সময়ে শহরে সরস্বতীর মূর্তি দেখেছি বলে মনে পড়ছেনা। বাড়িতে আমরা বই গুছিয়ে সুন্দর করে স্তূপ করি। কলমদোয়াত ধুয়ে-মুছে পূজার স্থলে রাখি। তখন তো ফাউণ্টেন পেন্ ছিল না। তাই ষ্টিলপেন ও নিব ধুয়ে রাখতাম। ভোরে খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে মাঠ থেকে দ্রোণ ও অন্যান্য ফুল তুলে আনতাম। পুরুত-ঠাকুর না আসা পর্যন্ত ঘর-বার করছি, কারণ 'অঞ্জলি' না দিয়ে তো কিছু মুখে দেবো না! পুরুত-ঠাকুর একের পর এক যজমানদের বাড়ি গিয়ে পুজো সেরে বেশ বেলা করে আসতেন। মা নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখতেন টুকরিতে ফুল ও নানারকম ফল। অঞ্জলি দিতাম মন্ত্র পড়ে। তারপর ফলাহার অর্থাৎ ফুল ভক্ষণ করে উপবাসের 'পারণ' হতো। শ্রীপঞ্চমীর পূর্বে ফুল খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু আজকাল? ফুলের ফুল ছাড়তে না ছাড়তে পাড়ার ছেলেরা, আর শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও টিবিয়ে সেই কাঁচাফুল নির্মূল করে। আর দেখি সরস্বতীকে নিয়ে বড়দের দেখাদেখি ছোটরাও 'সার্বজনীন' পূজা সুরু করেছে। একটী ক্লাবের নামে রসিদবহি ছাপিয়ে চাঁদা সংগ্রহে বের হয়ে পড়ে সারা শহরময় ঘুরে বেড়ায় চাঁদাচাঁদা করে। এই পূজা নিয়ে দলাদলি হয়, মারামারি এমনকি চাকু মারা, বোম ফাটানো, ক্র্যাকার ছোড়ার খবর খবরের কাগজে বের হয়।

একবার দক্ষিণ কলকাতার একটি বাসায় গেছি, সেদিন সরস্বতীর ভাসান বিছিল চলছে পথে। একটা বিরাট শোভাযাত্রা আসছে, বড় বড় দামামা জাতীয় বাদ্য বাজছে, কন্সার্ট পার্টি তাদের বিচিত্র সুরের যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে, দলের সবারই পরনে ট্রাউজার, মুখে সিগারেট—মাঝেমাঝে বলে ওঠে সরস্বতী মাই কী জয়! শুনলাম এরা বাজারের আলু বিক্রেতা।

কার্তিক পূজা ভদ্রলোকের বাড়ি হতো বলে মনে হচ্ছে না তো! কার্তিক বিয়ে করেন নি, সংসার পাতেন নি, অসুরদের সঙ্গে লড়াই করে অমর হয়েছেন। এই কুমারের পূজা করতেন শহরের 'মেয়েমানুষে' অর্থাৎ বারবনিতারা, সমাজের এরা বাসবদত্তা, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, কার্তিককে তাঁরা গড়তেন নিজেদের আদর্শ বাঙালী বাবু করে। গোলগাল, নাদুস-নুদুস মানুষটি, গোঁপ পাকিয়ে তোলা। খালি গা, কোঁচানো চাদর পাকিয়ে গলায় দেওয়া, ব্রাহ্মণের উপবীত আছে। কোঁচানো ধুতি, পায়ে কালো পাম্পসু। চড়েছেন ময়ূরে, হাতে আছে বন্দুকখান। এই অপরূপ বীরের পূজা করতেন বারবনিতারা যৌথভাবে, বিসর্জনের সময় তাঁরা যেতেন প্রতিমার সাথে সাথে। আশ্চর্য লাগে ভাবলে যে-কার্তিক দেব-সেনাপতি, যাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দেবতারা উন্মুখ হয়েছিলেন, তাঁর দশা বাঙালীর হাতে পড়ে এমন হলো কেন? মনে পড়ছে মহাশিল্পী নন্দলাল বসু অঙ্কিত কার্তিকের ছবিটি। (ক্রমশঃ)

আবার সেই জেল

বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

('পূর্ব প্রকাশিতের পর')

পাঁচ

আবার সেই জেল।

মনে পড়ে, সেই কোন্ যুগে, ১৯২৫ সালে, মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগদান করেছিলাম। একথা মেনে নিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম যে, হয়ত ছেলে জেলেই আমার জীবন কেটে যাবে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও বার বার সে চেষ্টা করেছিল। প্রথম দিকে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার মধ্যেই আমার কর্ম তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে, ঐ পরগণার যে কোন স্থানে স্বদেশী ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি, ডাকসুঠ, এমন কি, কোন হাঙ্গামা হলেই প্রায় ক্ষেত্রেই পুলিশ অন্যান্য স্থানের সঙ্গে একবার এসে হানা দিত কেয়টখালী গ্রামের পাদুলী বাড়ীতে। প্রথম তন্ন তন্ন করে তল্লাসী। অন্ততঃ বারোবার আমাদের বাড়ী তল্লাসী হয়েছে। কিন্তু কোন তল্লাসীতেই ঘোরতর আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তারপর আমার গ্রেপ্তার। ঢাকা শহরে কিছু ঘটলেও রেহাই পেতাম না। কোন কোনবার কোন্ ঘটনার জন্য গ্রেপ্তার হলাম, হদিসই করতে পারতাম না। বিক্রমপুরের এমনি গ্রামের স্বদেশী ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে আমার গ্রেপ্তার করা হোত, যে গ্রামে যাওয়া দূরে থাক, তার নামই শুনিনি। অনেক সময় একই ঘটনা সম্পর্কে একাধিক ছেলে গ্রেপ্তার হতে দেখেছি, সহকর্মী কেউ আমার পরিচিত নয়।

মাঝে মাঝে কোন ঘটনা ছাড়াই আমায় এবং আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হত। তাকে বলা হত প্রিভেনটিভ এ্যারেষ্ট। ঢাকা শহরে বড়লাট বা গভর্ণর অথবা পদস্থ সরকারী অফিসার কেউ আসবার কথা হলেই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই আমাদের জেলে ঢুকিয়ে রাখা হত এবং ছেড়ে দেয়া হত তিনি ঘুরে চলে যাবার পর।

মাত্রখানে শুধু একটাই মামলা খাড়া করতে পেরেছিল ইংরেজ সরকার। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯ ৪ সালে মামলা সুরু হয়ে শেষ হল ১৯০৬ সালে এবং আমাদের পাঁচজনের মধ্যে আমারই হল সর্বোচ্চ, সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। দীর্ঘকালের মেয়াদে আমার জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে পুলিশ যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিল, তখন আপীলে খালাস পেয়ে গেলাম। কিন্তু জেলের বাইরে আসতে পারলাম না। বিনা বিচারে রাজবন্দী করে আটকে রাখা হল।

হিসেব করে দেখেছি, এমনি করে ইংরেজের আমলে প্রায় বারো বৎসর আমায় জেলে কাটাতে হয়েছিল।

কিন্তু সে বন্দীরূপে।

১৯৭৬ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর, পরের বছর যখন দেশ স্বাধীন হল, তখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম, আর আমার জেলে যাবার কোন কারণ ঘটতে পারে না।

অলক্ষ্যে বসে বিধাতা বোধহয় হেসেছিলেন।

তাই আজ আবার ফিরে এলাম সেই জেলে। আর বন্দী হয়ে নয়, বন্দীদের অধিকর্ত্তা রূপে। বন্দী থাকাকালে কর্তৃপক্ষের কত না অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে মরিয়া হয়ে প্রতিবাদে বিক্ষোভমুখর হয়ে উঠেছি, কিন্তু ইংরেজ শাসনের হীমরোলার সেই ক্ষুদ্রাঙ্কুরকে দলে পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আর আজ? ঘটনাচক্রে আমার হাতেই জেল শাসনের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব এসে গেল।

মাঝে মাঝে মনে হয়, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতাপুরুষ কি আমার ললাটে 'জেল' কথাটি লিখে দিয়েছিলেন? জেলকে সর্ব্বপ্রকারে পাশ কাটাতে চাইলেও জেল আমায় নিষ্কৃতি দিল না।

কয়লি কিছুতেই আমায় ছাড়ল না।

ঘুরে ফিরে আবার সেই জেল।

পরদিন, অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের তেসরা এপ্রিল, কাঁটায় কাঁটায় যখন সকাল সাতটা, আমি তখন দমদম জেলের গেটে এসে পৌঁছলাম।

আবার সেই বন্দুকধারী রিজার্ভ গার্ডস ও তরবারিধারী চীফ হেড ওয়ার্ডারের গার্ড অব অনার।

লৌহকপাট খুলে গেল। স্যালুট করল গেটের সিপাই ও জমাদার। আমি অফিসে ঢুকলাম।

কিন্তু আমার অফিসের কর্মচারীরা কোথায়? একজনকেও দেখতে পেলাম না। এমন কি, চেয়ারে ঢুকে দেখি, রজনীবাবুও আসেননি। সে কি! ঐত, দুশো গজ দূরেই ডেপুটি সুপারের বাড়ী। আমি ঠিক সময়ে এসে গেলাম অন্ততঃ পনেরো মাইল দূরের টালিগঞ্জের চণ্ডীতলা থেকে আর রজনীবাবু দুশো গজ দূর থেকে আসতে পারলেন না?

সুপারিনটেনডেণ্ট মজুমদার এসে গেলেন সাড়ে সাতটার কিছু আগে। গেলাম তাঁর ঘরে। বললেন, আইন অনুযায়ী অফিস্ আওয়ার্স ফিক্স করবে সুপার। আমি সাতটা থেকে করেছি, কিন্তু কেউ সাতটায় আসেন না। আমি একা বসে থেকেছি। তাই এখন সাড়ে সাতটায় আসি। হেসে বললেন, আপনারও সাড়ে সাতটায় এলেই চলবে।

বললাম, আমি কিন্তু ভাবছি রোজ সাতটাতেই আসব। বেয়ারাবাবুরা রোজই এসে দেখবেন আমি একা বসে রয়েছি। এতে কি ওঁদের লজ্জা হবে না?

উদাস সুরে মন্তব্য করলেন, দেখুন যদি পারেন।

রজনীবাবু এলেন আটটায়ও পরে। ওঁকেও সব বলতেই বলে উঠলেন, আপনিও যেমন! কাগজে কলমে অমনি অনেক কিছুই লেখা থাকে। বলে হাসলেন, তারপর বললেন, নিয়ম হচ্ছে এ-এম এ এসে পি এম-এ যেতে হবে। তাই আটটা নাগাদ আটটায় এলেই এ-এম এ আসা হল, আর যাই বারোটায় দু'চার মিনিট পর, মানে পি-এম। ব্যস, চাকরি রক্ষা হয়ে গেল। তারপর আপিসে আদৌ এলেই-বা করবেন কি, কেউ আসে না।

আসে না কেন?

কি করে আসবে? রজনীবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, কেউ কেউ গেট রাইটার আর অনেকেই বাজার করে দিয়ে আসে। ছেলের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষ কেনার জন্য আইন অনুযায়ী যে 'বাজার সিপাই' আছে, তাকে দিয়েই ইচ্ছে করলে বাজারটা করিয়ে নেয়া যায় বটে, কিন্তু আমার পছন্দমত জিনিষ অপরে কখনও ঠিক ঠিক কিনতে পারবে? তারপর মশাই, কাঁচা টাকার ব্যাপার, নিজের ছেলেকেই বিশ্বাস করা কঠিন, তার আবার সিপাই! বুঝলেন না?

সব বুঝেও চুপ করে রজনীবাবুর ভাষণ শুনতে লাগলুম। উনি বলে উঠলেন, এই ত মশাই আমি, আমি নিজে বাজারেও যাই না, উঠিও বেশ ভোরেই। কিন্তু সকালে আমার যাই দুটোকে একটু পরিচর্যা না করে আসতে পারি না। পুরো আট সের দুধ খেয়ে মশাই। ওরাও এমনি জাতটা হয়ে পড়েছে যে, ওদের ব্রেকফাস্টের আয়না আমি যদি না দিই, তাহলে এমনি ঘ্যা ঘ্যা সুরু করে দেবে যে, বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আমি যদি গিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিই, তাহলেই শ্রীমতীরা চীৎকার থামাবেন, হাঁ বাড়বেন, আর হাসার ট্রাইক ব্রেক করবেন। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন।

বললাম, তাহলে ত দেখা যাচ্ছে সাইগুলো মানুষ হয়ে গেছে। কবে দেখবেন আপনার দেরী দেখে ওরা 'বোধের আয়না দিতে হবে' স্লোগান তুলে গটগট করে আপনার দোতলাতেই উঠে আসবে।

আরও হাসতে লাগলেন রজনীবাবু।

পার্টিশনের ওপারে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বোঝা গেল, কেরানীবাবুরা একে একে আসছেন ও খোসগল্প সুরু করেছেন।

ঘড়াই (কারা) বিভাগের কেষ্টবাবুকে যা করতে দেখেছিলাম, মনে পড়ল। সাড়ে দশটায় সবার অফিস সুরু হলেও কেষ্টবাবুর অফিস সুরু হত সাড়ে এগারোটায়। চেয়ারে বসেই ডান দিকের ড্রয়ার থেকে সযত্নে বার করবেন একখানা চটি খাতা। তারপর, নিজের ফাউন্টেনপেন দিয়ে নয়, সরকারী কলম সরকারী দোয়াতে ডুবিয়ে সেই চটি খাতার বাঁদিকার শ্রীশ্রীকালীমাতার নাম লিখে, খাতা ও কলম কপালে ছুঁইয়ে আবার সেই ড্রয়ারে সযত্নে রেখে দেবেন। তারপর বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কলমে সরকারী কালি শুকিয়ে যাবে, টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ বাড়তে থাকবে, কেষ্টবাবু নির্বিষ্ট মনে রেসের বই পড়ায় মনোযোগ করবেন অথবা কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক ও হুঙ্কার ছেড়ে থাকবেন। ঘেরাজ-ঘড়িতে পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টবাবু আবার বার করবেন সেই পবিত্র চটি-খাতাখানি, ভক্তি গদগদ চিত্তে আবার বাঁদিকার শ্রীশ্রীকালীমাতার নাম লিখে খাতা ও সরকারী কলমটি

কপালে ছুঁইয়ে মনে মনে হয়ত বলবেন, যাগো, তোমার অসীম করুণায় আর একটা দিন চাকরি রক্ষা হল।

কেষ্টবাবুকে আমি ভালভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম।

এখন মনে হচ্ছে, শুধু যে মাত্র যথাষ্ট (কারা) বিভাগেই একজন কেষ্টবাবু আছেন, তা নয়, অন্ততঃ দমদম সেন্ট্রাল জেলে আরও কেষ্টবাবুর সাক্ষাৎ মিলবে। কেষ্টবাবুরা ছড়িয়ে আছেন গভর্ণমেণ্টের যন্ত্রে যন্ত্রে! দমদম তার বাইরে নয়।

ওধার থেকে একজন করেদী কয়েকবার যাতায়াত করে দু তিন স্তূপ হিস্ট্রি টিকেট টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে গেল। হাফ ফুলস্ক্যাপ সাইজের কল-করা বোর্ডের মত শক্ত কাগজ, তাতে বন্দীর জেলে আসা থেকে সুরু করে মুক্তি পাওয়া পর্য্যন্ত প্রতিটি দিনের ঘটনা লেখা হয়। প্রথম, বন্দীর পরিচয়, তারপর কবে এল, কি কাজে লাগানো হল, কবে কার কাছে চিঠি লিখল, কবে কার কাছ থেকে চিঠি পেল, কবে কার সঙ্গে দেখা হল, কবে অসুস্থ হল, কবে সুস্থ হল, কবে কি অপরাধ করল, তার জন্য কি শাস্তি পেল, বৎসরের প্রতি কোয়ার্টারে কত রেমিশন পেল, আগের রেমিশন যোগ করে মোট কতদিন রেমিশন পেয়ে মেয়াদ কমে গেল ইত্যাদি যাবতীয় বিবরণ ওতে লেখা হয় বলেই ওর নাম হিস্ট্রি টিকিট। প্রত্যেক বন্দীর নামেই এমনি টিকেট আছে।

রজনী বাবু পকেট থেকে কলম বার করলেন। ছাই রংয়ের পার্কার ফিফ্‌টিওয়ান। কিন্তু একি, সেই মূল্যবান কাউন্টেন পেনটি সরকারী দোয়াতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সেই টিকেটগুলো এক এক করে টেনে নিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইনিশিয়েল্ করে ধাপায় ধপায় করে মেঝেতে ফেলতে লাগলেন।

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কলমে কালি ভরেননি বুঝি?

কি দরকার মশাই, উনিও হেসে জবাব দিলেন, সরকারী কাজে কেন নিজের কেনা কালি খরচ করতে যাই?

চুপ করে গেলাম। মনে মনে বললাম, ঐ কালি লেগে নিজের কলমটাই যে খরচ হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

একটু পর আবার জিজ্ঞেস করলাম, কোয়ার্টারলি রেমিশন দিচ্ছেন বুঝি? আপনি ত রেকমেণ্ড করবেন, গ্র্যাণ্ট করবেন সুপারিনটেনডেণ্ট। কিন্তু আপনি ত কিছু রেকমেণ্ড করছেন বলে মনে হচ্ছে না, ইনিশিয়্যাল করছেন—

ওসব করবার সময় কোথায়? টিকেট ফেলতে ফেলতে রজনী বাবু বললেন, ওসব ক্যাটগরী ওভারসিয়ারই লিখে দেয়, আমি শুধু ইনিশিয়েল করি—

কিন্তু ওভারসিয়ার যদি আক্রোশ বশে কাউকে কম রেমিশন দেয়?

দেয়, দিকগে। উনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন।

দেখতে দেখতে গন্ধমাদন সাফ হয়ে মেঝের ছিটিয়ে পড়ে রইল।

রজনীবাবু এবার উঠলেন। র‍্যাকেট থেকে মোটা শোলার টুপি টেনে নিলেন আর মোটা একগাছা বেতের মাথা-বাঁকানো লাঠি। বললেন, চলুন, ভেতরটা দেখে আসি। হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে বলে দিই। বদমাস আসামীগুলো যা পারে এমন অপকর্ম নেই। হয়ত একটা লোহার রড দিয়ে আপনার মাথায় ঘা মেরে বসবে। তখন মাথা বাঁচাবে এই মোটা টুপি। আর হাতে একটা লাঠিও থাকা ভাল। অবশ্য আপনার হাতে এমনি লাঠি মানাবেনা। তা হোক, তবুও নেবেন। ও শালাদের কি বিশ্বাস আছে?

প্রেসিডেন্সী জেলের মত হয়ত জেলেরও ম্যানুফ্যাকচারী ডিপার্টমেন্টের অধিকর্ত্তা ডেপুটি সুপার। ম্যানুফ্যাকচারী ডিপার্টমেন্ট, মানে শিল্প বিভাগে, শর্ট করে বলা হয়, এম-ডি। জেলের দ্বিতীয় ডিপার্টমেন্টটি সরাসরি সুপারের অধীনে। শর্ট করে বলা হয়, জি-ডি। ডেপুটি সুপার, বলাবাহুল্য, সুপারের অধীনে। তবে সাধারণতঃ সুপার ডেপুটি সুপারের বিভাগে হস্তক্ষেপ করেন না। হয়ত জেলের এই ডি-র ওয়ার্ক সেডগুলি, জেলীয় ভাষায় যাকে বলা হয়, চালি, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত। ডেপুটি সুপার প্রত্যহ এই এলাকায় রাউণ্ড দেন, সুপারও আসেন, তবে সপ্তাহে একদিন।

প্রথমেই আমরা গেলাম কাপার-চালি ও সাবান-চালিতে। একটা বড় শেডের মধ্যে দুই প্রান্তে দুটো শিল্প। রজনী বাবু বন্ধীদের বললেন, ইনি তোদের নতুন ডিপুটি সাহেব। মাসখানেক পর আমি রিটায়ার করছি, ইনি এলেন আমার জায়গায়। অবশ্যি ওরে অনেক দিন জেল খেটেছেন, ফাঁকি দিয়েছিস কি, ধরে ফেলবেন। এঁর সব জানা আছে।

সাবান-চালিতে প্রকাণ্ড চুল্লির ওপর বিশাল কড়াইতে সাবান জাল দেয়া হচ্ছে। একটি যুবক এগিয়ে এল, ইনি চাকুরে, সাবান তৈরী বিষয়ে দক্ষ। রজনীবাবু বললেন, সত্যবাবু, ইনি আপনাদের নতুন ডেপুটি সুপার। আজই জয়েন করলেন।

সত্যবাবু নমস্কার জানালেন। জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গের সবগুলো জেলে যত কাপড় কাচা সাবান প্রয়োজন, তা সবই হয়ত্বে তৈরী হয়। সত্যবাবু বললেন, বাজারের সাবানের মত অত সাদা না হলেও আমাদের সাবানের গুণ সে সব সাবানের চাইতে কম নয়। আর শিগগিরই আমরা সেন্টেড লিকুইড সোপও তৈরী করব। রেল কোম্পানী বহু টাকার লিকুইড সোপ কেনে। স্পেশাল অফিসার চেষ্টা করছেন অন্ততঃ তার খানিকটে যাতে আমরা পাই।

পাশের শেডে নারকেলের ছড়ি ও পাপোস্ চালি। নারকেলের ছিবড়ে পরিষ্কার করে তুলোর মত পেঁজা হয়। তারপর গুছি তৈরী করে হাতে বুনে বোনা হয় পাপোস। বাজারের পাপোসের চাইতে দাম কিছু বেশী হলেও দেখলাম, জিনিষগুলো ভারি, ঠাস-বোনা, টেকসই, দেখতেও সুন্দর।

তারপর কাঠ-চালিতে এলাম। কাঠ চালি, মানে ছুতোর মিস্ত্রীদের চালি। কাঠের বাক্স, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। বার্নিশও করা হচ্ছে। দেখলাম, একখানা খাটের রপ্তানী খাটাবার ট্রাংও তৈরী হচ্ছে। একজন বন্ধী এগিয়ে এসে সেলাম করতেই রজনীবাবু বললেন, ইনি তোদের নতুন ডেপুটী সাহেব, আমার জায়গায় এসেছেন।—আচ্ছা কচি, চারখানা রপ্তানীর ট্রাংক করতে আর কতদিন লাগাবি রে?

কচি সবিনয়ে বলল, আজ্ঞে, পুরোনো নকসা-কাটা খাটে ত আর 'পেলেন' খুঁটি মানাবে না, তাই 'টার্ন' করে তৈরী করতে সময় লাগছে—

তাই বলে কি এক মাস লাগাবি নাকি?

মাস কোথায় হুজুর, হাসিমুখে কচি প্রতিবাদ জানাল, আজকে ত মোটে সাত দিন। আর মাত্র একখানা বাকি। তারপর ওগুলো শিরীষ কাগজে ঘসে পরিষ্কার করে বার্নিশ করতে হবে—

তার মানেই আরও পাঁচ দিন, রজনীবাবু গজরাতে লাগলেন, মোট হল বারো দিন, বারো দিন, মানে বারো গুণে চব্বিশ টাকা, তারপর আবার বার্নিশের চার্জ—উফ্, দুই একটা তাকাত ইন্সিপার দেখছি।

কচি মাথা নীচু করে হাসতে লাগল।

'ইন্সিপার' জেলের ভাষা। ইনস্ট্রাক্টরকে বলা হয়। বন্ধীরা বলে অফিসারদেরও বলে থাকেন,

ইন্সিপেক্টরকে রোজকার খাটনি করতে হয় না। খাটনি করে, ইন্সিপেক্টর তত্ত্বাবধান করে।

রজনীবাবু বলতে লাগলেন, তারপর আবার যে ওভারসিয়ার, এটা রিপেয়ার ওয়ার্কে না ফেলে হয়ত বলে বসবে, নেকিং ওয়ার্ক তার মানেই এর একটা এষ্টিমেট করে বসবে, মানে, বাসিদের বাস, বয়লাতির উইয়ার এ্যাণ্ড টিয়ার, তারপর মাত্তে বারো টাকা প্রফিট—একটি পয়সাও ছাড়বে না। গভর্ণমেণ্টের পয়সা যেন ওর পয়সা, খরচা করলে লোকসান হয়ে যাবে ওর—

বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন। কম্বল চালি থেকে একজন ভদ্রলোককে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে কণ্ঠস্বর পালটে গেল, বলে উঠলেন, এই যে ওভারসিয়ারবাবু, কথার কথা শুনেছেন? পোলগুলো তৈরী করতে নাকি আরও পাঁচদিন লাগবে, তার মানে মোট বারো দিন—

তা ত স্যার, লাগবেই স্যার, ওভারসিয়ার বিনয়ে বিগলিত হয়ে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললেন, আর্নামেণ্টও পোল তৈরী করতে একটু সময় লাগবে, স্যার—

তারপর ত আবার ফিল্‌ড্‌ লেবার চার্জ করে বসবেন।

তা স্যার আর্নামেণ্টেড পোল—

আরে রাখুন মশাই, রজনীবাবু বললেন, আর্নামেণ্টেড, না প্লেন, কে তা দেখতে যাচ্ছে? প্লেন লিখবেন আর আনফিল্‌ড্‌ লেবার এক টাকা দৈনিক চার্জ করবেন। বুঝলেন?

বলে হেসে ফেললেন। ওভারসিয়ারের মুখেও অর্ধদোধক হাসির বিলিক দেখা গেল। বললেন, আর একটা কাজ করলেই ত আরও কমে যায় স্যার।

কি?

ওভারসিয়ার আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতেই রজনীবাবু বলে উঠলেন, আরে উনি নতুন ডেপুটি, আজই আমার চার্জগার জয়েন করলেন, নিজেদের লোক—

তাহলে একটা কাজ করা যাক স্যার, ওভারসিয়ারের কণ্ঠে দারুণ উৎসাহ, ওটা যদি স্যার, কোন চাঁদের নামে করা যায়, তাহলে কনসেসন রেটে হয়ে যাবে, আপনার নামে হলে মার্কেট রেটে স্যার, অনেক বেশী পড়বে স্যার—

ঠিক আছে, ওটা আমার অন্তারলি রামরতন সিং-এর নামে করে দেবেন। বলেই আমায় বললেন, চলুন মিঃ গাঙ্গুলী।

আমরা এগিয়ে চললাম। সামনেই লোহার জাল আঁটা একটা বেশ বড় শেডের মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় যন্ত্রপাতি দেখা গেল। ওখানে কেউ কাজ করে না দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রগুলিও অব্যবহৃত। জিজ্ঞেস করলাম, ওগুলো কিসের যন্ত্র?

আর বলেন কেন মশাই, রজনীবাবু হতাশাব্যাঞ্জক কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ওগুলো কম্বল তৈরীর যন্ত্রপাতি। গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা—পশ্চিমবঙ্গের দরওলো ছেলের জন্য এখানে কম্বল তৈরী করা হবে পাওয়ারলুমে। ঐ দেখুন না, পাঁচখানা তাঁতও বসানো হয়ে গেছে। ঐ দেখুন রোলিং মেসিন আর ওটা হচ্ছে ওয়াশিং মেসিন। তাঁতগুলো চলবে ইলেকট্রিসিটিতে, ঐ দেখুন, সেটাও রেডি। কিন্তু বয়লার কোথায়? বয়লার চলবে, তবে ত হবে টাস, টাসে কম্বল রোলিং হবে, ধোলাই হবে। আজ দু' বছর হয়ে গেল, সেই বয়লার আর আসছে না। মেসিনগুলোতে এখন মরচে ধরবার অবস্থা। এই হচ্ছে সরকারী কাজের নমুনা। দু' বছর

ঘরে এতগুলো টাকা আটকে থাকার জন্য অডিট অবজেকশন দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কাজের নামে দেখা নেই, অথচ শুনছি, ফ্যাক্টরী ম্যানেজারও নাকি শীগগিরই এসে যাচ্ছে। তিনি কি হাতে বেলিন চালাবেন?

জিজ্ঞেস করলাম, ঠিক কোন্ জায়গায় ফাইলটা আটকে আছে?

সে মশাই, আমি বলতে পারব না, রজনীবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, মাস-চারেক হল এসেছি, এক মাস পরই চলে যাব, আমার কি দরকার মশাই, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার? কখন ফ্যাক্টরীর ফাইল আমি ছুঁয়েও দেখিনি, দেখবও না। এবার আপনি এলেন, আপনি দেখবেন; গভর্ণমেণ্ট নড়ে না, আর আমি নড়ে কি করব?

ভাবছিলাম, জিজ্ঞেস করি, গভর্ণমেণ্ট একটা লোক নাকি যে সে নড়বে? সে ত একটা যন্ত্র, আপনি আমি তার অংশ, আমরা না চললে যন্ত্র চলবে কি করে?

গল্প করতে করতে আমরা মাঠ পেরিয়ে এলাম তাঁত-চালিতে। পঁচিশখানা তাঁত চালাচ্ছে বন্দীরা। বন্দীদের কুর্তা, জাজিম, গামছা, গায়ছা, বিছানার চাদর তৈরী করার সাদা থান তৈরী হয়। এ জেলের এবং এই জেলের অধীন সব জেলের বন্দীদের প্রয়োজন মেটানো হয়।

তারপর দড়ি-চালি। দড়ি, মানে শতরঞ্চি। হাতে বোনা হচ্ছে। তারপর দর্জি-চালি ও কাপড় ইস্ত্রি চালি পার হয়ে এলাম ম্যাচফ্যাক্টরী ডিপার্টমেণ্টের দোরে। রজনীবাবু দোর ক্লার্ককে বললেন, নৃপেন-বাবু, ইনি আপনাদের নতুন সেপুটি সুপার।

অফিসে ফিরে এসে টুপি ও লাঠি আবার র‍্যাকেটে ঝুলিয়ে রেখে চেয়ারে বসে পড়লেন রজনীবাবু। নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, যাক, আজকের চাকরি রক্ষা হয়ে গেল। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আর বারো তেরো মিনিট, তাহলেই ছুটি।

জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে?

উনি হেসে বললেন, মানে, পি-এম হয়ে যাবে। বারোটার পর এক মিনিট হলেও পি-এম, এক ঘণ্টা হলেও পি-এম। পি এম-এ বাড়ী গেলেই হল। তাহলে আর এক ঘণ্টা কেন থাকব? বারোটা হলেই লম্বা দোব।

বলে নিজের রসিকতায় হাসতে লাগলেন।

অকস্মাৎ বাইরে গলা খাঁকারির শব্দ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই ওভারসিয়ারের প্রবেশ।

হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, কচি স্যার বলছে, ষ্ট্যাণ্ডগুলো পাঁচ দিনেও হবে না স্যার, সাত দিন—

মানে? চটে উঠলেন রজনীবাবু, এ কি অসের মুলুক নাকি? গিয়ে বলুন, পাঁচ দিনে না পারলে ওর নামে রিপোর্ট হবে।

কি রিপোর্ট করব স্যার?

কাজ করে না, কাজে গাফিলতি, ইন্সিস্যার হবার অযোগ্য, রজনীবাবু গড় গড় করে বলে যেতে লাগলেন, চালিতে পাওয়া যায় না, সিপাইদের দিয়ে তৈরী করে নিয়ে পয়সা খায়, এই সব আর কি।

ওভারসিয়ার ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, রজনীবাবু ডাকলেন, শুনুন, শুনুন। উনি ফিরে আসতেই বললেন, শুধু ওসব লিখলে হবে না, বড় সাহেব আবার যেমন, হুকুম ওয়ার্নিং দিয়েই ছেড়ে দেবেন। তার চাইতে লিখে দেবেন, স্লোড্ টেম্পার। কাজে গাফিলতির কথা বলতে আপনাকে গালাগাল করেছে। বুঝলেন?

আবার সবিনয়ে ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে ওভারসিয়ার বেরিয়ে গেলেন।

রজনীবাবু বললেন, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল দিতে হয়, নইলে মামলা জেতা যাবে কেন, বুঝলেন না মিঃ গাঙ্গুলী?

বলেই হা হা করে হাসতে লাগলেন।

আমি হাসব, না কাঁদব, সহসা বুঝতে পারলাম না।

[ক্রমশঃ]

মানুষ আপনাকে যোগী, না ভোগী, না যোগী, কোন্ পরিচয়ে পরিচিত করিতে আনন্দবোধ করিতেছে, জগতের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তা কতদূর পর্য্যন্ত সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূর পর্য্যন্ত তাহার আপনার হইয়া উঠিল, ইহাই জানিবার জন্য সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা কৃত্রিম রচনা নহে, ইহা একটি জগৎ।

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা রঙ্গালয়ের নবরূপায়ণ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

• • কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অক্সফোর্ড মিশনের পাশে স্বর্গীয় বন্ধুবর গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বসতবাড়ী। এখন সে বাড়ীর কতক অংশ গ্রাস করেছে বিবেকানন্দ রোড। সেই অধুনা বিলুপ্ত অংশে ছিল আমাদের একটি বিখ্যাত ও বৃহৎ বৈঠক। গজেনবাবু সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু সাহিত্যের রসসায়রে ডুবে ডুবেই তিনি সারা জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন প্রাণের আনন্দে। তেমন বৈঠক সহরের আর কোন সাধারণ গৃহস্থের ভবনে কখনো বসেছে ব'লে জানিনা।

সে বৈঠককে কেবল সাহিত্য বৈঠক বললে ঠিক হবে না। কারণ প্রখ্যাত রাজনৈতিকের সঙ্গে সেখানে আলাপচারী করতেন ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ, প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, হাস্যরসিক ও অন্যান্য শ্রেণীর গুণীরাও—যেমন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী এবং শিশির কুমার ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজ পরিবেশক হরেন ঘোষ ও চিত্রকর চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি। সেখানে গিয়ে খুড়ি ছুঁয়ে আসেননি, শতমুখের এমন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সংখ্যা বেশী হবে না। সেই সঙ্গে গুণীসঙ্গ লাভ করত বহু গোলা লোকও অর্থাৎ যাদের বলে রামা-শ্যামা।

প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সকলের নাম এখানে করা সম্ভবপর নয়, কেবল পরলোকগত কয়েকজন জ্ঞানী ও গুণী শিল্পীর নাম করতে পারি—যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ বসু, দুর্গাদাসপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর), শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ও নজরুল ইসলাম প্রভৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ঐ সার্বজনীন আসরেই। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একদিন ঐ আসরকে ধন্য করে গিয়েছেন। এত শ্রেণীর জ্ঞানী ও গুণীকে আকর্ষণ করত যে ভাবগ্রাহী গজেনবাবুর সহৃদয়তা ও রসগ্রাহিতা, সে কথা না বললেও চলে। একদিনের আলাপেই গজেনবাবু সকলেরই আপনজন হয়ে পড়তেন। আমি তো ছিলুম সোদরোপম। সকলে বিদায়গ্রহণ করলে সুরু হত আমাদের প্রাণের কথা।

একদিন আসর ভেঙে গেছে, কেবল আমি গজেনবাবুর সঙ্গে গল্প করছি। রাত তখন সাড়ে দশটা হবে। এমন সময়ে গজেনবাবুর তৃতীয় সহোদর রামকৃষ্ণ ঘোষ একটি হৃষ্টপুষ্ট লোকের সঙ্গে

ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে বললেন, "হেমেনদা, এঁকে চেনেন? ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।"

ভদ্রলোককে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, "আমার নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী।"

লজ্জিত কণ্ঠে বললুম, "ক্ষমা করবেন। সেদিন ষ্টেজের উপরে নটসজ্জায় আপনার আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তাই চিনতে পারিনি।"

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, বুঝতে পেরেছি। আপনার লজ্জিত হবার কারণ নেই। খবরের কাগজে আপনার প্রশস্তিপূর্ণ নাট্য-সমালোচনা পাঠ করেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।"

তারপর কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর অভাবিত ভাবে প্রবেশ করলুম—না, প্রবেশ করতে বাধ্য হলুম যে বিচিত্র ও কাব্যসুষমার মধ্যে, তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। অভিনেতা বলবেন অভিনয়ের কথা, নট-নটীর কথা, নাটক ও রঙ্গালয়ের কথা, কিন্তু শিশিরকুমার সে ধার দিয়েই গেলেন না তিনি তুললেন সাহিত্যের কথা এবং এমন ভাবেই তুললেন যে জনতাবহুল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ট্রাম-ট্যাক্সির ঘুঘুরার ও গবেষণার বৈঠকের ইট-কাঠের পিঞ্জর ভুলে মানসবিহঙ্গ উড়ে গেল দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে দেশ-বিদেশ কাব্যবৃন্দাবনে। কথায় কথায় ক'রে ক'রে পড়তে লাগল কবিতাকণিকার পর কবিতাকণিকা—কখনো কীট্‌স্, শেলি, বাইরণ, কখনো সেক্সপিয়র ও মিল্‌টন, কখনো কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। সে অনুপম কণ্ঠের অপূর্ব আবৃত্তির সঙ্গে আমরাও যাদুকরী ক'রে বেড়াতে লাগলুম নানা কবির দ্বারে দ্বারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাই শুনলুম সবচেয়ে বেশী, বুঝলুম ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের কাব্যসায়রে নিয়মিত সন্তরণ-বিলাসে রীতিমত অভ্যস্ত।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে গতযুগের সমস্ত প্রধান কবির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র, তিনি ছিলেন একেবারেই অসাধারণ পুরুষ,—তাঁর কথোপকথনের ভাষাই ছিল কাব্যের ভাষা, তাঁর মুখের কথাই সৃষ্টি করত কবিতার পর কবিতা। কিন্তু অভিনেতা শিশিরকুমার কখনো কবিতা রচনা করেননি, কিন্তু কোন কবি-সাহিত্যিকের মুখেই আমি তাঁর মত অমন কাব্যরসধারা ঝরে পড়তে দেখিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ শক্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। মৃত্যুর মাস-তিনেক আগেও আমার বাড়ীতে এসে বিভিন্ন কবির কাব্য-কানন থেকে তিনি পুষ্প চয়ন করে আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। সমসাময়িক যুগের আর কোন অভিনেতারই এমন শক্তি ছিল না—প্রত্যেকেই কথাবার্তা কয়েছেন পেশাদার অভিনেতার মতই। কেউ কেউ তো ছিলেন একেবারেই নিরেট। অন্যতম প্রধান অভিনেতা, অথচ বাংলা শব্দের অর্থ জানেন না বিশ্বাস করুন আর না করুন এমন লোককেও আমি দেখেছি।

তারপর রামকৃষ্ণ অনুরোধ করলেন, "শিশির, তুমি রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চনদের তীরে' কবিতাটি একবার আবৃত্তি করে শোনাও না।"

রামকৃষ্ণ ছিলেন কলেজে শিশিরকুমারের সহপাঠী। সতীর্থের অনুরোধ রক্ষা করবার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে আরম্ভ করলেন—

"পঞ্চনদের তীরে,
বেণী পাকাইয়া শিরে

দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ—
নির্ভয়, নির্ভীক।"

আমরা নির্বাক মুখে বসে বসে সেই অদ্ভুত আবৃত্তি শ্রবণ করতে লাগলুম চিত্রার্পিতের মত। তারপর শেষের দিকে "গুরুজীর জয়" বলে যখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলেন তখন আমাদের সর্বাঙ্গে আগ্রত হল রোমাঞ্চ! আবৃত্তি সমাপ্ত হল। মানসচক্ষের সামনে এক ভয়াবহ ট্রাজেডির জীবন্ত ও করুণ ছবি নিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম আচ্ছন্নের মত।

এ-শ্রেণীর আবৃত্তি আগে কখনো শ্রবণ করিনি। শ্রেষ্ঠ কবিদের মুখে ভালো ভালো আবৃত্তি শুনেছি, কিন্তু সে সব শোনবার সময়ে চোখ বুজে থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ সেখানে প্রধানত কণ্ঠস্বর নিয়েই কারবার। কিন্তু সেদিন যা শুনলুম, চোখ বন্ধ থাকলে মাঠে মারা যেত তার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য। কারণ তা হচ্ছে আবৃত্তির সঙ্গে অভিনয়ের মিলন, কিংবা বলতে পারেন অভিনয়ের সঙ্গে আবৃত্তির মিলন।

এই রকম নাটকীয় আবৃত্তি করে পরে নাম কিনে গিয়েছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" ও "পুরাতন ভৃত্য" কবিতায়—কিন্তু শিশিরকুমারের আবৃত্তি ছিল উচ্চতর শ্রেণীর।

সেদিন শিশিরকুমারকে অভিনেতা বলে নয়, আমাদেরই শ্রেণীভুক্ত অন্যতম সাহিত্যিক বলেই গ্রহণ করলুম এবং সত্য সত্যই দিনকয়েক যেতে না যেতেই তিনি আমাদের "ভারতী"র দলের সঙ্গে মিলেমিশে একেবারে এক হয়ে গেলেন। প্রত্যহ সেখানে আসেন এবং সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা করেন আর বিভিন্ন কবির ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে কবিতাকণিকা ভেট দেন আসরের সকলকেই। সাহিত্য ও আর্টের এত খবর তিনি রাখতেন।

ইতিমধ্যে পার্শী ম্যাডান কোম্পানী সিনেমার বাজার পুরোপুরি দখল করে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে একটি নাট্য-সম্প্রদায় গঠন ক'রে সাধারণ থিয়েটারের বাজারও হাৎ করতে চাইলেন। ধনীবাবু, তারক পালিত ও তারাসুন্দরীর মত কোন উচ্চতর শ্রেণীর শিল্পীকে লাভ করতে না পারলেও ম্যাডানরা দমলেন না, ভাবলেন যে-ভাবে পার্শী থিয়েটার চালিয়ে তাঁরা পকেট ভারি করেছেন সেই ভাবেই চিত্তোত্তেজক রং চড়ানো নাটক সকল ক'রে এবং রকমকে সোয়াক ও সিন-সিনারির চটক দেখিয়ে বাঙালীদেরও ঠকিয়ে রূপটাদ পক্ষীকে আনায়াসে বন্দী করতে পারবেন। এলেন তাঁদের 'মহা-নাট্যকার' আগা হাসার, লিখে দিলেন তিনি এক 'মহা' নাটক, তা অনূদিত হয়ে নামধারণ করলে "অপরাধী কে?"

পার্শী মনোবৃত্তি যে বিপুল আয়োজন করতে পারে তার কোন ত্রুটীই হ'ল না।

কিন্তু বাঙালী নাট্যানুরাগীরা "রক্তকরবী" পড়ুন বা করুন শিবিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির স্বষ্ট নাটকীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছে, সুতরাং কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে গিয়ে পার্শী টোন শেলবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখালে না, রাত্রির পর রাত্রি "অপরাধী কে?" অভিনীত হ'তে লাগল প্রায় জনশূন্য প্রেক্ষাগারে। ম্যাডানরা তখন বোধ করি উপলব্ধি করতে পারলেন পার্শী দর্শক ও বাঙালী দর্শকের মধ্যে পার্থক্য আছে কতখানি।

কাপরে প'ড়ে ম্যাজানরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, তখন তাঁদের কোন পরম বাঙালী কর্মচারী এক মোক্ষম উপায় বাৎলে ছিলেন। কর্মচারীটির নাম আমি ঠিক জানি না কেউ বলেন তাঁদের ক্যাশেরাম্যান জ্যোতিষবাবু, কেউ বলেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—পরে যিনি হয়েছিলেন 'কালী-ফিল্মে'র মালিক। দুজনেই এখন পরলোকগত এবং দুজনেই ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু যথাসময়ে খবরটা তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

পরামর্শটা এই: নিয়ে আসুন সৌখীন নাট্যজগতের অধিতীয় নাট্যাচার্য্য এবং মেট্রোপলিট্যান কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। একে কলেজের ছাত্ররা তাঁর অভিনয় দেখার জন্যে উন্মুখ তার উপরে এত বড় শিক্ষিত অভিনেতা পেশাদার থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন শুনলে টিকিট কেনবার জন্যে দর্শকের দল কাতারে কাতারে জেগে পড়বে। কিন্তু খুব মোটা টাকার লোভ না দেখলে শিশিরবাবুকে রাজী করতে পারা যাবে না।

চমৎকার পরামর্শ। শিশিরকুমারও ম্যাজানদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তবে এ সম্মতির কারণ যে অর্থলোভ নয়, অল্পদিন পরেই সে সত্য বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলব যথাসময়েই।

সত্য সত্যই শিশিরকুমারের মত একজন উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেবেন শুনে সে সময়ে শিক্ষিত মহলের চারিদিকে হুলুস্থুল হৈ চৈ প'ড়ে গিয়েছিল এবং অনেকেই খবরটা বাজে গুজব ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন প্রচারপত্রে তাঁর নাম প্রকাশিত হ'ল, রুচি-বাগীশরা যারপরনাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তারপর নাটকের সমস্যা। শিশিরকুমার সে সমস্যাও সমাধান করলেন খুব সহজেই। গত যুগের নাট্যকারদের প্রধান ত্রয়ীর অন্যতম ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তাঁর হাতে একখানি অনভিনীত নাটক ছিল, নাম "আলমগীর"। শিশিরকুমার নির্বাচন করলেন সেই নাটকখানি।

এখানে একটুখানি ইতিহাস আছে। একদিন তাঁর থিয়েটারে ব'সে ব'সে বন্ধুবর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়ে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতন দেখতে একজন একাধারে চেহারার প্রাচীন ভদ্রলোক।

অপরেশবাবু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ক্ষীরোদবাবু, নাটক সঙ্গে এনেছেন তো?"

ক্ষীরোদবাবু প্রকাণ্ড এক পাণ্ডুলিপি বার করলেন।

খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে একথা সেকথা হ'ল। তারপর তিনি বললেন, "এইবার আমি নাটকখানা পড়ি?"

অপরেশবাবু বললেন, "পড়ুন।"

কিন্তু ক্ষীরোদবাবু কিছুই পড়লেন না, চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

কখনো রঙ্গালয়ের একজন প্রধান নাট্যকারের মুখে তাঁর নাটকপাঠ শ্রবণ করিনি, এইবারে সেই সুযোগ পেয়ে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলুম। কিন্তু ধন্যবাদটা দিয়েছিলুম তাড়াতাড়ি। কারণ সেটা বাজে খরচ হল।

ক্ষীরোদবাবু আবার বললেন, "এইবারে আমি নাটক পড়ব।" কিন্তু তবু পড়লেন না, চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

খানিক পরে আমার দিকে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে আমায় বললেন, "এইবারে আমি নাটক পাঠ করব।" তারপর আরম্ভ হল।

এতক্ষণ পরে আমার হুঁশ হ'ল। রঙ্গালয়ে রচনাচৌর্যের নানা কথা বাহির থেকে লোকমুখে শ্রবণ করতুম—ক্ষীরোদবাবু কি সেইজন্যেই আমার সামনে নাটক পাঠ করতে রাজী নন?

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাগত স্বরে বললুম, ক্ষীরোদবাবু, পাছে আপনার নাটকের ভাব বা প্লট চুরি করি, আপনি কি সেই ভয়েই আমার সামনে নাটক পড়তে চাইছেন না? জানবেন আমি থিয়েটারি নাট্যকার নই—আমি সাহিত্যিক, আর সাহিত্যক্ষেত্রের কেউ পরের লেখা শুনে চুরি করেনা।"

ক্ষীরোদবাবু সঙ্কুচিত কণ্ঠে বললেন, "রাগ করবেন না কি জানেন, আমি ভুক্তভোগী!"

জবাব না দিয়ে চলে আসতে আসতে দেখলুম, অপরেশবাবু মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

কিছুদিন পরে আবার অপরেশবাবুর সঙ্গে দেখা। ক্ষীরোদবাবুর নাটকের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন, "আমাদের পছন্দ হয় নি। নাটক ফেরত দিয়েছি।"

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেই অমনোনীত নাটকই হচ্ছে শিশিরকুমারের দ্বারা গৃহীত "আলমগীর"।

তারপর "আলমগীর" নাট্যাভিনয় দেখেও বুঝেছিলুম নাটকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তবু কেন তিনি এই নাটকখানি গ্রহণ করেছিলেন তাও বোঝা কঠিন হয় নি। নাটকখানি নিম্নশ্রেণীর হলেও আলমগীরের সুবৃহৎ ভূমিকায় আগাগোড়া অভিনয়ের কলাকৌশল দেখাবার সুযোগ আছে।

সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম আত্মপ্রকাশ ক'রে শিশিরকুমার যদি জনগণের চিত্ত অধিকার করতে না পারতেন, তাহলে কেবলই যে তাঁর পরাজয় হ'ত তা নয়, আপাতভাবে অল্পে নবযুগের শিক্ষিত দর্শকদেরও দুঃখ ও লজ্জার অবধি থাকত না।

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বাংলা রঙ্গালয়ের একান্ত ভক্ত। নবযুগের প্রতিভূ হয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার বাংলার সাধারণ নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন শুনে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তিনি নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তারাসুন্দরীর নাট্যপ্রতিভাকে সত্যেন্দ্রনাথ এতটা শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর উপরে একটি কবিতা রচনা করবেন ব'লে জানিয়েছিলেন।

এই কথা শুনে রুচিবাগীশ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় বিরক্ত হয়ে উঠলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মত উচ্চশ্রেণীর কবি বাংলা থিয়েটারের একটা অ্যাক্ট্রেসের উপরে কবিতা লিখবেন? আরে ছিঃ!

কিন্তু ব্রাহ্ম হলেও বিপিনচন্দ্রের মত ভারতবিখ্যাত নেতা যে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকায় তারাসুন্দরীর উপরে একটি সচিত্র প্রবন্ধে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছিলেন এটা বোধহয় চারুচন্দ্রের চোখে পড়ে নি।

কবিতা লেখা হয় নি। তার কারণ সত্যেন্দ্রনাথের আকস্মিক অকালমৃত্যু। কিছুকাল পরে অভিনেত্রী নীরদাবালার উপরে একটি কবিতা লিখে স্বর্গীয় কবি গিরিজাকুমার বসু সংসাহস প্রকাশ করেছিলেন।

তারপরে শিশিরকুমারের উপরে দুটি চমৎকার কবিতা রচনা করেছিলেন স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শিশিরকুমার আমেরিকা থেকে ফেরবার পর আমিও একটি

নাতিক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশ করেছিলুম। এ বিভাগে আর কোন কবির সাড়া পাওয়া যায়নি। কথাপ্রসঙ্গে অন্যদিকে এসে পড়েছি। ফিরে-ফিরতি ছিন্নসূত্র ধরা যাক্।

অনেক রাতে শিশিরকুমার যখন 'আলমগীরের' মহলা দিয়ে গজেনদার বৈঠকে ফিরে আসতেন, তখন দেখতুম তাঁর মুখ প্রফুল্ল নয়। দুতিন দিন এই ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে কারণ জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি বললেন, "মহলা সুবিধার হচ্ছে না। পুরাণো দলের যারা চাই, আমাকে অভিনয় শেখাতে দেখে যে তারা বেশ বিরক্ত হয়েছে, এটা তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কেবল চাকরীর মায়ায় আমাকে তারা সহ্য করছে। একমাত্র নৃপেন বসু আমার উপরে বিরক্ত নয়। তার উপরে আমার শিক্ষাপদ্ধতি ওরা গ্রহণ করতেও পারছে না—পুরাণো রীতি ওদের হাড়ে হাড়ে ব'সে গিয়েছে। প্রধান নারীভূমিকা কুসুমকুমারীর, সে কিন্তু কিছুতেই পুরাণো সুর আর পুরাণো ঢং ছাড়তে পারছে না। দেখে-শুনে আমি ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি, পাবলিক থিয়েটারে আমার দেখা দেওয়াটা শেষে প্রহসনে পরিণত না হয়, এই ভয় হচ্ছে।"

আমরা তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্যে বলতুম, "কোন ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রায়ই তাঁর সঙ্গে একটি যুবক আসত, সুন্দর তার দেহের গঠন ও মুখশ্রী। তাকে দেখিয়ে এক দিন তিনি বললেন, "এর নাম তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি হচ্ছে একেবারে আনকোরা অভিনেতা। এ কিন্তু আমার শিক্ষার মর্য্যাদা রাখতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে।

অবশেষে "আলমগীর" অভিনয়ের তারিখ ঘোষিত হ'ল—উনিশ শো একুশ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখে।

* * *

ডাঃ ক্রাঙ্কলিন তখন যুবক, দেখা করতে গেছেন ডাঃ মাখের-এর সঙ্গে।

কথাবার্তা হোল। এবার বিদায়ের পালা। বাড়ী থেকে বেরোবার জন্যে তাঁরা একটা দরু সংকীর্ণ দালান ঘরে এগোতে লাগলেন।

ডাঃ মাখের পেছনে আসছিলেন, হঠাৎ তিনি চীৎকার করে উঠলেন, নত হও, মাথা নীচু কর।

আগে অন্ধকারে ক্রাঙ্কলিন বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা, হঠাৎ একটা নীচু কড়িকাঠে মাথাটা ঠুকে গেল।

ডাঃ মাখের বললেন, তোমার বয়েস অল্প, সামনে পৃথিবীটা পড়ে আছে, একটু মাথা নীচু করে নম্রচিত্তে পথ চোলো, অনেক কঠিন আঘাত এড়াতে পারবে।

মঞ্চাভিনয়ে

শতবর্ষের পারিবারিক ঐতিহ্য

অনাথ উপাধ্যায়

১৭৫০ সালে ইংলণ্ডের ল্যাংকাশায়ার কাউন্টিতে রজার কেম্‌বল্‌ নামে এক প্রতিভাবান অভিনেতা ছিলেন যিনি পেশাদার মঞ্চাভিনয়ে শতবর্ষব্যাপী এক পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রষ্টারূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সাত ছেলেমেয়ে সকলেই একের পর এক পেশাদার মঞ্চে যোগ দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এমন সব নাটকের অভিনয় হয়েছে যাতে তাঁর দু' মেয়ে এবং তিন ছেলে এক সঙ্গে অভিনয় করেছেন। মঞ্চজগতে এমন দৃষ্টান্ত বোধ করি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অভিনেতা হিসাবে রজার তেমন বড়দরের ছিলেন না। কিন্তু অধ্যবসায় অধ্যবসায়ের গুণে তিনি পরবর্তী জীবনে থিয়েটার-ম্যানেজার রূপে যশ এবং অর্থ দুইই সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন।

বিবাহের পর রজার একটি প্রতিভাবান দল তৈরী করলেন এবং নানা গ্রাম ও নগরে সেই দল নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। কোন গ্রামে পৌঁছোবার আগে সেখানে একদল দূতী পাঠিয়ে দেওয়া হোত। তারা গ্রামের পথে পথে ঢোল বাজিয়ে জানাতো, রজার কেম্‌বলের থিয়েটার আসছে এই গ্রামে। শুধু তাই নয়, দর্শকদের জন্যে নানা উপহারের ব্যবস্থাও হোত। রজার ব্যবসার কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। কী রকম নাটক আর কী রকম অভিনয় গ্রামবাসী বা নগরবাসীদের খুশী করতে পারবে, এই নাড়ীজ্ঞান ছিল তাঁর পাকা। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তিনিই বেশ গুছিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

সন্তানাদি হোতে লাগল। প্রথমে মেয়ে, তারপর ছেলে, তারপর আবার দুই ছেলে, শেষে তিন এইভাবে রজারের সংসার বাড়তে লাগল।

ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই নাচে গানে অভিনয়ে পটুত্ব দেখাতে লাগল। দেখে শুনে রজার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন। নটনটীর জীবন যে কী অনিশ্চিত আর অনর্থকরী তা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতেন।

কিছুদিন পরে তাঁর দল ভেঙে গেল। তাঁকে অন্য থিয়েটারে সহকারী ম্যানেজারের চাকরি নিতে হল। অর্থ সংকট দেখা দিল।

তখন অনন্যোপায় হোয়ে তিনি তাঁর বড় মেয়ে সারাকে একটি পেশাদার মঞ্চে ভর্তি করে দিলেন। এই সারা কেম্‌বল্‌ উত্তর জীবনে সারা সিডন্‌সরূপে অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সারা সিডন্‌সকে বলা হয় ইংলণ্ডের সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা।

১৭৪৭ সালে বড় ছেলে জন ফিলিপের জন্ম। দশ বছর বয়সেই তিনি 'প্রথম চার্লস' নাটকে ভগ্নী সারার সঙ্গে মঞ্চে নেমেছিলেন এবং চমৎকার অভিনয় করে দর্শকদের বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে রজার কেম্‌বলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। তিনি বড় ছেলেকে মঞ্চ থেকে এনে পাদ্রীদের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

কিন্তু ছেলে পাদ্রী হবে না কিছুতেই। তার মন পড়ে আছে অভিনয়-মঞ্চে। জন ফিলিপ স্থির প্রতিজ্ঞ হলেন। অভিনেতা তাঁকে হতেই হবে!

সারার তখন খুব নাম, বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। তিনি একটি ভ্রাম্যমান দলে ভাইকে ভর্তি করে দিলেন এবং দলের কর্তাকে বলে দিলেন, তাঁর ভাইকে যেন নায়কের ভূমিকা দেওয়া হয়, অভিনেতা হিসাবে তাঁর ভাই কারুর চেয়ে কম নয়।

দলের অধিকারী সারার কথা রাখলেন। কিন্তু জন কিলিপ তরুণীর মান রাখতে পারলেন না। প্রথম প্রথম বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে লোক হাসালেন। দলের ভাগ্যও ছিল মন্দ। সেই দলের অভিনয়ে এত কম দর্শক আসতো যে মাসের খরচ উঠতো না,—অভিনেতারা মাইনে পেতো না। জন কিলিপ একজন বাড়ীওয়ালীর একটি ঘর নিয়ে থাকতেন। ভাড়ার দায়ে বাড়ীওয়ালী তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে না পেরে একদিন তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর জামা কাপড় নিয়ে চলে গেল।

সে দল ছেড়ে কিলিপ অন্য দলে যোগ দিলেন। কিন্তু সেখানেও সেই অবস্থা। তাঁর এই শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বাপ জানতে পারলেন না। কিলিপও তাঁর বাবাকে কিছু জানালেন না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, ভাগ্যের মুখ তিনি ফেরাবেনই।

ভাসতে ভাসতে গেলেন আয়ারল্যাণ্ডে। সেখানে গিয়ে ডাবলিনের এক বড় থিয়েটারে পরীক্ষা দিয়ে হ্যামলেটের ভূমিকায় নামলেন। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো সুপ্ত ক্ষমতার প্রকাশ ঘটল। হ্যামলেট রূপে জন কিলিপ এক রাত্রেই ডাবলিনের দর্শকমণ্ডলীকে জয় করলেন।

সেই সময়ে আবার তাঁর ভগ্নী সারাও দল নিয়ে এলেন আয়ারল্যাণ্ড সহরে। ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন হল। সারা ভাইকে নিজের দলে টেনে নিলেন। তারপর ভাই বোন মিলে নাটকের পর নাটকে অভিনয় ক'রে সারা আয়ারল্যাণ্ডকে তোলপাড় করে দিলেন। প্রভূত খ্যাতি পেলেন জন কিলিপ। আর সারা তো তখন যশের শিখরে।

লণ্ডনেও জন কিলিপের কৃতিত্বের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই সারা ডুরি লেন থিয়েটারে ফিরে এসে সহজেই তাঁর ভাইকে সেখানকার একজন নায়ক-অভিনেতারূপে নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা করতে পারলেন।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সারা লণ্ডন শহর ভাই আর ভগ্নীর প্রশংসায় মুখর হোয়ে উঠল। এমন কথাও শোনা যেতে লাগল, অভিনয় ক্ষমতায় জন কিলিপ সারা সিডন্স-এর চেয়ে বড়।

জন কিলিপ নিঃসন্দেহে একজন বড় অভিনেতা ছিলেন। যেমন সুঠাম দীর্ঘ চেহারা, তেমনি জোরালো মিষ্টি কণ্ঠস্বর, আর তেমনি ভাবভঙ্গী। কিন্তু তাহলেও তিনি সারার সমকক্ষ ছিলেন না। প্রয়োজনের মুহূর্তে সারার অভিনয়ে যে অনন্যসাধারণ দীপ্তি আর নাট্য নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটত, তা দেখা যায়নি জন কিলিপের কোন অভিনয়ে। দু'জনে যখন একই দৃশ্যে অভিনয় করতেন তখন চরম নাট্য মুহূর্ত স্বজনের সময়ে জন কিলিপ কৌশলে সারার উপর নির্ভর করতেন। ভাইবোনের সময়বোধও ছিল নিখুঁত। তাই তাঁদের যুগ্ম অভিনয়ও হোত যেমন প্রাণবন্ত তেমনি উচ্চ পর্যায়ের যা দেখে দর্শকরা বিহ্বল হোত, হাততালিতে ফেটে পড়ত।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত খেয়ালী চরিত্রের মানুষ ছিলেন জন কিলিপ। অল্পভাষী, লাজুক প্রকৃতি, কিন্তু রাগলে আর রক্ষা নেই।

একবার এক সহ-অভিনেতা তাঁর সম্বন্ধে কী এক বিরূপ মন্তব্য করেছিল। শুনে জন কিলিপ বললেন, কোন কথা নয়, আমি ওর সঙ্গে ডুয়েল লড়ব।

কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করা গেল না। শেষ পর্যন্ত ডুয়েল হোল। অবশ্য কেউই কারুকে তাক্ করে গুলী ছুঁড়লেন না। ফলে দু'জনের কেউই আহত হলেন না। মিটমাট হোয়ে গেল।

প্রেমের ব্যাপারেও সেইরকম খামখেয়ালী ভাব। প্রিসিলা নামে একটি সুন্দরী তরুণী তাঁর মনোহরণ করেছিল। কিন্তু কিছুতেই মেয়েটিকে তিনি মনের কথা বলতে পারছিলেন না। একদিন অভিনয় করতে করতে দেখলেন, প্রিসিলা উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অভিনয় শেষে তিনি প্রিসিলার কাছে গিয়ে রহস্যময় ভাবে বললেন, দেখ পল্, তুমি শিগগিরই আমার কাছ থেকে এমন একটা কথা শুনবে, যা শুনে হয়ত তুমি খুব অবাক হবে।

প্রিসিলা বুঝতে পারলেন না। তাঁর মাকে গিয়ে বললেন। মা ছিলেন বুদ্ধিমতী, বললেন, বুঝলে না! ও তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে। তুমি যেন মত দিতে দেরী কোরো না।

প্রিসিলা, বলছিলাম কি, যদি, তোমার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয় তাহলে বেশ হয়, না?

কয়েকদিন পরে রেঞ্জের এক ধারে প্রিসিলাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকবার থমকে অনেকবার বাক্য জড়িয়ে যাবার পর জন ফিলিপ তাঁর প্রেমাস্পদাকে জানালেন তাঁর মনের কথা।

এতবড় অভিনেতা, রেঞ্জের উপর যাঁর মুখে খৈ ফুটছে, প্রণয়িনীর সামনে দাঁড়িয়ে মনের কথা বলবার সময় তাঁর কি তোতলামি!

হেসে ফেললেন প্রিসিলা, বললেন, তা হয়!

জন ফিলিপ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, তাহলে তোমার আপত্তি নেই?

না। আপত্তি কিসের? বললেন প্রিসিলা!

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! যাই। সীনে ঢোকবার সময় বুঝি পেরিয়ে গেল। বলতে বলতে দৌড় দিলেন জন ফিলিপ!

বিবাহের পর দু'জনেই খুব সুখের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

জন ফিলিপ ষাট বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত অভিনয় করেছেন। শেষ জীবনে হাঁপানিতে ভুগেছিলেন অনেকদিন। ১৮২৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৭৯৩ সালের ২১শে এপ্রিল ড্রুরি লেন থিয়েটার যখন নবপর্যায়ে খোলা হয় তখন কেমবল পরিবারের তিনজন একসঙ্গে মঞ্চে নেমেছিলেন।

নবাগত ছিলেন চার্লস কেমবল। ১৭৭৫ সালে তাঁর জন্ম। দাদার চেয়ে কুড়ি বছরের আর জন ফিলিপের চেয়ে আঠারো বছরের ছোট ছিলেন তিনি। ম্যাকবেথ নাটকে ম্যালকমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম রাত্রেই এই প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতা দর্শকদের মন জয় করেন।

গম্ভীর ভূমিকার চেয়ে হাস্যরসের ভূমিকায় চার্লস-এর পারঙ্গমতা ছিল বেশি! তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিকায় অভিনয় করেই সন্তুষ্ট থাকতেন।"

কিছুদিন অভিনয় করবার পর চার্লস প্রথমে ড্রুরি লেন থিয়েটারে তারপর অন্য থিয়েটারে ম্যানেজারের কাজ করে তাঁর সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭৮৮ সালে ফ্রিকেন কেমবলের জন্ম। তিনিও অভিনেতার পেশা অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি অল্প দিনের মধ্যেই এত মোটা হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে ভূমিকা দেওয়াই শক্ত হত। কোন রকম প্যাড ব্যবহার না করেই তিনি স্থূলোদর ফল্‌স্টাফের ভূমিকায় নামতেন। বেশি অভিনয় তিনি করেন নি। জীবনের বেশি সময় এডিনবরা থিয়েটারের ম্যানেজার রূপে কাজ করেছেন। ১৮৭২ সালে তিনি মারা যান।

ভাইবোনদের মধ্যে এক তরুণী, জেন কেমবল (১৭৭৪-১৮৩০) কিন্তু মঞ্চে নেমে তেমন সুবিধা করতে

পারেন নি। অবশ্য কয়েকটা অভিনয় তাঁর খুব ভাল হয়েছিল। তিনিও অত্যন্ত মোটা ছিলেন। তিনি এক অভিনেতাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পাঁচটি ছেলে মেয়ে সকলেই মঞ্চে যোগদান করেছিল এবং যশ ও অর্থ পেয়েছিল।

সারার আর দুই ভগ্নী, ফ্রান্সেস (১৭৫৬-১৮১২) এবং এলিজাবেথ (১৭৬১-১৮০৬)—এঁরা দুজনেও মঞ্চাভিনয়কে পেশারূপে গ্রহণ করেছিলেন। অল্পদিন অভিনয় করে ফ্রান্সেস মঞ্চ পরিত্যাগ করেন। এলিজাবেথ তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর আর নয়নীয় আকৃতির জন্যে সর্বত্রই সমাদর পেয়েছিলেন। ইংলণ্ড থেকে তিনি আমেরিকা চলে যান এবং সেখানে অনেক টাকা রোজগার করেন। সেখানে তাঁর এমনি জনপ্রিয়তা হয়েছিল যে তিনি জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন।

চার্লস কেমবলের দুটি মেয়ে ছিল। বড় ফ্রান্সিস (১৮০৮-১৮৯০), ছোট অ্যাডিলেড (১৮১৪-১৮৭৯)।

ছোট মেয়ে অ্যাডিলেড অপেরা গায়িকারূপে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

বড় মেয়ে ফ্যানি কেমবল তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্যে আর মধুর কণ্ঠস্বরে প্রায় তাঁর জ্যাঠাইমার মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অবশ্য তাঁর অভিনয়-জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিন অভিনয় করবার পর তিনি পুরোপুরি গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন।

১৮২৯ সালে চার্লস কেমবল ঘোষণা করলেন, তাঁর মেয়ে ফ্যানি রোমিও জুলিয়েট নাটকে জুলিয়েটের ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন জানাবে।

কেমবল-পরিবারের মঞ্চ ঐতিহ্য তখন সারা দেশের কোথাও অবিদিত নেই। তারই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে তামাম লণ্ডন শহর রোমিও জুলিয়েটের অভিনয় দেখতে ভেঙে পড়ল।

ফ্যানির কিন্তু তখনো পর্যন্ত কোন মঞ্চ অভিজ্ঞতা হয়নি। বেচারা তখন একেবারে আনকোরা নতুন। নার্ভাস হোয়ে সাজঘরে বসে সে তো কেঁদেই আকুল! সেই বয়সেই মেয়েটি বুঝেছিল, তার কাছ থেকে দর্শক অনেক কিছু প্রত্যাশা করে, মস্তবড় তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য আর সুনাম এবং তারই সাফল্যের উপর সেই সুনাম আর ঐতিহ্য আজ নির্ভর করছে। তাই তার বিহ্বলতা স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মঞ্চে নেমেই কিন্তু ফ্যানির সব মানসিক জড়তা কেটে গেল। মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে এমন অপূর্ব অভিনয় করলেন যে, অভিনয় শেষে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিল বহুক্ষণধরে! তারপর প্রতি রাত্রেই হাউস ফুল। ফ্যানি কেমবলের নাম সবার মুখে। একটি মরশুমেই চার্লস কেমবল তাঁর পড়ন্ত অবস্থাকে ফিরিয়ে নিলেন।

ফ্যানির পরে কেমবল-পরিবারের আরও একজন, হেনরি কেমবল (১৮৪৮-১৯০৭) লণ্ডনের অভিনয়-জগতে একজন সুদক্ষ অভিনেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

১৭৫৩ সালে রবার্ট কেমবল মঞ্চাভিনয়ে যে পারিবারিক ঐতিহ্যের সূচনা করেছিলেন, ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনপুরুষ ধরে সেই ধারা প্রবহমান ছিল। সারা পৃথিবীর মঞ্চ ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই।

যে কাহিনী চিরকালের

ট্রেজার আইল্যাণ্ড : স্টিভেনসন

সুজন রায়

[স্কটল্যাণ্ড নিবাসী রবার্ট লুই স্টিভেনসনকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে গণ্য করা হয়। তিনি বহু উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। তার মধ্যে তাঁর 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' উপন্যাসটি সবচেয়ে বিখ্যাত। এই বইটি পৃথিবীর সকল ভাষাতে অনূদিত হয়েছে এবং সব দেশেই সমাদর লাভ করেছে। এটি মূলত একটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। কিন্তু লেখার গুণে কাহিনীটি ক্লাসিক-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।]

এক

সমুদ্রের ধারে একটি সরাইখানা। নিতান্ত সাধারণ ছোট পান্থশালা। মালিক নিজেই সরাইখানার কাজকর্ম দেখাশোনা করে। তাকে সাহায্য করে তার স্ত্রী এবং বার বছরের ছেলে জিম। কোন রকমে তাদের দিন চলে।

সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের লোকেরা তাদের ভালবাসে। সন্ধ্যার পর অনেকেই সরাইখানায় আসে, খায় দায়, গল্পগুজব করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই সরাইখানায় এসে উপস্থিত হল এক বৃদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন। তার পিছনে মুটিয়ার মাথায় প্রকাণ্ড একটা বাক্স।

বুড়ো এসে সরাইখানায় একটা ঘর নিল। ব্যস। তারপর দিনের পর দিন কেটে যায়, বুড়োর নড়বার নাম নেই। এখানেই যেন তার মৌরসী পাট্টা। যেমন তার রুক্ষ চেহারা, তেমনি উগ্র মেজাজ। লোকটা অনবরত মদ গিলতো, যখন তখন চিৎকার করে গান গাইত, যাকে তাকে ধরে ঘুষি দিত আর মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে গিয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে থাকতো। লোকটাকে সবাই যমের মত ভয় করত। কেবল সরাইখানার মালিকের ছেলে জিম্ ছিল তার প্রিয়পাত্র। প্রথম থেকেই জিমের উপর লোকটার প্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছিল। একমাত্র জিমই যখন তখন তার কাছে যেতো এবং সময় মতো তাকে খাবার দাবার দিত। অন্য কেউ তার কাছে ঘেঁষতো না।

প্রথম প্রথম লোকটা তার আহার এবং বাসস্থান বাবদ পাওনা নিয়মিত প্রত্যহ চুকিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কয়েকদিন পর থেকেই টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করল। সরাইখানার মালিক পাওনা চাইতে গেলে লোকটা এমনভাবে খিঁচিয়ে উঠে হুঙ্কার ছাড়তো যে মালিক বেচারা ভয়ে সরে পড়ত।

লোকটা জিমকে মাঝে মাঝে দু'এক পয়সা বকশিস দিত। বিনা কারণে অবশ্য দিত না। সে জিমকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিত। যখন সে স্নান করতে, খেতে বা বিশ্রাম করতে সরাইখানার ভিতর যেতো, তখন জিমের উপর ভার দিয়ে যেতো, একটা এক-পেয়ে খালাসী সরাইখানার দিকে আসছে কি না, তা দেখা এবং দেখা পেলেই তাকে খবর দেওয়া।

এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। জিমের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। একদিন সে মারা গেল।

জিম ছেলেমানুষ, তার মা শোকে কাতর, এদিকে ওই বুড়ো কাপ্তেন। যার দায় জিম এক পয়সা পেয়ে না। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হোয়ে উঠল।

সেই গ্রামে লিভ্‌জে নামে এক ডাক্তার ছিলেন। তিনি জিম এবং তার মায়ের দেখাশোনা করতেন। তিনি তাদের বিপদে সান্ত্বনা দিলেন, ভরসা দিলেন, যা হয় একটা উপায় তিনি তাদের জন্যে করে দেবেন, আশ্বাস দিলেন।

এমন সময় একদিন সরাইখানায় হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় একজন অন্ধ সরাইখানায় এসে হাজির হল। জিমকে বললে, আমায় এখুনি কাপ্তেনের কাছে নিয়ে চল।

জিম কিছুই জানতো না। সে তার হাত ধরে সরাইখানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে কাপ্তেনের ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিলে। কাপ্তেন তখন ঘুমুচ্ছিল। মানুষের সাড়া পেয়ে ঘুম থেকে উঠে অন্ধ লোকটাকে দেখেই কাপ্তেনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

অন্ধ লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে তার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়েই বেরিয়ে চলে গেল। বোঝা গেল, লোকটা সম্পূর্ণ অন্ধ নয়।

এদিকে কাপ্তেন সেই কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে আপনমনে বিড়বিড় করে কয়েকবার বললে, দশটা পর্যন্ত সময় আছে। দশটা পর্যন্ত! তাই তো! কি করা যায়।

এইভাবে বকতে বকতে সে জিমের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, এখনো সময় আছে। আমি ওদের হাত এড়াতে পারি। দশটা পর্যন্ত। শোন, তোমায় একটা কথা বলি।

এই বলে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে যেমন ঘর থেকে বেরুতে যাবে অমনি হঠাৎ টলে পড়ে গেল।

জিমের চিৎকারে জিমের মা এঘরে এলো। দু'জনে লোকটাকে তুলে বিছানায় শোয়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটার সর্ব শরীর তখন কাঠ। সে মরে গেছে।

দুই

ব্যাপার দেখে মা আর ছেলে দুজনেই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল।

কাপ্তেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জিম বুঝেছিল, তার ওই পেল্লায় সিন্দুকটার মধ্যে এমন কোন জিনিষ আছে যার উপর অনেকেরই লোভ।

জিম তার মাকে বললে, মা এক কাজ করি, সিন্দুকটার মধ্যে কি আছে, দেখি।

তার মা বললে, হ্যাঁ, আমাদের পাওনা তো অনেক হয়েছে, যদি সিন্দুকের ভিতর কিছু টাকা পাওয়া যায়। এই বেলা বরং ওটা খুলে দেখা যাক।

জিম বললে, মা, আর এক কাজ করি। ডাক্তার সাহেবকে খবর দি। তিনি থাকলে, পরে কোন গোল হবে না। তিনি তো আবার ম্যাজিসট্রেট, তাই তিনি থাকলে আমাদের সুবিধা হবে।

এই বলে জিম সরাইখানা থেকে বেরিয়ে একটি লোককে ডেকে তাকে দিয়ে ডাক্তার লিভ্‌জেকে খবর পাঠিয়ে দিলে যে সরাইখানায় একটা লোক মারা গেছে, তিনি যেন শিগগির একবার আসেন।

তারপর ফিরে এসে ভাগ্নেনের জামার পকেট থেকে সিন্দুকের চাবী বার করে সিন্দুকটা খুলে ফেলল। উপরে কতকগুলো নতুন পোষাক। তার নীচে কতকগুলো টুকিটাকি জিনিষ। তার তলায় একটা ছোট পুঁটলিতে অনেকগুলো গিনি আর অয়েল ক্লথ মড়ানো এক তাড়া কাগজপত্র। জিম বুঝলো, এই কাগজের বাণ্ডিলটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান। সে সেটা উঠিয়ে নিলে। তারপর মাকে বললে, চল, গিনির থলিটা নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি।

কিন্তু তার মা তাতে রাজী হল না। সে বললে, তাদের যা পাওনা তার চেয়ে এক আধলা বেশি নেবে না। তারা গরীব বটে কিন্তু চোর নয়। এই বলে জিমের মা তাদের পাওনার হিসাব করতে বসল।

এদিকে সরাইখানার বাইরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা। তখন মা আর ছেলে দুজনে ভয় পেয়ে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে পিছনকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং কিছুদূরে গিয়ে একটা ছোট পুলের তলায় আত্মগোপন করে রইল।

সরাইখানার সামনে তখন হৈ-হৈ রব উঠেছে। জিম ভিতরে আসবার আগে সামনের দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই অন্ধ লোকটার গলা শোনা গেল—দরজা ভেঙে ফেল, দরজা ভেঙে ফেল।

দরজা ভাঙতে তাদের বেশি সময় লাগল না। পুরনো নড়বড়ে দরজা, দু'চার ধাক্কাতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ভিতরে ঢুকে একজন বলে উঠল, এই যে বিল্, ঘরে পড়ে আছে।

অন্ধ লোকটা বললে, সিন্দুকটা কোথায়? সেটা দেখ।

একজন সিন্দুকের কাছে গিয়ে তার ডালা খুলে ভিতরকার জিনিষপত্র খানাতল্লাসী করে বললে, বক্সাটা নেই।

শুনেই অন্ধ লোকটা যেন ক্ষেপে গেল। সে অকথ্য ভাষায় তার সঙ্গীদের গালমন্দ করতে লাগল। শুনে তার সঙ্গীরাও রেগে গেল এবং দারুণ বচসা, সেই সঙ্গে মারামারি লেগে গেল।

এমন সময় পথের ধারে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। পুলিসের গাড়ী, লোকগুলো ভাবল, ম্যাজিস্ট্রেট আসছে। মুহূর্তে মারামারি থেমে গেল, তারপর লোকগুলো যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

অন্ধ লোকটা কিন্তু পালাতে পারল না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হবার জন্যে সে যেমন ছুটে যাবে অমনি গাড়ীটা তার ঘাড়ে এসে পড়ল।

কতকগুলো পুলিশ আসছিল সেই গাড়ীতে। তারা নেমে প্রথমে অন্ধলোকটার মৃতদেহ পথের ধারে সরিয়ে রাখল, তারপর সরাইখানায় ঢুকে বিলের মৃতদেহ দেখে সেটাকেও বাইরে বার করে আনল।

জিম তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়ে সে তাদের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে চলল। যে কাগজপত্রগুলো সে পেয়েছিল সেগুলো নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে জিম সেগুলো ডাক্তারের হাতে দিতে মনস্থ করল।

জানা গেল, ডাক্তার লিভ্‌সে অমিদারের বৈঠকখানায় বসে গল্প করছেন। জিম সোজা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বিলের মৃত্যু, ডাকাতদের বাড়ী আক্রমণ প্রভৃতি সকল কথা খুলে বলল এবং সেই কাগজের মোড়কটা ডাক্তারের হাতে দিল।

ডাক্তার পুলিশদের বললেন, তোমরা মৃতদেহ দু'টোর ব্যবস্থা করগে আর জিমের বাড়ীতে পাহারা বসাও। ডাকাতরা আবার আসতে পারে।

পুলিশের দল চলে গেল। ডাক্তার আর জমিদার তখন আগ্রহের সঙ্গে কাগজের মোড়কটা খুললেন। তার ভিতর থেকে বেরুলো একটা ম্যাপ। সেই সঙ্গে একটা দ্বীপের ভিতরকার একটি রত্ন গুহার নির্দেশ আঁকা। দ্বীপটি সমুদ্রের কোন্ জায়গায় অবস্থিত তারও নির্দেশ রয়েছে সেই ম্যাপে। দেখে ডাক্তার আর জমিদারের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

কাপ্তেন ফ্লিন্ট্ নামে এক জলদস্যু ছিল। বহু জাহাজ লুটপাট করে কাপ্তেন ফ্লিন্ট্ অনেক ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিল। মারা যাবার সময়ে সে সেই সব ধনরত্ন একটা অজানা দ্বীপের এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই দ্বীপটা যে কোথায় তা তার সাঙ্গপাঙ্গরা বা অন্য কেউ জানতে পারেনি। শুধু একটা ম্যাপে সেই দ্বীপ এবং সেখানকার রত্নগুহার অবস্থান আঁকা ছিল। কাপ্তেন ফ্লিন্ট্ মারা যাবার পর সেই ম্যাপটা কাপ্তেন বিন্স্-এর হাতে পড়ে। সেই ম্যাপ নিয়ে সে জিমদের সরাইখানায় আসে এবং সেখানে হঠাৎ মারা পড়ে। কাপ্তেন ফ্লিন্টের অনুচরবর্গ সেই ম্যাপ উদ্ধার করতেই সরাইখানায় হানা দিয়েছিল। কিন্তু ম্যাপটা তারা পেল না। ম্যাপ গিয়ে পড়ল ডাক্তারের হাতে।

ম্যাপটা দেখে ডাক্তার আর জমিদার দু'জনেই মহা উত্তেজিত হলেন। তখনই স্থির হ'ল জমিদার মশায় ব্রিস্টলে গিয়ে একটি জাহাজ ঠিক করবেন এবং ডাক্তার এখানে থেকে অভিযানের সকল ব্যবস্থা করবার দিকে নজর রেখেন। ঠিক হ'ল জিমও তাঁদের সঙ্গে যাবে।

যদিও ব্যাপারটা তাঁরা খুব গোপন রাখবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন কিন্তু ব্রিস্টলে পৌঁছবার পরেই জমিদারের অসাবধানতার ফলে অনেকেই জেনে গেল, তাঁরা বিখ্যাত জলদস্যু কাপ্তেন ফ্লিন্টের গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানে যাচ্ছেন।

তার ফল হ'ল এই যে সরাইখানায় যারা হানা দিয়েছিল তারও খবরটা জানতে পারলো এবং তারা সকলে ভাল মানুষ সেজে চাকর বেয়ারার ছদ্মবেশে এসে জমিদার মশায়ের জাহাজে চাকরি নিল।

সেই দলে ছিল একজন একপেয়ে লোক। তার নাম জন সিলভার। যুদ্ধে গিয়ে নাকি তার একটা পা কাটা গিয়েছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আর তার ব্যবহারে জমিদার এবং জাহাজের কাপ্তেন দু'জনেই মহাখুসী। জন সিলভারের মত আদবকায়দা দুরস্ত ভাল লোক বুঝি এ পৃথিবীতে আর নেই।

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে কাপ্তেন বিন্স সরাইখানায় পৌঁছে জিমকে একটা একপেয়ে খালাসীর কথা বলেছিল। সেই লোকটাই এই একপেয়ে খালাসী এবং দলের সর্দার।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল। খবর পেয়ে জিমকে নিয়ে ডাক্তার সিলভে ব্রিস্টলে গেলেন। তারপর একটা ভাল দিন দেখে যাত্রা আরম্ভ হ'ল।

তিন

জাহাজ যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে সেই সময় একদিন জিম ঘটনাচক্রে জন সিলভারের আসল মতলব জানতে পারল।

সেদিন গোটাকতক আপেলের দরকার হয়। জিম ডেকের উপর গিয়ে আপেলের পিপায় উঁকি দিয়ে দেখল, ফলগুলো একেবারে তলায় পড়ে রয়েছে। সে তখন পিপার মধ্যে নেমে ভাল ভাল আপেলগুলো বাছতে লাগল।

এমন সময় জন সিলভার তার দলের লোকদের নিয়ে সেখানে এলো এবং কেউ কোথাও নেই দেখে সেইখানে বসেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

পিপার মধ্যে বসে তাদের কথা শুনে জিম আতংকে বিহ্বল হ'ল। জন সিলভার তাহলে আসলে একজন ডাকাত-সর্দার! এরাও চলেছে গুপ্তধনের সন্ধানে আর এরা ডাক্তার এবং জমিদারকে মারবার ষড়যন্ত্র করছে! কী সর্বনাশ!

সিলভার এবং তার দলের লোকজন সেখান থেকে চলে যাবার পর জিম পিপা থেকে বেরিয়ে ডাক্তার এবং জমিদারের কাছে গিয়ে জন সিলভারের কথাবার্তাগুলো জানালো।

শুনে তাঁরা তো স্তম্ভিত! কী করা যায়? তাঁরা জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নানা আলোচনার পর স্থির হ'ল, এখন চুপ করে থাকা যাক, দ্বীপে পৌঁছে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

যথাসময়ে দ্বীপের কাছে এসে জাহাজ নোঙর ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে সিলভারের দল তীরে নামবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। কাপ্তেনও তাদের কিছুক্ষণের জন্যে দ্বীপে বেড়িয়ে আসবার অনুমতি দিলেন।

তিন চার জন ছাড়া তারা সকলেই নেমে গেল। সেই সঙ্গে অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হোয়ে জিমও তাদের সঙ্গে ডাঙায় এসে অন্যদিকে উধাও হ'ল।

খানিকক্ষণ এধার ওধার ঘুরে এক জায়গায় এসে জিম সিলভারের গলার আওয়াজ পেয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল, টম্ নামে একটা জাহাজের খালাসীর সঙ্গে সিলভারের ঝগড়া লেগেছে। বোঝা গেল টম তাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজী নয়। যখন সে বললে যে জাহাজে ফিরে গিয়ে সে কর্তাদের সব কথা বলে দেবে তখন সিলভার রাগে উন্মত্ত হোয়ে তাকে খুন করে ফেলল। চোখের সামনে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিম অন্য দিকে দৌড় দিল।

কিছুদূরে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। আতংকে তার সর্ব শরীর কাঁপতে লাগল। তার সামনে দাঁড়িয়ে ও কে? মানুষ না অপদেবতা? কালো রং, বাঁকড়া চুল, এক মুখ গোঁফদাড়ি, পরণে শতছিন্ন চলচলে পোষাক। কে এ?

লোকটা কিন্তু সত্যিই ভূত নয়। তার নাম বেন্‌গান্।

বেন্‌গান্ এক সময় ডাকাত ছিল। জলদস্যুদের মধ্যে প্রথা আছে, দলের মধ্যে কেউ কোন অপরাধ করলে অপরাধীকে কোন নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেই রকম কোন একটা কারণেই তার দলের লোকরা বৃদ্ধ বেন্‌গানকে এই দ্বীপে বছর দুই আগে ফেলে চলে গিছল।

প্রথমে দু'জনেই দু'জনকে দেখে খুব ভয় পেয়েছিল। তারপর জিম খানিকটা সাহসের সঙ্গে বেন্‌গানের সঙ্গে আলাপ করল। কথাবার্তা বলে জিম বুঝলো লোকটি ভাল এবং বহুদিন সে কোন ভাল খাবার পায়নি বনের ফলপাকড় লতা পাতা খেয়েই জীবন ধারণ করে আসছে। জিম ধরা পরলে হোয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের দিকে চলল। কিন্তু তীরে এসে জাহাজে পৌঁছানো সম্ভব হলনা। হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে তারা থমকে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ভীষণ গোলমাল শুরু হোয়ে গেছে।

চার

জিম জাহাজ থেকে চলে যাবার পর কাপ্তেন, ডাক্তার এবং জমিদার পরামর্শ করে ঠিক করলেন

দ্বীপটা একবার দেখে আসা দরকার। সিলভারের দলের যে ক'জন লোক জাহাজে ছিল তাদের উপর কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করে তাঁরা চুপি চুপি দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

দ্বীপের মধ্যে একটা সুরক্ষিত স্থান ছিল। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি আর তক্তা দিয়ে ঘেরা যেন ছোটখাটো একটা দুর্গ। বোধ হয় কাপ্তেন ফ্লিন্ট্-ই এই দুর্গ বানিয়েছিল। আস্তানাটা দেখে তাঁরা স্থির করলেন খাবার দাবার আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই খানেই ঘাঁটি করতে হবে।

জাহাজে ফিরে এসে একটা নৌকা করে তাঁরা জিনিষপত্র চালান দিতে লাগলেন। তারপর স্থির হল, এবার তাঁরা সকলেই জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে চলে যাবেন। জিমকে না দেখতে পেয়ে তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তবে তাঁদের আশা ছিল, জিম দ্বীপের মধ্যেই আছে এবং দ্বীপে পৌঁছে তাঁরা জিমকে খুঁজে পাবেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থা সহজ হল না। সিলভারের লোকজন যারা জাহাজে ছিল তারা তাঁদের মতলব বুঝতে পেরে, যেমন তাঁরা দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন অমনি জাহাজের উপর থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

আর ওদিকে বন্দুকের শব্দ পেয়ে সিলভারের দলও তীরে এসে জমায়েৎ হল। সমূহ বিপদ। যাকে বলে, জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, সেই অবস্থা।

যাই হোক, কোন রকমে খানিকটা ঘুরে নৌকো ভিড়িয়ে তাঁরা অক্ষত অবস্থায় দুর্গে পৌঁছলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত লড়াই আরম্ভ হোয়ে গেল। দু'একজন জখমও হল।

জিম আর বেন্‌গান ইতিমধ্যে ছুটতে ছুটতে সেই দিকেই এসে পড়েছিল এবং নিজেদের দলের লোক দেখে তাদের সঙ্গে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

পাঁচ

প্রায় তিনমাস ধরে লড়াই চলল। দু' পক্ষেরই কয়েকজন হতাহত হল।

ইতিমধ্যে সিলভার চালাকি করে একটা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, কোন রকমে ছলচাতুরির দ্বারা গুপ্তগুহার স্থানটা সংগ্রহ করা। কিন্তু কাপ্তেন তাকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন আবার লড়াই চলল। কয়েকদিন দু'তরফ থেকেই গুলি বিনিময় হল। তারপর চুপচাপ।

ডাক্তারের দল দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ। সিলভারের দল বনের মধ্যে।

ক্রমে দুর্গের মধ্যে খাবারের অনটন দেখা দিল। কেমন করে কি উপায়ে আহার সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তায় সকলে যখন ব্যাকুল তখন জিম এক অসমসাহসিক কাজ করল। সে একা চুপি চুপি দুর্গ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গেল। কোন রকমে জাহাজে পৌঁছে সেখানকার ভাঁড়ার থেকে রসদ সংগ্রহ করে আনাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে জিম দেখল, তাদের পুরনো ডিঙিটা ডাঙায় তোলা রয়েছে। সে অতিকষ্টে সেটা জলে নামিয়ে তার উপর চড়ে জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

জাহাজের উপর কোন সাড়া শব্দ নেই। সিলভারের লোকগুলো গেল কোথায়? জিম জাহাজের পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে জাহাজের উপর উঠল।

কোথাও কেউ নেই? একি! অদূরে ডেকের উপর তিন চার জন লোক বেহুঁশ হোয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল তারা সিলভারের দলের লোক। তাদের এ অবস্থা হল কেমন করে? জিম দেখল তাদের

আশে পাশে কয়েকটা মড়ার খোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। জাহাজের ভাঁড়ারে মদের সন্ধান পেয়ে লোকগুলো বোতলের পর বোতল শেষ করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ আকাশ কালো করে জোর বাতাস বইতে শুরু করল। জিম তখন বুদ্ধি করে জাহাজের পাল তুলে দিয়ে জাহাজটাকে দ্বীপের এক ধারে নিয়ে গেল, তারপর জাহাজের নোঙর ফেলে জাহাজ থেকে নেমে সে দুর্গ অভিমুখে ছুটল।

জাহাজটাকে সে রেখেছিল দুর্গের কাছে, তাদের দলের নাগালের মধ্যে, নিরাপদ জায়গায়। অর্থাৎ তারা যদি দ্বীপ থেকে পালাতে চায় তো জাহাজটা আছে। কিন্তু ডাকাতগুলোর দ্বীপ থেকে পালাবার পথ নেই।

দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে তার কেমন যেন বোধ হল। চারদিক অন্ধকার। সাড়া শব্দ নেই। তার দলের লোকজন সব গেল কোথায়?

জিম একটু ইতঃস্তত করল তারপর সাহসে ভর করে ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে জিম বন্দী হল।

জিম ভীত হতভম্ব! এ তো সব সিলভারের অনুচর! তার দলের লোকজন কোথায় গেল? তারা কি সবাই ডাকাতদের হাতে মারা পড়েছে?

সিলভারের কথায় জিম জানল, তারা কেউ মারা যায়নি, তারা সবাই স্বেচ্ছায় দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে।

ভয়ে জিমের বুক দুর দুর করছে। সিলভারের দলের সবাই বলছে এখনি জিমকে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু সিলভার তাতে রাজী নয়। সে কঠিন কণ্ঠে হুকুম দিলে, জিমের গায়ে কেউ হাত তুলবে না। যদি কেউ তার হুকুম অমান্য করে তাহলে তাকে সিলভার সঙ্গে সঙ্গে বধ করবে।

এদিকে ডাকাতের দল অত্যন্ত ঘমে গিয়েছিল। একে তো তাদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়েছিল, বেশ কয়েকজন জখমও হোয়েছিল, তার উপর খাবার দাবার নেই। অনেকেই গাছগাছড়া খেয়ে অসুখ হয়ে পড়েছে।

তখন সকলে সর্দারের উপর খাপ্পা হল। আর কতদিন তারা এভাবে অনাহারে আর অসুখ অবস্থায় থাকবে? অবিলম্বে রত্নগুহার সন্ধান চাই!

৯

বহু খোঁজাখুঁজির পর সিলভারের দল রত্নগুহার সন্ধান পেল।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে তারা কি দেখল?

দেখল, রত্নগুহায় কোন ধনরত্ন নেই। তারা আসবার আগেই কে বা কারা সব কিছু সাফ করে নিয়ে গেছে! রত্নগুহার চিহ্নস্বরূপ এদিক ওদিক দু'একটা স্বর্ণমুদ্রা পড়ে রয়েছে মাত্র।

হতাশায় তারা ভেঙে পড়ল। তারপর দলপতির বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। তার জন্যেই তো তাদের এই কষ্ট, এই বার্থতা, এই হতাশা! অতএব মেরে লোপাট করে দাও সর্দারকে!

সিলভার জিমকে বাঁচিয়েছিল, তাই তার প্রতি জিম অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। এখন তার বিপদ দেখে জিম স্থির থাকতে পারল না। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হুঁশিয়ার দিয়ে বললে, খবরদার, কেউ যদি সর্দারকে মারতে চাও, তাকেও আস্ত থাকতে হবে না।

জিমের সাহস দেখে ডাকাতগুলো ঘমকে গেল।

এমন সময় বনের মধ্যে বন্দুকের শব্দ হল, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম।

দুর্গের দরজার কাছেই শব্দ! কারা বুঝি দুর্গ আক্রমণ করেছে!

তখন ডাকাতরা ঝগড়া ভুলে সবাই এক জোট হয়ে দাঁড়াল! কারা এরা?

তাঁরা জাহাজের কাপ্তেন, ডাক্তার লিভ্‌সে আর হকিন্স। সঙ্গে অনুচরবর্গ!

ইতিমধ্যে তাঁরা বেলগানের সাহায্যে গুপ্তগুহা খুঁজে বার করে ধনরত্ন সব সরিয়ে ফেলেছিলেন। এইবার দিনডারের দলকে ধ্বংস করবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে জিমকে উদ্ধার করাও ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

ডাকাতরা আর লড়াই করবার ভরসা পেল না। তারা সকলেই অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা আত্মসমর্পণ করল।

তাদের প্রাণে না মেরে সেই দ্বীপে ফেলে রেখে ডাক্তারের দল ধনরত্ন নিয়ে জাহাজে চড়ে দেশে ফিরলেন।

বহু বিপদের মধ্যে তাঁদের দিন কাটাতে হয়েছিল, অনেকগুলি অনুচর প্রাণ হারিয়েছিল, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা অসার্থক হয়নি। তাঁরা যা পেয়েছিলেন তার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। দলের যারা মারা গিয়েছিল তাদের পরিবারবর্গকে তাঁরা পর্যাপ্ত টাকা দিলেন এবং বাকী জীবন তাঁরা সকলেই অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে অতিবাহিত করলেন।

জিমও তাঁদের সঙ্গে সমান অংশ পেয়েছিল। সেই অঢেল টাকা নিয়ে জিম তার মায়ের কাছে ফিরে এলো এবং মা ও ছেলে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল।

যাদের ছোট ভাবি

নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

প্রায় পাঁচ বছর পরে গাঁয়ে এলেন সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বিহারের একটি অখ্যাত গ্রাম। নাম ডাবর—লোকে বলে মলা-ডাবর।

জামতাড়া স্টেশনের প্রায় বাইশ মাইল পূর্বে গ্রামটি অবস্থিত। বাসে যেতে হয়।

গ্রামে কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে, আর আছে নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি, গোয়ালা, ডুঁইয়া, বাউরি ইত্যাদি শ্রেণীর বাসিন্দা। একঘর স্বর্ণকারও তার জাত ব্যবসা খুলে বসেছে।

গরীবের গাঁ। তবুও বামুন বাড়ির কালীপুজোর সময় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার চোখে-মুখে যেন খুশির আলো ঝলমল করে উঠে। কার্যব্যপদেশে যারা সারা বছর শহরে থাকে তারাও কয়েকটা দিনের জন্যে গ্রামে ফিরে আসে।

সুকান্তবাবু থাকেন ধানবাদের কাছে। একখানা বাড়িও করেছেন সেখানে। বয়স হয়েছে তবু অথর্ব হননি। তবে নানা ঝামেলায় পাঁচ বছর আসতে পারেননি। পৈতৃক পুজো ছাড়তে তো আর পারেন না—তাই সপরিবারে কয়েকটা দিন গাঁয়ের বাড়িতে কাটিয়ে যাবেন বলে এসেছেন।

তাঁর সমসাময়িক কোন লোকই প্রায় বেঁচে নেই। তবু একবার ক'রে তিনি সকাল বিকেল, এ-পাড়া ও-পাড়ায় বেড়িয়ে আসেন। বর্তমানে যারা বয়স্ক তাদের তিনি জন্মাতে দেখেছেন কিন্তু পরিচয়টা তত নিবিড় হতে পারেনি। তবু তাদের সঙ্গেই নানা কথা বলেন। খুব মিশুকে লোক।

নাপিতদের ছেলে নেপালকে ডাকিয়ে দাড়ি কামাতে বসেন। ডুঁইয়াদের কোন্ বুড়ি খুব ভালো চিঁড়ে কুটতে পারতো, গোবিন্দ কামারের বাবা রামধন কেমন চক্ষের নিমেষে লাঙলের ফলা তৈরী করতে পারতো, কুমোরদের প্রতাপ পালের বাড়ি কত রকমের মাটির খেলনা বানাতে পারতো আর সৃষ্টি গোপের বুড়িমা তাদের বাড়িতে ডেকে কত দুধ আর দই-চিঁড়ে খাওয়াতো তখনকার দিনে, সে গল্প বার বার বলেও যেন শেষ হয় না। তখন টাকায় পনেরো সের খাঁটি দুধ, আর সের সের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত পাওয়া যেতো। চালের দর ছিল দুটাকা মন। হায়, হায় সে সব দিন কি আছে? এখন সেসব দিনের কথা যেন রূপকথার কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন একটু দুধের জন্যে ছুটোছুটির অন্ত থাকে না। তাও আবার নির্জলা নয়।

বাড়ির মুনিষ কালীকে পাঠানো হয়েছিলো দুধ আনতে। সকালে অন্ততঃ আধসের দুধ চাই, না হলে এতগুলি লোকের চা-খাওয়া এবং তাঁর নিজের জন্যে একটু ছানা হবে কেমন করে? কালী এসে খবর দিলো—দুধ পাওয়া যায়নি। মাত্র এক পোয়া দুধ পেয়েছে চায়ের জন্যে—সেও বোধ হয় আদ্ধেক দুধ, আদ্ধেক জল।

বাড়িতে দরজি নেই, পুকুরে মাছ নেই। দুপুরে তরকারীর ভালো যোগাড় নেই। একটু ঘি পাওয়া যায় না, পাওয়া—ঘি! গরম ভাতের সঙ্গে একটু ঘি ও নুন দিয়েই বেশ দুমুঠো খাওয়া যায়। সহরে তবু কপি, টম্যাটো, পালং শাক শালগম ইত্যাদি পাওয়া যায়। গাঁয়ে পয়সা দিয়েও কিছু মেলে না। অথচ আগে এখানে কী না পাওয়া যেতো! কিন্তু এখন যেখানে দুধই মেলে না সেখানে ঘি পাওয়ার আশা বোধ হয় অসঙ্গত।

কালী বললো: গাঁয়ে এখন কোন জিনিষই পাওয়া যায় না। যদিও তা দু'একজনের বাড়ি কিছু হয় তো সে আর গাঁয়ের লোক পায় না।

ছানা-ঘি এমন কি ক্ষেতের লাউটা, কুমড়োটা বেগুনটা পর্যন্ত চলে যায় চিত্তরঞ্জনের বাজারে। ওখানে সব চড়া দাম পায় কি না।

অধৈর্য হ'য়ে বললেন সুকান্ত: আরে চড়া দাম না হয় আমিও দেব। রেখে আয় যদি পাস।

কালী বললো: ভরত স্বর্ণকারের বাড়ি গরু মোষ আছে—ঘি দুধ হয়।

সুকান্ত বললেন: তাই ওকেই বল। ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে অন্ততঃ সোয়াখানেক ঘি যেন দেয়, আর আধসেরটাক দুধও আনিস।

ভরতের বাড়িতে দুধ-ঘি দুই-ই পাওয়া গেল।

দামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন সুকান্ত।

কালী উত্তর দিল: ভরত বললো, এখন নিয়ে যাও, দামের কথা পরে হবে।

—সহদেব গোপ দুধ দিল না কেন আজ?

কালী বললো: কেমন করে বলি! বললো আজ গরু-মোষ লাগেনি। বোধহয় বাচ্চাগুলো খোলা ছিল, দুধ খেয়ে নিয়েছে।

—তার মানে, ইচ্ছে করেই দিল না, তাই না?

আর কোন কথা না বলে কালী চুপ ক'রে রইলো।

কালীপুজো সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'ল। পটকা, হাউই, ফুলঝুরির আলো ঢাকের বাদ্যি আর লোকজনের কলরবের মধ্যে দিয়ে অমাবস্যার কালো রাতটা শেষ হল। সারারাতের ক্লান্তিতে চোখ দুটোর পাতা আর খোলা রাখতে পারেননি সুকান্ত। ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা প্রায় শেষ। অপরাহ্নের ক্ষীণালোকে তিনি কালীঘরের মেজেতে গিয়ে বসলেন। ভিন্ গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়েরা দলে দলে আসছেন প্রতিমা দেখতে একটু থেমে যুক্ত করে প্রণাম ক'রে তারা বিদায় নিচ্ছিল। এমনি দর্শকের মধ্যে থেকেই একজন একটু এগিয়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলো সুকান্তকে। তারপর একটু তফাতে বসলো।

পরে বললো: কান্তবাবু যে! কবে আসা হল? ভালো তো?

বেশ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন সুকান্ত। কিন্তু আগন্তুককে চিনি চিনি করেও ঠিক চিনতে পারলেন না।

বললেন—তোমাকে তো চিনতে পারছি না। নামটা কী বল তো?

হি হি করে হেসে উঠলো লোকটি।

—আমি মাৎলা বটে, জীবনপুরের। ঐ যে চন্দ—

এবার চিনেছেন সুকান্ত।

—ও. তুমি চন্দ সাঁওতালের ব্যাটা? তাই বল। তা চন্দ'র কী খবর?

—আজ্ঞে, উনি তো নাই। সেল বছর মারা গেলেন।

চন্দ এককালে মুনিষ ছিল সুকান্তর। খুব পরিশ্রমী আর সাচ্চা লোক ছিল। চাষের কাজ ভালই জানতো। কিন্তু কে যে বেচারাকে লোভ দেখিয়ে কলিয়ারীতে কুলির কাজ করতে নিয়ে গেলো আর চাষের কাজে মন বসলো না। কলিয়ারীর পয়সায় বেশোবস্ত খাওয়া সুরু করলো। ক্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, শক্তি গেল, তারপর একদিন অকালে বুড়ো হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। আহা, সেই অসুরের মতো চেহারার চন্দ আর নেই! মাংলা বলছিল, সেও কুলির কাজ সুরু করেছিল, তবে শেষকালে চন্দর জন্যে সে আর বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি। বিঘে দুই জমি করেছিল চন্দ। মাংলা এখন সেই জমিতে চাষ করে, আর কিছু ভাগ-চাষও আছে ওতেই কোন রকমে কায়ক্লেশে ওদের দিন চলে। শুনতে শুনতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো, সুকান্তর মনে পড়লো অতীতের সেই গ্রাম্য জীবনের দিনগুলি। সেই গ্রীষ্মে বর্ষায় মাঠে মাঠে ঘোরা, হেমন্তে কাঁচা পাকা ধান-শীষের ঢেউখেলানো ওজীর পানে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা।

সেদিন যাবার আগে মাংলা বারবার ওদের পুরানো মনিব সুকান্তকে ওদের জীবনপুরে যেতে বললো।

ধানবাদের ফেরার আগের দিন সুকান্তবাবু গেলেন জীবনপুরে। ওঁকে দেখে মাংলার সে কী আনন্দ! মাংলার মা, মাংলার বউ, ছেলে, সবাই এসে গড় করলো সুকান্তকে। গাঁয়ে না থাকার জন্যে অনুযোগও করলো খুব। যেন নিজের লোককে ওরা চোখের আড়াল করতে চায় না। তারপর আসার সময় সুকান্তর হাতে দিল নানা বর্ণের গাঁদাফুলের একটি প্রকাণ্ড গুবক।

চারটে দিন—দেখতে দেখতে যেন ফুরিয়ে গেলো।

তারপর এলো সুকান্তদের যাবার দিনটী। সকালে উঠে চা-পানাতে সপরিবারে বেরোলেন সুকান্ত। এক মাইল দূরে গিয়ে বাস ধরতে হবে। কালীমায়ের মন্দিরের বাঁশীতে মাথা ঠুইয়ে প্রণাম ক'রে প্রথমেই এগিয়ে গেলেন ভরতের বাড়ির দিকে। সঙ্গে ছিল কালীর ভাই সত্য। সেই ডেকে আনলো ভরতকে। গায়ে আধময়লা কামিজ আর পায়ে একজোড়া চপ্পল চড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভরত। মুখে একটু হাসি এনে বললো সে আজই আসছেন আপনারা?

কাউকে যাওয়ার কথা না বলে আসার কথা বলতেই অত্যন্ত ভরত।

সুকান্ত ঘাড় নেড়ে জানালেন আজই তাঁরা ধানবাদ চলে যাচ্ছেন।

অতঃপর পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন:

—ভরত, তোমার যি এর দামটা কতো দিতে হবে বলো দেখি? ভরত জিভ কেটে মুক্তকরে বললো ওকথা বলবেন না বড়দা। (সুকান্তর ছোট ভাইএর বন্ধু বলে ভরত ওকে বড়দাই বলতো) আপনার আসীর্বাদে বাড়িতে এখন একটু দুধ যি হয়। আপনারা দূরে দূরে থাকেন সেবা করার সুযোগ তো আমাদের হয় না। ঐটুকু যি আপনাদের সেবায় দিয়েছি। ওর আবার দাম নেব কী? এমন কীই বা জিনিষ! তাই আজ যখন সুযোগটুকু পেয়েছি তখন আর দামের কথা তুলবেন না।

চলতে চলতে পা থেমে গিয়েছিলো সুকান্তর।

ভরত বললো: চলুন। আপনাদের বাসে তুলে দিয়ে আসি। আপনাদের সঙ্গে বাস-ষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাব। বলেই বেরিয়েছি।

সুকান্ত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখছিল ভরতকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল মাৎলাকে আর বিগত দিনের সেই চিঁড়ে-কুটুনি বুঁইয়া বুড়ি এবং সৃষ্টি গোয়ালার মাকে আর বর্তমানের অভাবগ্রস্ত দুঃস্থ কঙ্কণ মুখগুলিকে। কী দিনই পড়েছে। মানুষের জীবনধারণের সমস্যা কী জটিলই না হয়েছে। সবই দুষ্প্রাপ্য প্রতিটা প্রয়োজনীয় সামগ্রীই দুর্মূল্য। চারিদিকে অভাবের তাড়না। দারিদ্র্যের প্রভুটি। নিরানন্দের কালো ছায়া। শ্রদ্ধা, ভক্তি, নম্রতা মানুষের অন্তরের জিনিষ কিন্তু এই মানবিক হৃদয় বৃত্তিগুলি এমন দিনেও তো একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। এই ভরত মাৎলাদের অস্তিত্ব তারই প্রমাণ। অনেকের কাছে এরা অশিক্ষিত কৃপার পাত্র এবং কীটানুকীটের সামিল। কিন্তু সত্যি কি তাই? আজ এই সময়ে তবে এদের ছেড়ে যেতে মনটা কাতর হচ্ছে কেন? ওদের আপন বলে ভাবতে ভালো লাগছে কেন সুকান্তর?

* * *

অতলান্তিক মহাসাগরের কূলে রয়েছে পুরাতন এক লাইট হাউস,—কেউ সেখানে থাকে না, একেবারেই পরিত্যক্ত।

কাছাকাছি থাকে জেলে ম্যালকম্। তার ছোট্ট পরিবার নিয়ে। একটি মেয়ে বয়স বছর বারো আর একটি ছেলে বয়স বছর দশ।

ওরা মাঝে মাঝে পুরানো সিঁড়ি দিয়ে লাইট হাউসের চূড়ায় ওঠে। ঘুরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে।

এক ভীষণ দুর্যোগের রাত্রে মেয়েটি বললে, তার ভাইকে দেখ ফ্রেড্, বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে, এখনও ফেরেনি। হয়ত দিক ভুল করেছে। আর ঘুরে একটা বিপন্ন জাহাজের বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এ সময় আলো দেখানো ভাল হয়।

ভাইবোনে উঠল গিয়ে লাইট হাউসের চূড়ায়। শুকনো পাতা আর কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালাল। সেই আগুনের আলো ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে।

বিপন্ন জাহাজ বাঁচল আর ম্যালকমও ফিরে এল। তারপর থেকে সত্যই লাইট হাউসটিকে চালু করা হল।

অতি সাধারণ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

খালের ধারে পুলের নীচে তাদের সংসারে বসে ছিল বিমলী। বুদ্ধু অবশ্যই কিছু বুঝেছে। আর মুন্না—বেশী কান্নাকাটি করার মত গায়ের শক্তি তার নেই। বিমলীর চোখের সামনে ভাসছিল চাপ চাপ অনেক রক্ত। কোন রক্ত যে সুন্দরের তা বিমলী বোঝেনি একটুও। সুন্দর সবীর, সুন্দর রাস্তায় রাস্তায় খেলা দেখায়, সুন্দরের বাড়ী ঘর তো নেই-ই, থাকার জায়গা বলতেও এই পুলের নীচুটা সম্বল। সুন্দরের এক দৃষ্টিতেই চেনা যায় এমনিতে। আর বিমলী—বোধহয় অনেক দূর থেকেও তার গায়ের গন্ধ চিনতে পারে। কিন্তু কী আশ্চর্য! রাস্তার অত রক্তের মধ্যে আলাদা করে সুন্দরের রক্ত কিছুতেই চেনা গেলনা। বিমলী ভাবছিল।

• • •

সূর্য যখন পুলের উপরটায় ওঠে, সুন্দর বিমলী ও বুদ্ধুর আহার পর্ব সমাধা হয়। একবছরের মুন্নাকেও একটু খাওয়ান হয়। একটাই মাত্র থালা, তাও আবার জায়গায় জায়গায় কলাই উঠে গেছে। খুব চেষ্টা করলে অবশ্য আরও একখানা থালা কেনা যায়—বিমলী বলেওছে সে কথা—কিন্তু সুন্দর রাজী হয় না। কি হবে জিনিস বাড়িয়ে, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বেড়াতে হয় যে গোটা গৃহস্থালীটা। একটা এলুমিনিয়ামের হাড়ি, টিনের কৌটো দুটো—চা খাওয়া জল খাওয়া দুই-ই হয় তাতে, আর কিছু টুকিটাকি জিনিস —এই সংসার। আরও কিছু আছে অবশ্য, ওদের কাছে সেগুলিই সবচেয়ে দরকারী বলা যায়, সুন্দর ও বুদ্ধুর খেলা দেখাবার সরঞ্জাম। একটা ঢোলক, কয়েকটা কাঠের বল, লোহার রিং একটা, কিছু দড়িদড়া আর একটা মাঝারি গোছের বাঁশ। খালের জল দিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে নেয় বিমলী—সুন্দরও সব গুছিয়ে তৈরী। কাঁধে সংসার আর খেলার সরঞ্জামের বোঝা নিয়ে বুদ্ধুর হাত ধরে সুন্দর রওনা দিল কচিটাকে ছেঁড়া কাপড়ে জড়িয়ে বিমলীও তাদের সঙ্গে হাঁটা দিল।

"ডুম ডুম ডুম ডুম" সুন্দরের কাঁধে ঝোলান ঢোলক মাঝে মাঝে বেজে চলে। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদে। কিন্তু এসবে কিছুই যায় আসেনা তাদের। বিমলীও পারত, কিন্তু বুদ্ধুর পরের সেই সেদ্ধ বছরের মেয়েটা মারা যাবার পর বেশী পরিশ্রম করলে তার বুক যেন কেমন করে। এই কচিটা হওয়ার পর আরও বেড়েছে। তবু অভ্যাস বলে চলে বিমলী।

অনেক দূর দূর হাঁটতে হয় তাদের। এক জায়গায় তো বেশ বেশ খেলা দেখান যায় না। পছন্দসই রাস্তার মোড় পেলেই দাঁড়িয়ে পড়ে সুন্দর। "ডুম ডুম ডুম ডুম"—জোরে জোরে ঢোলকের আওয়াজ হতে থাকে। চীৎকার করে বলে সুন্দর "খেলা হোবে, খেলা হোবে।" ওপাশ থেকে কচিগলায় সমান তালে চেঁচায় বুদ্ধু "কী খেলা"।

"বল উড়বে, হাতে হাঁটবে, বাঁশে চড়বে।"

"ভাল না" শেখানো কথাগুলো বলতে বুড়ুর একটুও ভুল হয় না।

"তবে দেখ্" বুড়ুর উপরই যেন রাগ করে সুন্দর তার পিঠের বোঝাটা নামায়। ততক্ষণে ঢোলকের আওয়াজে ও সুন্দর বুড়ুর চীৎকারে আশে পাশে কিছু কাচ্চা বাচ্চা জুটে গেছে। দু একজন বয়স্ক লোকও কৌতূহলী হয়ে উঁকি ঝুঁকি মারে। কচিটাকে রাস্তার একপাশে শুইয়ে ঢোলকটা এবার নেয় বিমলী। ঘামে ভেজা রুক্ষ চুলগুলো কপালের উপর থেকে সরিয়ে নেয়। একনাগাড়ে বাজিয়ে চলে। সুন্দর বোঝাটা একবারে খোলেনা রহস্যময় ভঙ্গীতে প্রথমে বার করে চটগুলো, যেগুলো সময়ান্তরে তাদের শয্যা, পরিণতি করে বিছায় রাস্তার উপরে, তারপর ধীরেসুস্থে বলগুলো, দড়িদড়া, লোহার রিং-এসব চটের উপর সাজিয়ে রাখে। ভিড়ের দিকে এক এক বার আড়চোখে তাকায় বিমলীও। জোরে জোরে ঢোলকে কাঠি মারে। সুর করে বলে—"খেলা হোবে খেলা হোবে।" সব শেষে কলাই করা থালাটি বের করে চটের একপাশে রাখে সুন্দর। দর্শকেরা ওতে পয়সা ফেলে। তালিমারা হাফপ্যান্ট আর ময়লা ছেড়া গেঞ্জীটা যেন করে হাত দিয়ে ঝেড়ে নেয় সুন্দর।

কী সুন্দর তালে কাঠের বল তিনটি ছোঁড়ে। একটাও মাটিতে পড়ে যায় না। দেখাদেখি বুড়ুও কতগুলি কাঠের টুকরো নিয়ে ছোঁড়ে, কিন্তু তারগুলো সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। দর্শকেরা হেসেই খুন। খানিক পরে বলগুলি রেখে লোহার রিংটা নেয় সুন্দর। সহজভাবে অতবড় শরীর ছোট রীংটার মধ্য দিয়ে গলিয়ে নেয়। হৈ হৈ করে ওঠে দর্শকরা। বিমলী গম্ভীর ভাবে বলে, "তালো বাজাও" চটাপট্ চটাপট্ হাততালি দেয় 'বালখিলোর দল। এবার পা উঁচু করে হাতে হাঁটে বুড়ু। তারী বাঁশখানা তর্জনীর উপর সোজাভাবে দাঁড় করায় সুন্দর ভাল খানাপিনা, ভাল জামাকাপড় তার সেই যে যাদো হাত্রে অনেক আলোর নীচে খেলা দেখায়, সেই রকম খেলা দেখাবার ঘর পেলে সুন্দর কত ভাল খেলুড়ে হতে পারত, ভাবতে ভাবতে বিমলীর হাতের কাঠি ঢোলকের উপর স্তব্ধ হয়ে আসে।

এবার দড়িদড়ার সাহায্যে বাঁশটাকে রাস্তার উপর যেন কেমন করে দাঁড় করায় সুন্দর। বুক কেঁপে ওঠে বিমলীর। তাড়াতাড়ি ঢোলক রেখে রাস্তার উপর থেকে মুন্নাকে বুকে তুলে নেয়। এক বছরের মুন্না—দেখলে আরও অনেক ছোট মনে হয়, নির্জীবের মত শুয়ে থাকে। এ খেলার সময় চললেই যেন বিমলীর মাথা বাঁশের সাথে সাথেই ঘুরতে থাকে। ছেঁড়া কাপড় সমেত বাচ্চাটাকে দড়ি দিয়ে বাঁশের উপর দিকে বাঁধে সুন্দর। তারপর নিজে বাঁশখানা বন্‌বন্ করে ঘোরাতে থাকে। বাঁশের সাথে বাঁধা বাচ্চাও ঘুরতে লাগে। বিমলীকে যেখান আছে—এই সময় সে কলাই করা থালাখানা নিয়ে সবার কাছে পয়সা চাইবে। থালা হাতে তুলে নেয় বিমলী—তবে হাত কাঁপতে থাকে, গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বের হয় না। রাস্তার পাশের উঁচু বাড়িগুলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুন্দরী, সুবেশা বৌ-ঝিরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলো—পয়সা চাওয়ার সময় আওয়াজ করে তারা একে একে সরে পড়েছে। হতাশ চোখে সেইদিকে একবার তাকায় বিমলী। তবুও কিছু পয়সা হয়েছে থালায়। ঠকাস্ করে থালাখানা মাটিতে নামিয়ে রেখে বিমলী বাঁশের কাছে ছুটে যায়। বাঁশ ঘোরান থামিয়ে দিয়েছে সুন্দরও দড়িদড়া খুলে দিয়েছে। ক্ষীণজীবি অপুষ্ট বাচ্চাটা আচ্ছন্নের মত চোখ বন্ধ করে আছে। পরম স্নেহে বিমলী তাকে বুকে তুলে নেয়।··· মনে পড়ে বুড়ুর পরের সেই মেয়েটার কথা। সেটা বেঁচে থাকলে আজ অনেকটা বড় হোত! এই দড়ি ঘোরানতেই মারা পড়েছিলো মেয়েটা। একটু তো বড়ই হয়েছিলো, কতদিনই তো ঘোরানো হয়েছে তাকে।

কিন্তু সেদিন ঘোরানোর সব সেই যে বমি সুরু করল, সে বমি পরদিন যখন খাদুর হাত ফিরফিরে কচি বুকটার স্পন্দনও তখন থেমে গিয়েছে। খালের জলের কাছ ঘেঁসেই সুন্দর তাকে চিরদিনের মত শুইয়ে রেখেছিলো মাটীর নীচে। কয়েকমাস যাবত এটাকেও ঘোরান হচ্ছে প্রতিযোগই বুক যেন আটকে আসে, বিমলীর বুকের মধ্যে কেমন করে। আজকাল মাঝে মাঝেই বিমলী বাচ্চাটাকে নিয়ে তাই খেলায় যেতে হয় না। সুন্দর তাকে বুঝিয়ে রেখেছে, এ খেলা না হলে লোকে পয়সা দেয় না। একবেলা একটু ঘুনভাত খাওয়া, তাও বন্ধ হয়ে যাবে যে পয়সা না হলে! মুহূর্তকে সুন্দর সাবধানেই ঘোরায় সেও তো বাপ, তার বুকেও ব্যথা লাগে। সবই বোঝে বিমলী। তবুও···তবুও···। বেলা পড়ে আসে। ঘরের দিকে—মানে পুলের নীচে, পা বাড়ায় বিমলীরা। বড় ভাল লাগে বিমলীর, রাতটা তার বড় শান্তি। টিনের কৌটায় করে একটু একটু চা তারা রাস্তার দোকান থেকে কিনে খায়। বুদু আর মুন্নার জন্য কিনে আনে একটা রুটী। ব্যাস্ আজকের মত সব শেষ।

কিন্তু না! জীবনের আরেক দিকও আছে। বুদু আর মুন্না যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, কিংবা ওঠেনা, সুন্দর আর বিমলীর চোখে তখনও ঘুম আসেনা প্রায়ই। সুন্দর আর সে পাশাপাশি বসে, কত গল্প করে।

তারা গল্প করে একবার তারা সার্কাস দেখেছিলো, সেই সার্কাসের কথা। কী সুন্দর ঝকঝকে পোষাক মেয়েদের, কী সুন্দর রাজার মত পোষাক পরা ছেলেরা, আর কী সুন্দর খেলা। কত বাঘ, কত সিংহ। অনেকের কথা, কিন্তু সে গল্প আজও তাদের কাছে নতুন আছে।

কিংবা গল্প করে মহারাষ্ট্রের না দেখা সেই নিভৃত পল্লীর কথা যেখানে তাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করত। আজও বিমলীর জীর্ণ শাড়িখানা মারাঠী ঢং-এ পেছনে কাছা দিয়ে পরা। শুকনো ফুল বা মালা কখনো সখনো দু'এক পয়সা হলে কেনে সুন্দর, বিমলী তার রুক্ষ চুলের বেণীতে জড়িয়ে নেয়।

যদি কোনোদিন পয়সা একটু বেশী পায়, বাচ্চাদের সাথে নিজেরাও একটু ফূর্তী করে তারা। সুন্দর ঢোলকটা বাজিয়ে আনে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে নেড়ে গান ধরে "বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি—" বিমলীর দিকে তাকিয়ে চোখের নানা রকম ভঙ্গি করে। বিমলী গুনগুন করে গায় তার স্বামীর মুখে শোনা গানটি—"বড় বড় আনকী তু ভূষণ সকুখানা।" বারবার ঘুরে ঘুরে একই লাইন গায়। রঘুকুলবধূ জনকনন্দিনী সীতা কতকালের ব্যবধান এড়িয়ে তার মনের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। দুঃখই যার ভূষণ ছিল, সেই জানকীর দুঃখে সমস্ত মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিমলী নিজেদের সমস্ত দুঃখ ভুলে যায়। আর নিজেদের দুঃখ যে ঠিক কি—কোনটি যে সুখ ও দুঃখের সীমারেখা, বিমলীরা তা বোঝেও না ঠিক। দূরের লাইটপোষ্টের ঝাপসা আলোয়—সুন্দর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বিমলীকে, নতুন নতুন লাগে যেন। রক্তে মানুষের আদিমতম প্রকৃতিগুলি যেন সুর করে গান গেয়ে ওঠে। বিমলীর হাত ধরে নিজের দিকে টেনে নেয় সুন্দর।

• • • •

এমনিই তো চলছিল। মহাকালের চক্রের সাথে তাদের জীবনও ঘুরে চলছিল। কত উত্থান পতন, কত পরিবর্তন হোল যুগে যুগে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিমলীরা তো একই আছে।

কিন্তু এবার যেন কী গোলমাল হয়ে গেল। খেলা দেখাতে গেল সুন্দর আর বুদু শরীর খারাপ বলে বিমলী পুলের নীচে বসেই থাকল। কিন্তু সেই যে গেল, ফিরল একা বুদু। বিকালের পড়ন্ত রোদে

বুধুকে ছুটতে ছুটতে একা আসতে দেখে বিমলী অবাক হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বুধু অনেক কিছু বলে গেল। কিন্তু বিমলীর মাথায় গেল অল্পই। একটি কথাই কানে জোরে জোরে বাজতে লাগলো যার যথার্থ হোল সুন্দরের গুলী না ইট, কি যেন লেগেছে। রাস্তায় গোলমাল দেখে চলে আসছিল সুন্দর বুধুকে নিয়ে, কিন্তু পিছন থেকে কি যেন লাগলো মাথায়, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। একটা সাদা গাড়ী এসে অনেক লোকের সাথে সুন্দরকেও নিয়ে গেছে। বুধু শুনেছে হাসপাতালে নিয়ে গেছে ওরা।

তাড়াতাড়ি কচিটাকে কোলে নিয়ে বুধুর হাত ধরে বিমলী ছুটতে লাগলো বুধু যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল, সেই রাস্তা ধরে। ক্লান্ত বুধু পিছিয়ে পড়ছে কিন্তু বিমলী তাকে ছাড়বে কেন। জায়গাটা তো বুধুই চেনে। কিন্তু রাস্তা এখন ফাঁকা। শুধু চাপ চাপ অনেক রক্ত জায়গায় জায়গায় পড়ে ছিল। অনেক লোকের রক্তই হবে মনে হয়। "ইয়া", দাঁড়িয়ে পড়ল বিমলী। অনেক ইটকাঠের সাথে সুন্দরের খেলা দেখবার সরঞ্জাম গুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আস্তে আস্তে সেগুলো জড়ো করল বুধু আর বিমলী।

খালের ধারে তার সংসারে বসে সেই কথাই শুধু ভাবছিলো বিমলী। হয়ত সুন্দর দু' একদিনের মধ্যেই চলে আসবে ভাল হয়ে কিম্বা হয়ত আর কোনোদিন আসবেনা, কিন্তু গায়ের গন্ধেও যাকে চিনতে পারতো বিমলী তার রক্ত কিন্তু আলাদা করে চিনতে পারলোনা আজ কিছুতেই।

• •

রাজার সৈন্যদলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য গ্যারিবল্ডী আশ্রয় নিলেন এক চাষার বাড়ীতে।

—কে গো তুমি? —দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি তোমার। —জিজ্ঞাসা করলেন চাষী।

—খাওয়ার চেয়েও বড় জিনিষ আছে,—মৃদু হেসে বললেন গ্যারিবল্ডী।

—সেটা কি মাছরাঙা?—প্রশ্ন করলেন গৃহকর্ত্রী।

—অনেকটা অনুমান করেছেন মাডাম্, স্বাধীনতা মাছকে লাভ করাই হোল আমার জীবনের বড় সাধ।

—সে মাছটার নাম ত কখনো শুনিনি, সমুদ্রের মাছ বুঝি?

—ঠিক বুঝেছেন মাডাম্,—একটা জাতির জীবন সমুদ্রের সেটাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত মাছ।

—না বাপু,—তুমি দেখছি পাগল,—আবোল-তাবোল বকছ—সরে পড় এখান থেকে, নইলে। গ্যারিবল্ডী ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন।

ম্যাপ

নির্মলেন্দু গৌতম

সমীরের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্যে পথের একটা ম্যাপ এঁকে পাঠিয়েছেন অমিয়বাবু। বাস রাস্তা থেকে তিনি যে বাড়ীতে উঠেছেন সে বাড়িতে পৌঁছুবার রাস্তাটাকে লাল কালিতে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। বাসস্টপ থেকে বাড়ি পর্যন্ত ছোটো বড়ো সব রাস্তা সেই ম্যাপে দেখানো। কোথাও একটা ছোটো গাছ তার চিহ্নও বাঁকা আছে ম্যাপখানায়। অনেক পরিশ্রম ক'রে ম্যাপখানা তৈরী করতে হয়েছে অমিয়বাবুকে। ম্যাপখানা চোখের সামনে ধরেই বুঝতে পেরেছে সমীর।

ম্যাপখানা না থাকলে বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হতো সমীরের। কারণ রাস্তাটা এঁকে বেঁকে এ রাস্তা থেকেও রাস্তায় প'ড়ে বাড়িতে এমন ভাবে পৌঁছেছে যে শুধু চিঠির কথায় তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। বাসের মধ্যে পকেট থেকে ম্যাপখানা বের ক'রে দেখতে দেখতে ভাবলো সমীর।

কথাই ছিলো, অমিয়বাবু এখানে এলে সমীরকে চিঠি দেবেন। সমীর নিশ্চয়ই যাবে। অমিয়বাবুর খুব ইচ্ছে তার বাড়ির সবার সঙ্গে সমীর পরিচিত হোক। সমীরও অনেক দিন সে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। এবার হঠাৎ দিন কয়েকের জন্যে এখানে চলে এসেছেন অমিয়বাবু। কাজেই এবার সবার সঙ্গে পরিচয় হবে সমীরের।

এদিকে কোনোদিন আসেনি ব'লে বাসের কন্ডাক্টরকে শুধিয়ে ঠিক ঠাঁই নামতে হলো সমীরকে। বাসটা চলে যেতেই ম্যাপখানা আরো একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে রাস্তা পার হলো। তারপর ম্যাপখানা হাতে নিয়ে সোজা হাঁটতে থাকলো নির্দেশ মতো।

অমিয়বাবুর সঙ্গে বছর দুয়েক আগে পরিচয় হয়েছিলো। অমিয়বাবু আর সমীর তখন কাজের জন্য একটা মফঃস্বল শহরে একসঙ্গে ছিলো।

সেই মফঃস্বল শহরে তাদের পরিচয়টুকু অল্প ক'দিনে অসম্ভব গভীর হয়ে গিয়েছিলো। সমীর স্পষ্টই অনুভব করেছিলো, অমিয়বাবু তাকে খুব স্নেহ করেন। এখানে ফিরে আসবার পর চিঠিপত্রে সেই স্নেহটুকু আরো অনেক বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

সেই কথাটা মনে রেখেই যে সময় ঘুম থেকে ওঠে সমীর, আজকে তার চাইতে আগে উঠেছে, দাড়ি কামিয়েছে, দ্রুতপায়ে এসেছে বাসস্টপে।

কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু ভয় হচ্ছে সমীরের। অমিয়বাবুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে কারো সঙ্গে তো তার পরিচয় নেই। তারা তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে কে জানে!

তেমন কিছু বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই 'কাজ আছে' ব'লে সমীর উঠে পড়বে। কথাটা ভেবে ভয়টাকে মন থেকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলো সমীর।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ম্যাপের নির্দেশ মতো বাঁদিকে ঘুরলো সমীর। পথের দু'পাশে বাড়ি, তেমন সাজানো নয় বাড়িগুলো। কোনো পরিকল্পনা ক'রে এদিকটা গ'ড়ে ওঠেনি। যে যেমন পেরেছে জায়গা নিয়েছে। বাড়ি করেছে। রাস্তাগুলোও সেজন্যে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। ম্যাপেও কিন্তু রাস্তাগুলো বাঁকা হয়েছে অমনি ভাবে।

চারদিকে তাকিয়ে হাঁটতে কিন্তু ভালোই লাগছে সমীরের। কিছুটা রোদ, রাস্তার পাশে কিশোরী কৃষ্ণচূড়া, কিছু পাখী সকালের প্রসন্নতাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

ম্যাপে অনেক পথের নির্দেশ থাকলেও বাড়িটা কিন্তু বেশী ঘুরে নয়। রাস্তাটা কেবল গোলক ধাঁধাঁর মতো। একটা সিগারেট ধরিয়ে শেষ করবার আগেই বাড়ির সামনে পৌঁছুলো সমীর।

সিগারেটটা পথের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অমিয়বাবুর বাড়ির বারান্দায় উঠে এলো। বুকের মধ্যে মৃদু উত্তেজনা অনুভব করলো। দ্রুত হাতে কড়া নাড়লো দরজার।

তারপর একটু সরে দাঁড়ালো দরজা থেকে। সম্ভবতঃ অমিয়বাবুই দরজা খুলবেন। রুমাল বের ক'রে মুখটা ভালো ক'রে মুছে ফেললো সমীর।

কিন্তু অমিয়বাবু দরজা খুললেন না। খুললো ছোট্ট একটা মেয়ে।

সমীরকে দেখে সে অবাক হয়ে তাকালো।

সমীর বললো: 'অমিয়বাবু তোমার কে হন?'

'মেসোমশাই।'

'বাড়িতে আছেন তিনি।'

ছোট্ট মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বললো, 'আছেন।'

'তাঁকে গিয়ে বলো, সমীর এসেছে।'

মেয়েটি বোধ হয় জানে, আজকে সমীর মামার কাছে আসবার কথা আছে। কাজেই একমুখ হেসে ছুটে ভেতরে চলে গেলো সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন অমিয়বাবু। সমীরকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

সমীর বললো, 'কাল আপনার চিঠি পেয়েছি। সেই সঙ্গে ম্যাপখানাও।'

'চিঠি পেলে তুমি আসবেই জানতুম। সে জন্যেই পাত্তার ক'রে এসে আর বেরোই নি।' অমিয়বাবু বললেন।

সমীর এবার অমিয়বাবুর সঙ্গে ঘরে এলো। সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরখানা। বেশ কয়েকটা জানালা আছে ঘরের মধ্যে। জানালাগুলোর আধখানা ক'রে পর্দা ঢাকা। তবু ঘরের মধ্যে উপচে পড়ছে আলো।

একটা টেবিলকে ঘিরে খানকয়েক চেয়ার পাতা ঘরের মধ্যে।

অমিয়বাবু সেই চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বোসো।'

সমীর একখানা চেয়ার টেনে ব'সে পড়লো।

'অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হলো কিন্তু।' সমীর বললো।

অমিয়বাবু বললেন, 'দেখা হবার সুযোগ কোথায়? অন্তত থেকে তো ঘন ঘন আসা যায় না। এবার ছেলেমেয়েদের উৎসাহেই এলুম।—ওহো ওদের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলুম না—'রিন্টু—।

সমীর তাড়াতাড়ি বললো, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এই তো এলুম।'

কথাটা শেষ হবার আগেই রিন্টু এসে ঘরে ঢুকলো।

'তোমার মা আর দিদিদের একুনি পাঠিয়ে দাও। বলো, সমীরদা এসেছে।'

রিন্টু একবার সমীরকে ভালো ক'রে দেখে সেই ছোট্ট মেয়েটির মতোই এক ছুটে চলে গেলো ভেতরে। খুশীতে ওর মুখখানা ভ'রে উঠেছে।

'এই আমার ছোটো ছেলে।' অমিয়বাবু বললেন।

সমীর বললো, 'রিন্টু নামটা শুনেই বুঝতে পেরেছি।'

অমিয়বাবু সব সময়েই রিন্টুর কথা বলতেন।

'ভারি দুষ্টু হয়েছে। এখানে এসে বেরুতে পারছে না ব'লে খুব অসুবিধে হচ্ছে ওর।' হাসতে হাসতে বললেন অমিয়বাবু।

'আমরাই বেরুতে না পারলে থাকতে পারি না—'

কথাটা শেষ হবার আগেই রিন্টুর দুই দিদি এসে দাঁড়ালো। ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে রাস্তার পাশের গলাগলি ক'রে দাঁড়ানো দুটি কৃষ্ণচূড়া গাছের কথা মনে এলো সমীরের। অসম্ভব স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো মনটা।

'শাশ্বতী, ভাস্বতী—আমার মেয়ে।'

সলজ্জ মুখে দু'জন হাসলো।

'আমার তো ওরা চিনতে পারলো না।' সমীর ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অমিয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললো।

'ঠিক চিনেছে, তুমি যে আজ আসবে, সবাই তা জানে।'

শাশ্বতী সলজ্জমুখে বললো, 'বাবা আপনার কতো গল্প করছেন। দেখেই চিনতে পেরেছি তাই।'

মনে মনে খুশী হলো সমীর। তার এ বাড়িতে আজকে আসা একটা বিশেষ সংবাদ। সবাই তা জেনে মনে মনে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করেছিলো। আজকে সকাল থেকেই এ বাড়ির সবাই তার কথা ভাবছিলো মনে মনে। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা ভালো লাগার ছোঁয়া আছে। জীবনের বড়ো একটা সঞ্চয় হয়ে থাকে সে ভালো লাগাটুকু।

সমীর যেন টের পেলো তার মনের মধ্যে থেকে সেই তন্ময়টুকু একটু একটু করে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে এবার।

দু'বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখানে কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো।' শাশ্বতী বললো।

সমীর বললো, 'আমাদের ওখানে একদিন যেতে হবে কিন্তু।'

ভাস্বতী বললো, 'আমরা ঠিক করেই রেখেছি, একদিন আপনাদের ওখানে যাবো।'

'তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।' অমিয়বাবু বললেন।

সমীর বললো, 'নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।'

শাশ্বতী এবং ভাস্বতী দু'জনের চোখেই কিন্তু উজ্জ্বল কৌতুক। অনেকগল্পের নায়ক সমীর সবার মতো ঘনিষ্ঠ দুই বোনের কাছে কৌতুকের বিষয় বৈকি! দু'জনের দিকে চোখ রেখে মনে মনে কথাটা ভেবে হাসতে থাকলো সমীর।

একটু পরেই অমিয়বাবুর স্ত্রী এলেন। বাড়িতে পরবার শাড়িখানা যে পালটে এসেছেন শাড়ি খানার দিকে তাকিয়েই টের পেলো সমীর। সেজন্যেই দেরীটুকু।

সুখী সুখী চেহারা ভদ্রমহিলার। তিনি যে শাশ্বতী-ভাস্বতী রিন্টুর মা এ কথাটা কেউ বলে না দিলেও সমীর বুঝতে পারতো। তার চোখেমুখে ছেলে মেয়েদের মতোই টলটলে একটা লাবণ্য। সমীর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারলো, বয়েস গেলে তার মুখখানা প্রতিমার মতো দেখাবে।

'ওঁর কাছে তোমার অতো গল্প যে শুনেছি!' ভদ্রমহিলা মৃদুস্বরে বললেন।

'আমার কিন্তু ভারি ভয় হচ্ছে। গল্পের সমীরকে এবার আপনাদের ভালো লাগবে কিনা।' সেই ভয়টা মিলিয়ে গেছে বলেই রহস্য ক'রে বললো সমীর।

'ভালো লেগেছে বলেই সমীর 'গল্প' হয়েছে কিন্তু।' সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবু বললেন।

সমীর হাসতে থাকলো।

'আজকে বিকেলের আগে কিন্তু ছাড়ছিনে।' অমিয়বাবুর স্ত্রী বললেন।

সমীর কিছু বললো না। কেবল হাসলো। অমিয়বাবু আর তার স্ত্রীর আন্তরিক কথাগুলো তাকে অন্য একটা স্বাদে ভরে দিচ্ছে।

মৃদু স্বরে শুধু বললো, 'বিকেলের আগে যেতো পারবো না জেনেই সময় নিয়ে এসেছি।'

গল্পে গল্পে সময় ফুরোতে থাকলো। অমিয়বাবুর স্ত্রী কাজের জন্য আর বসলেন না। রিন্টু এসে শান্ত হয়ে বসলো একটা চেয়ার। সমীরের মুখোমুখি। সব গল্প যেন নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে রিন্টু। একসময় সেই মেয়েটিও এসে বসলো।

যতো সময় ফুরোতে থাকলো ততোই ঘনিষ্ঠ হতে থাকলো সবাই। দু'বোনের মুখে কথার ফুল ঝুরি ঝরতে থাকলো। রিন্টুও মাঝে মাঝে তাদের কথার সঙ্গে কথা যোগ ক'রে দিয়ে হাসতে থাকলো সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে। অমিয়বাবু মাঝে কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরে এসে ভেতরে চলে গেছেন। বোধহয় স্নান করতে।

সমীরকেও একটু আগে অমিয়বাবুর স্ত্রী এসে স্নানের কথা বলেছিলেন। সমীর স্নান সেরেই এসেছে। কারণ সমীর তো জানেই ভয়টা সত্যি না হলে আজ বিকেলের আগে সে কিছুতেই এখান থেকে বেরুতেই পারবে না।

সমীরের ঘড়িতে বারোটা বাজবার আগেই খাবার ডাক পড়লো। একসঙ্গে খেতে বসলো সবাই। খেতে খেতেই গল্প চলতে থাকলো। অমিয়বাবুর স্ত্রীও খাবার দিতে দিতে তাদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলতে থাকলেন।

এমন একটা পরিবেশ যে গড়ে উঠবে সমীর তা ভাবতেও পারেনি। খেতে খেতে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সমীর আরো গভীরভাবে আনন্দটুকু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলো।

খাবার পরেও ব'সে ব'সে বেশ কিছুটা সময় গল্প হলো। শেষে অমিয়বাবু তুলে দিলেন সবাইকে। না হলে হয়তো দুপুর টুপুর গড়িয়ে যেতো রান্নাঘরেই।

কলতলা থেকে সোজা বাইরের ঘরে এলো সমীর। জিরিয়ে নেবার জন্য আরাম করে শুলো বিছানায়। শুয়ে থাকতেই কখন যেন আলোটুকু ফুরিয়ে এলো। একটু বোধহয় ঘুমিয়েও ছিলো সমীর। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। অমিয়বাবু এসে তার পাশেই বসলেন।

'এবার যেতে হবে।' সমীর হাই তুলে বললো।

'চা হচ্ছে। চা খেয়েই যাবে।'

'শাশ্বতী ভাস্বতী' রিন্টুকে দেখছি না যে!'

'এখনও ঘুমোচ্ছে সব। দেখলুম ওদের মা ওদের ডাকাডাকি করছে।'

একটু সময় কি ভাবলো সমীর। তারপর বললো, 'সত্যি অদ্ভুত ভালো একটা দিন কাটালুম আজকে এখানে এসে।'

অমিয়বাবু হেসে বললেন, 'আমরাও।'

ভেতর দিকের বারান্দায় চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। একটু পরেই ভেতর থেকে রিন্টু এসে সমীর আর অমিয়বাবুকে ডাকলো।

অমিয়বাবুর সঙ্গে বারান্দায় এসে চায়ের টেবিলে বসলো সমীর।

শাশ্বতী আর ভাস্বতীও এসে বসেছে। সারা দুপুর ঘুমিয়ে ওঠায় দু'জনের মুখে এখনও ঘুম ঘুম ভাব একটু গম্ভীর গম্ভীর। চোখ দুটো ঈষৎ ফুলে আছে ব'লে আরো মনোরম লাগছে দু'জনকে। দু'জনেই সমীরের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ চোখে হাসলো। সমীর চা খেতে খেতে দুই কিশোরীকে দেখে পরিচ্ছন্ন একটা ছবি এঁকে ফেললো মনের মধ্যে।

চায়ের টেবিলেও গল্প হলো অনেক। তারপর উঠোনের ওদিকে বড়ো বাড়িটার মাথায় লালচে রঙের যে রোদটুকু ছিলো, সেটুকু ফুরোতেই সমীর উঠে পড়লো। বললো, 'এবার উঠতেই হবে আমায়।'

'আবার আসবেন কিন্তু।' রিন্টু বললো সঙ্গে সঙ্গে।

হেসে সমীর বললো, 'তোমরা আগে যাবে, তারপর।'

রিন্টু বললো, আমরা তো রেডি হয়েই আছি।'

'তাহলে আর কি, যে কোনো একদিন হঠাৎ ক'রে এসে নিয়ে যাবো।'

ভাস্বতী বললো, 'সেই ভালো। হঠাৎ যেতেই ভালো লাগবে আমাদের।'

হাল্কা বাতাসে ভাসতে ভাসতে সমীর ঘরে এলো। একটু যেন বিষণ্ণ লাগছে। জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে ছায়াচ্ছন্ন বিকেলটাকে দেখলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের তলা থেকে ছুতো জোড়া বের করলো সমীর। ঘড়ি দেখলো। জানালা দিয়ে আর রোদ আসছে না। বিকেলটাও ফুরিয়ে গেছে।

ওদের কথাবার্তা এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। ভারি পরিচিত, নতুন আর সুন্দর লাগছে সেই কথাবার্তা। একটা আনন্দের দিন ভারার মতো স্থির হয়ে গেলো মনের মধ্যে।

সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়েই মোজা পরলো সমীর, ছুতো পায়ে ঢোকালো। ফিতে বাঁধলো অন্যমনস্কভাবে।

টেবিলের ওপর ম্যাগাজিন, সিগারেট প্যাকেট ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো প্যাকেটের পকেটে

রাখতে গিয়ে সেই ম্যাপখানার দিকে চোখ পড়লো সমীরের। হাত বাড়িয়ে সেখানা তুলে চোখের সামনে তুলে ধরলো। আর এখানাকে তার দরকার নেই। একথাটা ভেবে সমীর হঠাৎ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে ফের সেই বাসষ্টপে দাঁড় করালো। দেখলো, মনের মধ্যেকার সেই সমীরের হাতে ম্যাপ নেই। আরো ঘুরে নিজেকে ফিরিয়ে নিলো। আরো ঘুরে। তারপর যেখানে ইচ্ছে সেখানে। দারুণ বিস্ময়ে অনুভব করলো যেখানেই সে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই অমিয়বাবুর বাড়ি তার অনুভূতিকে ভ'রে দিয়ে চাঙর হয়ে আছে। সেই অনুভূতির মধ্যে পৌঁছুতে নিশ্চয়ই ম্যাপের মধ্যে আঁকা পথের দরকার নেই।

সমীর অনুভব করলো, হৃদয় দিয়ে আমরা যখন অপরিচয়ের ভয়কে মুছে ফেলি, তখন সমস্ত ম্যাপের রেখা অবান্তর হয়ে যায়।

সমীর আর কিছু ভাবতে পারলো না। ম্যাপখানাকে হাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে জানালা দিয়ে ঘুরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালো। মনে হলো ঘড়িটা আজকে বড়ো তাড়াতাড়ি চলেছে।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশ বছরের বাংলা নাটক ও নাট্যশালা

দেবনারায়ণ গুপ্ত

গত বিশ বছরের বাংলা নাটক ও নাট্যশালা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে বাংলার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কথা কিছু বলা দরকার। ১৮৭২ সালে বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জন্ম, আর দুবছর পরে তার বয়স হবে একশো বছর।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গোড়ার ইতিহাস বড়ই দুর্যোগপূর্ণ। যত বড় ঝড় গেছে তার উপর দিয়ে। সে যুগের নাট্যশালার কর্ণধারেরা ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আর তা ছিলেন বলেই, বহু লাঞ্ছনা, নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অপরেশচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকারেরা অসংখ্য নাটক রচনা করে গেছেন। সে যুগের মুষ্টিমেয় দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই নানা রঙের ও নানা স্বাদের নাটক রচনা করেছিলেন।

রঙ্গরঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগটাই ছিল প্রকৃত পরীক্ষানিরীক্ষার যুগ। কিসে দর্শকদের আকৃষ্ট করা যায়, কি করে দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য তাঁদের অপরিসীম চেষ্টার কথা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। নিত্য নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সাজপোষাক মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি ব্যাপারে যে অর্থ তাঁরা ব্যয় করেছেন তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, নাটক মঞ্চস্থ করে তার সমতুল অর্থও তাঁরা উপার্জন করতে পারেন নি, লাভ তো দূরের কথা। ফলে মঞ্চস্বামিকদের ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছে। ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়েই আবার তাঁরা নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

সেদিনের নাটকগুলি ছিল স্বল্পায়ু। পনেরো দিন থেকে দু'মাস পর্যন্ত এক একটা নাটক চলতো। এর মধ্যে কোন নাটক যদি খুব জনপ্রিয় হোত তাহলে সে নাটক বড় জোর তিনমাস চলতো।

গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' রঙ্গরঙ্গমঞ্চের দিকচিহ্ন। সারা বাংলা দেশে সে-নাটকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই নাটক অভিনয়ের সময় থেকেই রঙ্গমঞ্চ ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু সুখ্যাত চৈতন্যলীলাও খুব বেশী পরমায়ু হয়নি। ১৮৮৪ সালের ২রা আগষ্ট চৈতন্যলীলা খোলা হয়, আর মঞ্চের প্রয়োজনে পুনরায় ২২শে নভেম্বর 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক খুলতে হয়। এইভাবে স্বল্প সংখ্যক দর্শক নিয়ে বাংলার পেশাদারী মঞ্চ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল চলে এসেছে। বহু ধনী ব্যক্তি থিয়েটারের ব্যবসায়ে এগিয়ে এসেছেন। কেউ বা ঋণগ্রস্ত হয়ে, কেউ বা সর্বস্বান্ত হয়ে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখার

চেষ্টা ছিল অব্যাহত। যার ফলে বাংলার পেশাদারী মঞ্চের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মেলা বা প্রদর্শনীতে কিংবা স্বাধীন নরপতি বা রাজামহারাজাদের কাছ থেকে তাঁদের প্রায়ই ডাক আসতো।

১৯২৩ সাল থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। একদিকে আর্ট থিয়েটার, অপরদিকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাজসজ্জা, দৃশ্যপট ও আংগিকের পরিবর্তন সূচিত হয়। এমন কি অভিনয়ের রীতিনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। এই সময় থেকেই নাটক সংক্ষেপিত হোতে থাকে. দীর্ঘ পাঁচ ছ' ঘণ্টার পরিবর্তে বড়জোর সাড়ে তিন ঘণ্টা কি চার ঘণ্টার নাটক লেখা সুরু হয়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রবর্তিত অভিনয়ধারার প্রতি নাট্যামোদীরা আকৃষ্ট হন। তাঁর নাট্য-প্রযোগ কৌশল রঙ্গালয়কে নতুন খাতে প্রবাহিত করে। নাট্যশালার প্রতি বিমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ক্রমশ নাট্যশালার প্রতি আকৃষ্ট হন। আর সেই সঙ্গে দর্শক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু আয়ব্যয়ের তুলনা-মূলক বিচারে পেশাদার মঞ্চগুলি তখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তখনো বছরে অন্তত তিনচারখানি নাটক মঞ্চস্থ করতে হোত। ফলে, আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ভারই বেশী হোয়ে দাঁড়াতো।

এরই মাঝে ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব হল। এঁদের অভিনীত 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' প্রভৃতি নাটকগুলি নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত করে। সাড়া-জাগানো এই নাটকগুলির অভিনয় দেখে অনেকেই নতুন নতুন নাট্যসংস্থা গঠনে প্রয়াসী হন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু নাট্যশালাগুলির দুর্দশা রয়েই গেল ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। ক্রমের ফলে কোন কোন থিয়েটার হস্তান্তরিত হল। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা দুর্ঘটনা হল—নাট্যাচার্য শিশিরকুমারও তাঁর প্রিয়তম মঞ্চটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। এই সময়ে বাংলাদেশের থিয়েটারগুলির অত্যন্ত দুর্দিন গেছে। অতঃপর থিয়েটারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা এমনতর সংশয়ও অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল।

১৯৫৩ সালে স্টার থিয়েটার গৃহ ও মঞ্চের সংস্কার করে নতুন ব্যবস্থাপনায় 'তামলী' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। এই তামলী নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্যে পেশাদার মঞ্চগুলির মোড় ঘুরে গেল। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে একই নাটকের একটানা অভিনয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তামলীর সাফল্যে অন্যান্য মঞ্চ-মালিকরাও উৎসাহিত বোধ করলেন। এই সময় থেকেই বোঝা গেল, নাট্যানুরাগীর সংখ্যা বিপুলভাবে বর্ধিত হয়েছে। এর পর থেকেই পেশাদার মঞ্চগুলি ধীরে ধীরে দুর্দিন কাটিয়ে উঠলো।

সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরিণত নাট্য সংস্থার আবির্ভাব হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁরা আজ সংখ্যায় কয়েক সহস্র। এঁরা কালোপযোগী নানা রসের ও নানা স্বাদের নাটক পরিবেশন করছেন; বহু বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে বা তর্জমা করে বিদেশী নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ করে দিচ্ছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এঁদের প্রয়াস প্রশংসনীয়। নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে (যদিও 'আন্দোলন' শব্দটির সঙ্গে আমি একমত নই) এঁদের দান অপরিসীম। এঁদের কল্যাণে আমরা একদিকে যেমন কয়েকজন বলিষ্ঠ নাট্যকারকে পেয়েছি, অপরদিকে সম্ভাবনাময় বহু নটনটী ও কলাকুশলীকে পেয়েছি। এই সব নাট্য সংস্থার মধ্যে এমন কয়েকটি সংস্থা আছেন যাঁরা প্রায়ই সাধারণ রঙ্গালয়ের মতো টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করে থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আজ এমন সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, সেই সংস্থার প্রতিটি অভিনয়েই প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হোয়ে যায়। এটা কম শ্লাঘার কথা নয়।

আজ প্রতি সন্ধ্যায় কলকাতা শহরের প্রতিটি রঙ্গালয় পাদ-প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সহস্র সহস্র দর্শক নাট্যরস গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

আজকের দিনে সাধারণ রঙ্গালয়ের যে-কোন নাটকের আয়ুষ্কাল একশো রাত্রি। সেদিনের নাটকের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আর সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাট্যকর্মীদের স্থান আজ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

নাট্য প্রবাহ

পোর্ট সেনট্রা। আজকাল বহু নাট্য-সংস্থা নিয়মিত অভিনয় করছেন। কিন্তু নাটক নির্বাচনে তাঁরা প্রায়শই হয় বিদেশী নাটকের অনুবাদ নতুবা কোন উদ্ভট ভাব ও কল্পনাশ্রয়ী নাটককে প্রাধান্য দেন। আমাদের দেশের আদর্শ-সম্পন্ন ক্লাসিক নাটকগুলি আজ অবহেলিত। এই অবস্থায় পোর্ট কমিশনর অফিসের নাট্যসংস্থা পোর্ট সেনট্রা আনন্দমঠ নাটক নির্বাচন করে যে নাট্য ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অমর কাহিনীর আবেদন আজো শেষ পায় নি, বরং আজকের দিনে সেই কাহিনীর ভাবোদ্দীপনাকে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে পৌঁছে দেবার সমধিক প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তাই রবীন্দ্র মেলায় পোর্ট সেনট্রার সভাবৃন্দ কর্তৃক আনন্দমঠের অভিনয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। কাহিনীটিকে নাট্যরূপে গ্রথিত করেছেন বাণীকুমার। সর্বাংশে হৃদয়গ্রাহী এবং সার্থক হয়েছে এই নাট্যরূপ। সম্পাদনা ও নির্দেশনায় বলশ্রী নাট্যশিল্পী গোবিন্দ গাঙ্গুলী উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। বহু চরিত্র সম্বলিত এই নাটকের রূপসজ্জা অভিনয় সুন্দর। তার মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, অজিত ঘোষ (মহেন্দ্র), বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (ধীরানন্দ), অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সত্যানন্দ), সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় (জীবানন্দ) বিদ্বান পাঠক (মহানন্দ), দিলীপ ভট্টাচার্য (টমাস), গীতা নাগ (কল্যাণী), ইন্দিরা দে (শান্তি) এবং গোবিন্দ গাঙ্গুলী (ভাবানন্দ)। মঞ্চ পরিকল্পনায় বিমল চক্রবর্তী এবং আলোক নিয়ন্ত্রণে অজিত মিত্র বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেদিনকার অভিনয়ে শত শত দর্শকের মুহুর্মুহু করতালিধ্বনি প্রমাণ করেছিল যে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ প্রবহী নাটক আজো দর্শকদের খুশী করতে পারে!

তীর্থম নাট্যগোষ্ঠী। বাগবাজারের এই নতুন নাট্য সংস্থা প্রধানত যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে তাঁদের কর্মপ্রকৃতির পরিচয় রাখছেন। ইতিপূর্বে তাঁরা কয়েকটি যাত্রানাট্য পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। এঁদের বর্তমান নাট্যোপহার একটি নৃত্যগীতবহুল বৃহৎ-নাটক "অভিশপ্ত নাচঘর"। নাটকটির রচনায় তরুণ নাট্যকার বটা ভট্টাচার্য মৌলিক অথচ নতুনতর বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন। আধুনিক আংগিকে (যা যাত্রায় চলছে) কাহিনীটি বিধৃত—চলন্ত ট্রেনের পট, বৃহৎ নাটকের উপযুক্ত আবহ-সৃষ্টিকারী ধ্বনি ও আলো, গায়না প্রভৃতির সন্নিবেশ ঘটেছে।

বহু চরিত্রের ভীড় নাটকে। প্রত্যেকটি এক একটি টাইপ। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে নাটকের বৃহত্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনায় তারক রায়ের কৃতত্ব উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের নিরপেক্ষ প্রশংসনীয়। বিভিন্ন স্ত্রী চরিত্রে অংশ নিয়েছেন, সবিতা মিত্র, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেনুকা দেবী ও সুমারী ইন্দু। পুরুষ চরিত্রে ছিলেন, বটা ভট্টাচার্য, তারক রায়, বিজয়

মুখোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দাশগুপ্ত, বিজয় রায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নাট্যকার স্বয়ং, আলোক সম্পাতে ছিলেন যশোময় রক্ষিত।

এই উপলক্ষে এঁরা 'মুক আখর' নাম দিয়ে যে ত্রৈমাসিক যাত্রানাট্য বিষয়ক পত্রিকাটি প্রকাশ করেছেন তার প্রথম সংখ্যাটি আমরা দেখেছি। আশা করা যায়, পত্রিকাটি ক্রমে উন্নতি লাভ করবে। পত্রিকাটির সম্পাদক—নাট্যকার বটু ভট্টাচার্য। প্রথম সংখ্যায় অতিরিক্ত মুদ্রাকর-প্রমাদ পীড়াদায়ক মনে হয়েছে।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। গত মাসে তমলুকে সম্মেলনের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে তরুণ নাট্যকার নীরেন সেন রচিত ও পরিচালিত 'অভিনয় নয়' নামে নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলের প্রশংসা অর্জন করেন রুদ্রক সেনগুপ্ত, নীরেন সেন, সন্তোষ নাথ, সুধাংশু ভট্টাচার্য, রবীন মালাকার ও রাধানাথ সিংহ। নাটকটির সামগ্রিক সুঅভিনয় ও প্রযোজনা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

রূপায়ন। সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে এঁরা দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন—'সীমানা ছাড়িয়ে' এবং 'এই তো সামনে'। নাটক দুটির বলিষ্ঠ বক্তব্য এবং চরিত্র বিশ্লেষণ মনোজ্ঞ। ফলতঃ অভিনয়ও সুষ্ঠু প্রাণবন্ত। প্রথম নাটকটিতে তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল রায়চৌধুরী, আশীষ ভট্টাচার্য ও তারা ভাদুড়ির অভিনয় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। দ্বিতীয় নাটকটিতে সুঅভিনয় করেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য, তারা ভাদুড়ি, শ্যামল রায় চৌধুরী, বীরেন ঘোষ, দেবী রুদ্র ও স্বপন রক্ষিত। নির্দেশনায় ছিলেন তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৌশিকী। গত মাসে মিনার্ভা মঞ্চে এই সংস্থার সভ্যরা রমরাজ অমৃতকালের 'ধাসদখল' নাটকটি অভিনয় করলেন। অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে ঠাকুরদা চরিত্রে মণ্টু চক্রবর্তী, নিতাই-বেশী শংকর চক্রবর্তী, মোহিত চরিত্রে গৌতম মুখোপাধ্যায় ও মোক্ষদার ভূমিকায় রত্না মুখোপাধ্যায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নীতিন বিশ্বাস, অমল মণ্ডল, অশ্বিনী রায়, শিশির মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ সেনগুপ্ত, সুকুমার দাস, আরতী ঘোষ, ইলা সেন, সর্যাণি দাস, স্বপন রায় চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ দাস।

সেন্ট্রাল স্টেশনরি অফিস—কেন্দ্রীয় সরকারের স্টেশনরি অফিস স্টাফ ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করলেন "জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার"। প্রখ্যাত বিদির এই কাহিনীকে নাট্য রূপান্তরিত করেছেন অমরেন্দ্র বসু। অভিনয়ে কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরাংক মজুমদার, আরতি ঘোষ, সবিতা পাত্র, নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায় ও রীণা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আবহসঙ্গীত, আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে।

বাণী বিতান

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে উপলক্ষ করে সহর কলকাতায় যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান শুধু নাচ গান অভিনয় দিয়ে টিকিট বিক্রি করে দর্শকদের মন জোগাবার আয়োজন না করে, সত্যিকারে রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার পরিচয় দেন, বাণী বিতান তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। ঘরোয়া পরিবেশে সুধী শ্রোতৃমণ্ডলী নিয়ে এঁদের অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকে মননশীলতার পরিচয় আর রবীন্দ্র সাধনার প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ। গত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ হেদুয়ার কাছে লাহা ভবনে এঁরা দুটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রথম দিনে আলোচনার বিষয় ছিল, "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য"। বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য সহযোগে

যাঁরা এই বিষয়ে আলোকপাত করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ডঃ উমা রায়, ডঃ কৃষ্ণিরায় দাস, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগানা বিশ্বনাথম, শ্রীমতী প্রীতি রায় ও শ্রীবপজিৎ চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল, "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সঙ্গীত।" এদিন রবীন্দ্র সংগীততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীনির্মলেন্দু বসু, শ্রীমতী প্রীতি রায় ও অধ্যাপক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনার শেষে শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দের পরিচালনায় যে সংগীত পরিবেশিত হয় তাতে অংশ গ্রহণ করেন, শ্রীঅরুণ সান্যাল, শ্রীমতী ইলা বসু, শ্রীপ্রভাত দে, শ্রীমতী সুস্মিতা দাহা, শ্রীঅমৃত মণ্ডল, শ্রীমতী আরতি ঘোষ, শ্রীগণেশ দাস, শ্রীমতী কৃষ্ণা ঘোষ, শ্রীকাজিম সান্যাল, শ্রীমতী সন্ধ্যা দে, শ্রীতপন বসু, শ্রীমতী মাতা ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস।

সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীনির্মলেন্দু বসু সুচারুভাবে সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন এবং ভাষণ দেন ও পরিসমাপ্তিতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাহিত্যিকদের অভিনয়

যাঁদের লেখা পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় তাঁদের যদি আবার মঞ্চের উপর অভিনয় করতে দেখা যায় তাহলে তাঁদের অনুরাগী পাঠকরা দর্শকের আসনে বসে সমধিক আনন্দ লাভ করেন। সাহিত্যিকদের অভিনয়ের তাই একটি আলাদা আকর্ষণ আছে। মনে পড়ছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সেই সময়কার জনপ্রিয় লেখক সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক এবং তারপর অভিনয় হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা।" সেইটাই বোধ করি সাহিত্যিকদের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয়। অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কেদারের ভূমিকায় শৈলজানন্দ, তিনকড়ির ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবিনাশ সেজেছিলেন সুনির্মল বসু, ঈশানের ভূমিকায় ছিলেন অখিল নিয়োগী এবং বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় নেমেছিলেন অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

তারপর থেকে সাহিত্যিকরা মাঝে মাঝে অভিনয় করেছেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "উটরোগ" নাটকটি একাধিকবার সাহিত্যিকরা অভিনয় করেছেন এবং মৃণালদের ছোটদের পাতভাড়ির পরিচালক অখিল নিয়োগী প্রতি বছরই সাহিত্যিকদের দিয়ে তাঁর নাটক অভিনয় করিয়েছেন।

বর্তমানে সাহিত্যিকদের একটি স্থায়ী অভিনয়-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, তার নাম "মঞ্চলেখা"। এঁরা সম্প্রতি রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটে স্বপন বুড়ো রচিত ও শৈলজানন্দ পরিচালিত "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন" নামে নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এই হাস্যরসাত্মক নাটকে যাঁরা প্রশংসনীয় নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, নাট্যকার মন্মথ রায়, স্বপন বুড়ো, দেবনারায়ণ গুপ্ত, কুমারেশ ঘোষ, অধ্যাপক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, শৈলেন চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ সম্পাদক), শিল্পী ধীরেন বসু, রেবতীভূষণ ও বৈদ্য চক্রবর্তী এবং সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

এঁদের পরবর্তী নাট্যোপহার রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" প্রস্তুতি চলছে।

অমৃতবাজার স্টাফ ক্লাব

অমৃতবাজার পত্রিকা এডিটোরিয়াল স্টাফ ক্লাব কমিটি শ্রীবিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীরতনকুমার ঘোষ রচিত "কড়ি দিয়ে কিনলাম" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন গত ৩রা মে, ১৯৭০, বিশ্বরূপা

বঙ্গালয়ে। মানুষের জীবন সমুদ্রের কয়েকটি তুফান, কয়েকটি ঢেউ দর্শকদের সামনে তুলে ধরলেন সাংবাদিক শিল্পীরা প্রায় তিন ঘণ্টা ধ'রে। রূপসজ্জা এবং একক অভিনয় একেবারে ত্রুটিমুক্ত হয়নি, তা হলেও বলা যায় সামগ্রিকভাবে নাটকটি উপভোগ্য হয়েছে। প্রধান ভূমিকাগুলির মধ্যে সনাতনের পার্টে মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরুবেরাগী দিলীপ মৌলিক, মিঃ ঘোষালবেশী সমীর মিত্র এবং ঘাতার বাবুর চেহারায় নিশীথ বড়াল উল্লেখযোগ্য। প্রথমজন চরিত্রানুগ ধীরস্থির ঔজ্জ্বল্যবিহীন অভিনয় করেছেন, দ্বিতীয়জনের অভিনয়ে পূর্ব আইরিশ্যানের দক্ষ ছাপ সুপরিস্ফুট, তৃতীয়জনের চরিত্র ফোটাবার যথেষ্ট প্রয়াস ছিল এবং চতুর্থজন একটি যন্ত্রণাকাতর চরিত্রকে মন্দ ফোটান নি। স্ত্রী-চরিত্রগুলিতে যাঁরা রূপ দিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য সাংবাদিক নন, তাঁরা হলেন—সতীর ভূমিকায় দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীর ভূমিকায় বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, নয়নরঞ্জিনীর ভূমিকায় মধু গঙ্গোপাধ্যায় ও ফরিদার ভূমিকায় নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম দুজন চমৎকার এবং-মাপা অভিনয় ক'রে দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন। শেষ দুজনও খারাপ করেছেন বলা যায় না। নাটকের দৃশ্য সংযোজনা এবং আলোর ব্যবহার খুব ভাল হয়েছে, তবে নাট্যরূপের কিছু ত্রুটি—অর্থাৎ, সংলাপ দু'একজায়গায় অসংলগ্ন, এবং দু'একটি চরিত্র নাটকের পক্ষে অবান্তর—আমাদের চোখে ও কানে ঠেকেছে। সুপরিচালনার জন্যে দিলীপ মৌলিক অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। আর একটি কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না: গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপের পরিপ্রেক্ষিতে সকাল ৯টা থেকে ১২।১২৷৩০ টার মধ্যে অভিনয় না ক'রে বিকেলের দিকে ব্যবস্থা করলে দর্শকরা একটু আরাম পেতেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ

রবীন্দ্রনাথের গান এবং নৃত্যনাট্যগুলির অনুষ্ঠান প্রায়ই হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের যে বিশেষ বিশুদ্ধ ধারা এবং গায়কী পদ্ধতি এবং নৃত্যনাট্যের মধ্যে যে দৃঢ়সম্বদ্ধ পরিমিতিবোধ তাঁর গান এবং নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য, তা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ন হতে দেখি। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ এই বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন এবং অব্যাহত রাখবার জন্যই প্রতি বছর কয়েকটি নৃত্যনাট্যের আয়োজন করেন। এবারেও ৪ঠা থেকে ১৫ই জুলাই রবীন্দ্রসদনে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তার সূচীতে আছে, মায়ার খেলা, ভানুসিংহের পদাবলী, তাসের দেশ, বাল্মিকী প্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা এবং শ্যামা। সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে যাঁদের অংশ গ্রহণের কথা আছে, তাঁদের মধ্যে আছেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, প্রমাণ সেন, পূর্ণিমা ঘোষ, মিহির ঘোষ, শ্যামল বসু, কমলা বসু, ভারতী মুখোপাধ্যায়, অশোক সাউ, আরতী বসু, কেলু নায়ার, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র সিং, গীতা সেন প্রমুখ সংঘের প্রায় আশীজন শিল্পী।

নাট্য দর্শন

নাস্তীকারের তিন পয়সার পালা

জার্মান নাট্যকার বারটোলড ব্রেখট তাঁর দেশের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে 'থ্রি পেনি অপেরা' নামে যে ব্যাঙ্গাত্মক নাটক লিখেছেন তাকেই নাস্তীকারের সর্বাধিনায়ক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সমাজের মধ্যে সংস্থাপন করেছেন বাঙালী-চরিত্র সন্নিবেশ করে। মূল নাটকে পুলিশের অসাধুতার প্রতি প্রত্যক্ষ কটাক্ষ আছে। বাংলা রূপান্তরে পাছে পুলিশকে গাল দিতে ক্যাসাদে পড়তে হয় সেজন্যে নাটকের ঘটনাকালকে পিছয়ে নিয়ে গিয়ে ১৮৭৬ সালে ফেলা হয়েছে। ফলে, নাটকের মধ্যে আধুনিককালের উপযোগী অনেক গালভরা কথা থাকলেও নাটকটি হয়েছে রূপক এবং বাস্তবের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

নাটকটির রচনাশৈলীতে যেমন নৈপুণ্যের পরিচয় আছে, তেমনি অনবদ্য হয়েছে এর অভিনয় এবং প্রযোজনা। অন্য কোন সংস্থা এ ধরণের নানা চরিত্র সম্বলিত প্রযোজনাকে এমন সার্থকভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

এই নাটকের পরাংশ এক সমাজবিরোধী লম্পট মানুষকে নিয়ে। তার একাধিক বিয়ে। সে বারবনিতার সঙ্গ করে এবং আরও নানা দুষ্কর্মের সে নায়ক। খবর পড়ে তার ফাঁসীর হুকুম হয়। কিন্তু সে ফাঁসীতে মরে না। স্বর্গ থেকে চোঙা প্যান্ট পরা শিব নাচতে নাচতে এসে তাকে বাঁচিয়ে দেয় এবং জানা যায় অতঃপর সেই নায়ক মহীন্দ্র সমাজের একজন চূড়ামণিরূপে প্রভূত অর্থ এবং প্রতিপত্তি লাভ করবে—স্বয়ং শিবের ভবিষ্যত বাণী।

বহু চরিত্র আছে এই নাটকে - প্রায় ত্রিশ জন। তাছাড়া বাদ্য ও সঙ্গীতাংশে প্রায় দশজন। গীত রচনায়, সুরারোপে, নির্দেশনায় এবং প্রধান ভূমিকায় অভিনেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা সুলভ নয়। সকলেই অভিনয় করেছে নিখুঁত বর্ণাঢ্যসুন্দর। তার মধ্যে অবশ্য অভিনেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ই একাই একশো। আর অপূর্ব অভিনয় করেছেন স্ত্রী ভূমিকায় শিল্পীরা, যথা. কেয়া চক্রবর্তী, লতিকা বসু, মঞ্জু ভট্টাচার্য, বীণা মুখোপাধ্যায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু ব্রহ্মচারী। পুলিশের কর্তারূপে রঞ্জপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং তাঁর সহকারীরূপে অমলেন্দু চক্রবর্তী চমৎকার দুটি টাইপ সৃষ্টি করেছেন। সে তুলনায় অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিক্ষুকরাজ কিছু নিষ্প্রভ, ঐ চরিত্রটির মধ্যে যে ভারিক্কি ছাপ থাকার দরকার ছিল অভিনেতার চরিত্র রূপায়ণে যেন তার কিছু অভাব পরিলক্ষিত হল, অবশ্য তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন, বিমলাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরাণ মুখোপাধ্যায়, সুবীর বসু, কালিকা শেঠ, অমল ভট্টাচার্য, রণজিৎ চক্রবর্তী, পশুপতি বসু, রাধাবল্লভ পোদ্দার, রঞ্জিত ঘোষ, সুমৌলী আচার্য অরুণেন গুপ্ত, পরিমল মুখোপাধ্যায়, রবিন চক্রবর্তী, অরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং দিবেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, এমন যে অভিনয়, এমন যে প্রযোজনা, তার মধ্যে নাট্যবস্তু বা নাট্য-প্রেরণা কী পেলাম? অযোগ্য ব্যক্তিরা সমাজে উঁচু স্থান পাচ্ছে, এ তো বহু পুরনো কথা। সেই "মুচিরাম গুড়" থেকে এই ব্যাখ্যানা আমরা শুনছি নাটকে দেখছি। আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে দেখাবার জন্যে বিদেশী নাটকের টানাবোনা রূপান্তর না করে মৌলিক নাটক কি লেখা চলত না? তুলনাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ল—ঠিক এই ধরণের এক অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চাশাকে উপেক্ষা করে লেখা একটি সার্থক স্যাটায়ার অভিনীত হচ্ছে রঙমহলে, সুনীল চক্রবর্তীর "আমি মন্ত্রী হব।" এক জাতের নাটক না হলেও মূল লক্ষ্য কিন্তু এক। এবং 'আমি মন্ত্রী হব' অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক। বিদেশী নাটক, বিদেশী নাট্যকার, বিদেশের জীবনদর্শন এসবের প্রতি মোহগ্রস্ত হবার বাল্যকাল পেরিয়েছে আমাদের। তাই আমি নির্দ্বিধায় মনে করি তিন পয়সার পালার চেয়ে আমি মন্ত্রী হব, আমাদের কাছে অনেক বেশি সত্য অনেক বেশি অন্তর ও মস্তিষ্কস্পর্শী।

অভিনেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিশালী লেখনীর অধিকারী। তাই তাঁকে অনুরোধ করব, আর বিদেশী নাট্যকারের দ্বারস্থ না হয়ে এবার তিনি দেশের মানুষকে নিয়ে, দেশের সমাজকে নিয়ে, দেশের সমস্যাকে নিয়ে মৌলিক নাটক লিখুন।

পুরাতন পাতা

বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সকল বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'হিতবাদী'।—১৮৯১ সনের ৩০এ (?) মে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পত্রিকা-প্রকাশের প্রাক্‌কালে তিনি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন :—

"ভ্রাতঃ—আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কোম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫,০০০৲ টাকা মূলধন। ২০০৲ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমলবাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। যাই হোক, ইতিমধ্যে দু'তিন মাসের লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাকে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে। আবার, কথা হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একটা করে ছোট গল্প থাকবে। তোমাকে এই সঙ্কটের সময় আমার সহযোগিতা করতে হচ্চে।" ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃঃ ৩০)

২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 'হিতবাদী' সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ আছে, তাহা এই :—

'সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণকমল বাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত এখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।' ('আত্মপরিচয়,' পৃঃ ১২৪)

'সাধনা'—রবীন্দ্রনাথ ৪র্থ বর্ষের 'সাধনা' (অগ্রহায়ণ ১৩০১—কার্ত্তিক ১৩০২) সম্পাদন করেন। শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত তাঁহার পত্রে প্রকাশ :—

"সোনার তরী 'কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকাতেই লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত

রবীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।" ('আত্মপরিচয়', পৃ: ১২৪-২৫)।

'ভারতী'।—১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৭৭) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' আদর্শে 'ভারতী' জন্মলাভ করে। ১ম—৭ম বর্ষের (১২৮৪-৯০) পত্রিকা সম্পাদন করেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৮ম-১৮শ বর্ষের (১২৯১—১৩০১)—স্বর্ণকুমারী দেবী, ও ১৯শ-২১শ বর্ষের (১৩০২-০৪)—হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। ২২শ বর্ষের (১৩০৫) পত্রিকা সম্পাদনের ভার পড়ে—রবীন্দ্রনাথের উপর। এক বৎসর পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশ :—

"এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম।...সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়া-কর্ম্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানা রূপ বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কর্ণধারের মত পত্রিকার চূড়ার উপর সর্ব্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্র সম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত,—সমস্ত দিন ক্ষেতের কাজ খাটিয়া রুগ্ন প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান্ দিতে হয়;—তাহাতে পরমধৈর্য্যবান্ গ্রাহকেরও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাঁহার বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন। এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর যষ্টিখানা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

'বঙ্গদর্শন' (নব পর্য্যায়)।—১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস (ইং ১৯০১) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নব-পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। ১ম সংখ্যায় তিনি লেখেন :—

"বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, 'বঙ্গদর্শন' নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল প্রাচীন মহারথী এখনও ইহলোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এবং যে সকল আধুনিক লেখক বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাস শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদর্শনের নামে তাঁহারা নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য চেষ্টায় উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন।

পাঠকের দাবী যত কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্ব্বদা সচেষ্ট-সচেতন থাকিতে হইবে। সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।"

রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর (১৩০৮-১২) 'বঙ্গদর্শন' পরিচালন করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রিয়নীরোহন সিংহকে লিখিত পত্রে 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে এই সংবাদটুকু আছে :—

"আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া

তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। তরুণ বয়সে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প।...বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসর চালাইয়া তাহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে বিদ্যালয় লইয়া নিযুক্ত আছি।" (আত্মপরিচয়', পৃঃ ১২৪-২৬)

'ভাণ্ডার'।—রবীন্দ্রনাথ যখন 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনে নিযুক্ত, সেই সময় তিনি আর একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন ; উহা – 'ভাণ্ডার'। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯০৫)। পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১ম সংখ্যায় লেখেন : –

"আমাদের এই কাগজখানি যাহাতে অধিকাংশ লোকের অবসরের উপযোগী হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাণ্ডারের কর্তৃকর্ত্রী নানা ছোট লেখা সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। সেই সঙ্গে যদি দেশের লোকের উপকার হয় সে ত ভালই। কারণ শাস্ত্রে বলে—'যা লোকযাত্রানির্বাহিনী তদুভূতাং সা চাতুরী চাতুরী,' যাহাতে মানুষের ইহকাল পরকাল দুইই রক্ষা হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী।"

রবীন্দ্রনাথ দুই বৎসর 'ভাণ্ডারের' সম্পাদক ছিলেন—ইহাই সাধারণের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে তিনি তৃতীয় বর্ষের (১৩১৪) বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় যুগ্মসংখ্যাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। যেমন লাইব্রেরি সঙ্কলিত তালিকাতেও (৪র্থ কোয়ার্টার ১৯০৭) ইহার উল্লেখ আছে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।—রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ হইতে ১৩২১ সাল (ইং ১৯১১-১৪) পর্যন্ত চারি বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

* * * *

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সরকারের পেয়াল খুশীমত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই ছিল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলফ্রেড থিয়েটারে প্রবন্ধটি পঠিত হয় এবং পঠিত হইলে মোহন বাগানের অনুরোধে সেই সঙ্গে কবির অবিস্মরণীয় ভারত বন্দনা "দেশে দেশে মন্ত্রিত করি মন্ত্রিত তব ভেরী" গানটিও সেইদিন বিপুল জনতার সামনে গীত হয়।]

যাঁদের কথা যায় না ভোলা

[ডেভিড হেয়ার]

অখিল নিয়োগী

সকালের কলকাতার রাস্তা ধরে একটি পাল্‌কি চলেছে হুকুমদা হুকুমদা!

একটি বেঁটে খাটো সায়েব—মাথায় চকচক করছে টাক, পেছন দিককার বাকি কেশরাশি কিঞ্চিৎ কোঁকড়ানো। সায়েব দু'ধারে দেখতে দেখতে চলেছেন।

সায়েবের সঙ্গে রয়েছে একটি ছোট ব্যাগ। তাতে রয়েছে কিছু বিস্কুট আর সন্দেশ।

উদ্বোধ্য আর গভীর-দুঃখী মুখ শুকনো ছেলে দেখলেই সায়েব সেই ব্যাগ থেকে বিস্কুট কি সন্দেশ তার হাতে গুঁজে দিচ্ছেন।

পাল্‌কি আবার এগিয়ে চলেছে হুকুমদা—হুকুমদা! ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি কিশোর ছেলে ছুটে গেছে সেই পাল্‌কির পেছনে—

তারা পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আর বাকি সুরে আবেদন জানাচ্ছে—

"—Me poor boy...
Have pity on me
Me take in your school"

ওরা বিনা বেতনে হেয়ার সায়েবের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়।

কিন্তু ডেভিড্ হেয়ার সায়েব ইতিমধ্যেই বহু ছাত্রকে বিনা বেতনে ভর্তি করে নিয়েছেন।

সে ইস্কুলে আর আদৌ জায়গা নেই।

হঠাৎ যদি হেয়ার সায়েব বুঝতে পারেন এই ছেলেটি সারাদিন না খেয়ে রয়েছে—অমনি পাল্‌কি থেকে নেমে খপ করে তার হাত ধরে ফেলেন।

– চলো, মিঠাই খাইবে চলো—

সায়েবের কাছে মিঠাই খেলে পাছে 'জাত' যায়, সেইভয়ে ছেলেটি ঝুঁকড়ে যায়, হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সায়েবের হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড় শক্ত।

ছেলেটির শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে যায়।

সায়েব বুঝতে পেরেছেন ছেলেটির আপত্তির কারণ। তাই মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

তারপর মাথা দুলিয়ে বলেন, আরে বাচ্চা, হামার হাতে খেতে হোবে না। মিঠায়ের দোকানে চলো, পেট ভরে মিঠাই খাও—

হো-হো করে হাসতে থাকেন ডেভিড হেয়ার। সায়েব সত্যি সত্যি একটি মিঠায়ের দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

সারা মাস ধরে যত মিষ্টি তিনি এইসব শুকনো মুখ ছেলেদের খাওয়ান—মাসের শেষে হিসেব করে সব টাকা মিটিয়ে দেন।

এইভাবে সায়েবের খরচ বেড়েই চলে।

অদ্ভুত মানুষ এই ডেভিড্ হেয়ার সায়েব।

বিদেশ থেকে এদেশে এলেন ঘড়ির ব্যবসা করতে। কিন্তু ভগবান যে কখন কাকে দিয়ে কি কাজ করিয়ে নেবেন, তা কেউ বুঝতে পারে না!

পাল্‌কির পেছন পেছন ভর্তী হবার জন্যে যারা দৌড়ুত তাদের দিকে হেয়ার সায়েব নজর রাখতেন। যখন দেখতেন দিনের পর দিন দৌড়ে অনেক ছেলে সরে পড়েছে কিন্তু দু' একটি ছেলে দু'মাস দৌড়েও হতাশ হয়নি, এমন তিনি তাদের কাছে ডাকতেন। তারপর তাদের 'স্কলিপ্' দিয়ে দিতেন।

ডেভিড্ হেয়ার সায়েব একটি ভিজে গামছা নিয়ে ইস্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যাদের মুখ শুকনো, কিম্বা ধুলো-বালি মাখা, ওই ভিজে গামছা দিয়ে তাদের মুখ মুছিয়ে দিতেন। তিনি ছাত্রদের বলতেন, তোমরা পরিষ্কার হয়ে ইস্কুলে আসবে। নিজের জামা-কাপড় নিজে হাতে কেচে নেবে।

হেয়ার সায়েব ষ্কটল্যাণ্ড দেশের লোক। এদেশে তিনি আসেন ঘড়ির ব্যবসার কাজ নিয়ে। কিন্তু সেদিকে সায়েবের মন নেই। এদেশের ছাত্রদের কি করে লেখাপড়া শেখাবেন তাই দিনরাত চিন্তা করছেন।

এদেশের মানুষরা কিন্তু তাকে পাগ্‌লা সায়েব মনে করতেন।

কিন্তু সে ব্যাপারে হেয়ার সায়েবের এতটুকু মনকোভ ছিলনা। কিভাবে ঘরে ঘরে ছেলেদের মধ্যে বিদ্যা ছড়িয়ে দেবেন এই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

ঘড়ির ব্যবসা করতে করতে এদেশের অনেক মানুষের সঙ্গে ডেভিড্ হেয়ার সায়েবের আলাপ হয়। পরে সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

হেয়ার সায়েবের দোকানে কেউ ঘড়ি কিনতে গেলেই তিনি দেশের ছেলেদের শিক্ষার কথা নিয়ে আলোচনা সুরু করে দিতেন।

রামমোহন রায় যখন কলকাতায় এসে বসবাস সুরু করলেন, সেই সময় ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

রামমোহন রায় তখন "আত্মীয়-সভা" স্থাপন করেছেন। এই সভায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, ধর্ম এবং সমাজ সংস্কার সম্পর্কে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা হত। হেয়ার সায়েব একদিন নিজের থেকেই রামমোহনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তখন দুই বন্ধুতে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হল।

অনেক আলোচনার পর স্থির হল যে, এদেশের ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

আত্মীয়-সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড্ ইষ্টের কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরে তাঁর আনুকূল্যে ও সদযোগিতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার তারিখ ২০শে জানুয়ারী, ১৮১৭। সেই বছরই মূলতঃ ডেভিড্ হেয়ার সায়েবের উদ্যোগে ও সেই সময়কার বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদের সাহায্যে "স্কুলবুক সোসাইটি" নামে একটি সভা স্থাপিত হল। আর এই স্কুল বুক সোসাইটির সভ্যবৃন্দ ছাত্রদের উপযুক্ত ইংরাজী ও বাঙ্‌লা বই প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজে আত্ম নিয়োগ করলেন।

সেই সময় রামমোহন রায় হেয়ার সাহেবের সহযোগীতায় নতুন পদ্ধতিতে ছেলেদের জন্যে নতুন নতুন পাঠ-পুস্তক রচনা করতে লাগলেন।

১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে "স্কুল সোসাইটি" নামে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সূত্র-সূচনা হল। হেয়ার ও শোভাবাজার রাজবাটীর রাধাকান্ত দেব তারা যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। সম্পূর্ণ নতুন প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল।

হেয়ার সারাদিন ছেলেদের শিক্ষাদানের কাজে নিজেকে এত বেশী জড়িয়ে ফেললেন, যে, তাঁর ঘড়ির ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হতে লাগলো। অবশেষে তিনি মন স্থির করে ফেললেন। বুঝলেন, দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

তাই তিনি তাঁর এক বন্ধু মেসার্সের কাছে এই ঘড়ির ব্যবসা বিক্রী করে দিলেন। এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে তিনি কলকাতা শহরের মাঝখানে খানিকটা জমি কিনে ফেললেন। নিজে অতি সাধারণ ভাবে বাস করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে তিনি নিজের আদর্শ ও কর্মপন্থা স্থির করে ফেলেছেন। এদেশের বালকদের শিক্ষাদান কার্যে তিনি পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন।

এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি ঠনঠনে কালিতলা, আড়পুলি প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করে ফেললেন।

হেয়ার সাহেবের প্রতিদিনকার কাজ ছিল—সকালবেলা কিছু আহার করে একটি পাল্কিতে চেপে এখন যেটা হেয়ার ষ্ট্রীট সেই অঞ্চলে তাঁরবাসগৃহ থেকে বহির্গত হতেন। একে একে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতেন। তারপর যে সব গরীব ছেলের অসুখ করেছে খবর পেতেন, তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখাশোনা করতেন। প্রয়োজনবোধে তাদের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতেন।

সকল কাজ সমাধা করে তিনি হিন্দু কলেজে উপস্থিত হতেন। প্রত্যেকটি ক্লাশে গিয়ে ছেলেদের খোঁজ খবর নিতেন। কোন্ ছেলে ঠিক মত পড়াশোনা করছে না, কার বাড়ীতে অসুখ, কার বিদ্যালয়ে আসবার উপযুক্ত পোষাক নেই—এই সব সন্ধান করতেন। তার পর যথাসাধ্য সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হতেন।

সন্ধ্যাবেলা হেয়ার সাহেব আবার নিজের বাস-ভবনে ফিরে আসতেন।

সে সময়ে হেয়ার সাহেব এত বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, যে সকাল বেলা তাঁর মুখ দেখলে সবাই মনে করতেন যে, সময়টা ভাল যাবে।

হেয়ার সাহেব যে শুধু গরীব ছেলেদের পড়ার বই কিনে দিতেন তাই নয়, সময় সময় ওদের খেলবার জন্য ফুটবলও উপহার দিতেন। তখন ত' কলকাতা শহরে কাঁকা মাঠের অভাব ছিল না! ছেলেরা দল বেঁধে বেলা ফুটবল খেলত, আর হেয়ার সাহেব যাতায়াতের পথে ওদের খেলা দেখে প্রচুর আনন্দ লাভ করতেন।

হেয়ার সাহেব যে অঞ্চলে যেতেন ছেলের দল এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতো। ছোট ছোট বাচ্চারা তাঁর হাত ধরে ঝুলত কিংবা তাঁর কাঁধে ওঠবার চেষ্টা করত।

হেয়ার সাহেব আপন মনে হাসতেন। যে সব ছেলে পড়াশোনার জন্য অথবা বৃত্তি লাভের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত—তিনি তাদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। রাত একটু বেশী হয়ে গেলে

তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতেন ছেলেরা আপত্তি জানালে তিনি বলতেন, এই সময় অনেক মাতাল সাহেব ঘুরে বেড়ায়—তাই সঙ্গে এসেছি।

ছেলেটি হয়ত তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় চলে এসেছে, খানিকবাদেই কড়া নড়ে উঠল। বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল, অমুক বাড়ী ফিরেছে ত?

হেয়ার সাহেবের গলা!

এমনি করে মায়ের মতো সতর্ক দৃষ্টিতে তিনি ছাত্রদের সকল রকম বিপদের হাত থেকে আগলে রাখতেন।

এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেও হেয়ার সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই দেশে বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

বেথুন সাহেব, হেয়ার সাহেব এবং বিদ্যাসাগর মশাই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজেও এক যোগে অনেক উল্লেখযোগ্য সংগঠনের পথে এগিয়ে চলেছেন।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি—সে সময়ে কলকাতার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। সাধারণ মানুষ কলকাতার দূষিত পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করত এবং তাতে অনেক সময় অসুখ হয়ে পড়ত। পেটের অসুখেই বেশী লোক ভুগত। বাইরে থেকে যে সব ছাত্র কলকাতায় শিক্ষালাভ করতে এসে এই ভাবে পীড়িত হয়ে পড়ত, হেয়ার সাহেব তাদের মা-বাবা ছিলেন। যত দিন না তারা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠত,—হেয়ার সাহেবের নাওয়া খাওয়ার জ্ঞান থাকত না। দিবারাত্র রোগীর শয্যা পার্শ্বে মায়ের মতন বিনিদ্র হয়ে বসে থাকতেন।

হিন্দু কলেজ স্থাপনে যখন প্রথম পরিকল্পনা করা হয় তখন স্যার হাইড্ ইষ্টের আনুকূল্যে এক কমিটি গঠনের কথা ওঠে। বলা বাহুল্য শিক্ষাবিস্তারের এই কাজে রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড্ হেয়ার সাহেব অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু দেশের সনাতন পন্থী রাজা ও জমিদারগণ যখন শুনলেন যে, কমিটিতে রামমোহন রায় রয়েছেন,—তখন তাঁরা বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে এই কমিটিতে থাকতে ও অর্থ সাহায্য করতে নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন।

স্যার হাইড্ ইষ্ট এই ব্যাপারে বিব্রত বোধ করে ডেভিড্ হেয়ারকে ডেকে পাঠালেন। সব কথা শুনে হেয়ার সাহেব বল্লেন, রামমোহন রায়কে আমি বিলক্ষণ জানি। খবর শোনবা মাত্র তিনি নিজেই কমিটি থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেবেন।

ডেভিড্ হেয়ার যা বলেছিলেন, তাই ঘটল। রামমোহন রায়কে খবরটা জানানো মাত্র তিনি বললেন, সে কি কথা! কমিটিতে আমার নাম থাকায় কি এত বেশী প্রয়োজন, যে জন্যে একটা ভালো কাজ নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি তৎক্ষণাৎ কমিটি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ডেভিড্ হেয়ার চিরকাল শিক্ষা বিস্তারের কাজে রাম মোহনের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হয়েছেন। এই বিষয়ে দুই বন্ধুর কোনো মনোমালিন্য হয় নি।

কলকাতায় যখন এই ভাবে শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে চলছিল—সেই সময় শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীগণও ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে ও প্রসারে এগিয়ে এসেছিলেন। এই কাজে তাঁদের দানও উল্লেখযোগ্য।

হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও একটি অমর নাম, যিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে বিশেষ একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বহু কারণে এ দেশীয় অভিভাবকবৃন্দ ডিরোজিওর কাজে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ছাত্রমহলে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে তিনি যে অনন্য সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন একথা তেতিস হেয়ারও স্বীকার করতেন।

নানা জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের কাজে এবং এদেশের ছাত্রদের কল্যাণকর কর্মে আত্মনিয়োগ করে হেয়ার সাহেব বহু টাকার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এই রকম শোনা যায় যে, মহামতি তেতিস হেয়ারের এই অর্থকৃচ্ছতার সময় রাজা দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এক সময় তাঁকে ষাট হাজার টাকা ঋণ স্বরূপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হেয়ার সাহেব তাঁর সব ঋণ শোধ করতে না পেরে কিছু ভূ-সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরও এক সময়ে হেয়ার সাহেবের শিক্ষা বিস্তারের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু টাকা বিভিন্ন সময়ে দান করেছেন।

হেয়ার সাহেব শেষ জীবনে কলুটোলার নিকট একটি বাড়ীতে বাস করতে থাকেন।

হেয়ার সাহেব সারা জীবন কৌমার্য ব্রত ধারণ করেছিলেন। ছাত্ররাই তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল। এজন্যে তিনি আর নিজের জন্য আলাদা সংসার করেন নি।

শেষ জীবনে তাঁর প্রিয় বেহারা ছাড়া আর কেউ সঙ্গী ছিল না। সেই তাঁর সব কাজ দেখাশোনা

১৮৪২ সালের ৩১শে তারিখে রাত্রি একটার সময় তিনি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হন।

দুই একবার বাহ্য আর বমি হবার পরই তিনি বুঝতে পারলেন—এ যাত্রা আর তাঁর বাঁচবার কোনো আশা নেই।

নিজের বেহারাকে ডেকে বললেন, যাও, গ্রে সাহেবকে গিয়ে বলো আমার কফিন নিয়ে আসতে।

সকাল বেলা ডাক্তার ডাকা হল।

হেয়ার সাহেবের প্রিয় ছাত্র মেডিক্যাল কলেজের উত্তীর্ণ নাম করা ডাক্তার প্রসন্ন কুমার মিত্র খবর পেয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর জীবন রক্ষার জন্য সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল।

চিকিৎসার ত্রুটি ছিল না; বন্ধু আর সুহৃদ জনের সেবা-শুশ্রূষারও অভাব ঘটে নি: কিন্তু কিছুতেই এই দারুণ ব্যাধির উপশম হল না।

রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সেই যুগে কলেরা রোগ হলে সর্বাঙ্গে ব্লিস্টার লাগানো হত। সেই অনুসারে হেয়ার সাহেবের গায়েও ব্লিস্টার লাগানো হয়েছিল।

পরদিন বিকেলের দিকে তিনি ধীর ভাবে নিজের চিকিৎসক ছাত্রকে ডেকে বললেন, প্রসন্ন আর ব্লিস্টার লাগিও না,—আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

জীবনের অবশিষ্ট আর কয়েক ঘন্টা শান্ত ভাবে যাপন করে ১লা জুন সন্ধ্যায় হেয়ার সাহেব মানব লীলা সম্বরণ করেন।

পরদিন সকালবেলা হেয়ার সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনে সারা কলকাতা শহরের অধিবাসীবৃন্দ হায় হায় করতে লাগল।

সারা কলকাতা শহরের ছাত্রমহল যেন পিতৃহীন হল।

সবাই পাগলের মতো একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য হেয়ার সাহেবের বাসভবনের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল।

সেই বাসভবনের সামনের রাস্তা একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

তখন কথা উঠল কোথায় তাঁর সমাধি হবে?

হেয়ার সাহেব খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। সেইজন্য খৃষ্টানদের কবরখানায় তাঁর স্থান লাভ করা সম্ভবপর হল না।

অবশেষে তাঁরই হেয়ার জমিতে—হিন্দু কলেজ সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তাঁকে সমাহিত করা হল।

তাঁর মরদেহ যখন করুণাঘাটার বাড়ী পরিত্যাগ করে রওনা হল,—তখন হাজার হাজার মানুষ সেই শবযাত্রার অনুগামী হল।

একজন বিদেশী অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে সেদিন কলকাতাবাসী যে অশ্রু বিসর্জন করেছিল—ইতিহাসে বুঝি তার তুলনা নেই।

বৌবাজার স্ট্রীট থেকে মাধব দত্তের বাজার পর্যন্ত সমগ্র রাজপথ মানুষের মাথায় একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

একদিকে সারা শহরে যেমন শোকের বন্যা অন্যদিকে আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে ঝড়ও সুরু হয়ে গেল।

হেয়ার সাহেবকে বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হল।

আজও পথিক কলেজ স্ট্রীট অতিক্রম করে যাবার সময় দু'দণ্ড ডেভিড হেয়ারের মূর্ত্তির কাছে থমকে দাঁড়ায়।

তাঁর মস্তক আপনা থেকেই নত হয়ে আসে!

কল্লোল কালি-কলম

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কালি-কলমের সৌভাগ্য কিনা জানি না, প্রথম সংখ্যা থেকেই এ বিজ্ঞাপন দেখে আসছি, তার ওপর বিক্রিও মন্দ হলো না। ভেবেছিলাম বুঝি আমাদের কপাল ফিরলো।

কিন্তু কপাল বুঝি এত সহজে ফেরে না।

পত্রিকার সব খরচ যিনি বহন করছেন সেই শিশির নিয়োগীর হাতেই খরচপত্রের হিসাবের খাতা। লাভ হচ্ছে না লোকসান হচ্ছে তিনিই জানতেন।

আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল—লোকসানের দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে লাভ হলে কিন্তু নেবার ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয়ই থাকবে।

কথাটা শুনে শিশিরবাবু মুখ টিপে একটু হেসেছিলেন—এইটুকু মনে আছে।

সে হাসির অর্থ তখন বুঝতে পারিনি।

যাই হোক্, ভাল কাগজ করবো, ভাল লেখা লিখবো তাইতেই আমাদের আনন্দ, সেইটুকুই আমাদের লাভ।

মনোযোগ দিয়ে নানারকম ভাবে লিখতে লাগলাম প্রেমের আর আমি।

কিন্তু মুস্কিল বাধলো সংসারের দিকে তাকিয়ে। টাকা চাই। টাকা না হলে সংসার চলে না।

প্রেমেনেরও সংসার আছে, অথচ সে একটা পয়সাও নেয় না। কারণ তার সংসারের ভাবনা তাকে ভাবতে হয় না।

মুরলীর একটি ইস্কুলের শিক্ষক।

অথচ আমারই সব চেয়ে বেশি নির্ভাবনায় থাকবার কথা।

সে-সব কথা বলতে হলে অনেক কিছু বলতে হয়। সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

সে-কথা থাক্।

শিশিরবাবুর কাছ থেকে 'কালি-কলমের' লাভ-লোকসানের হিসাব চাই না, অভাব যখন জানাই তখন তাঁর কাছ থেকে কিছু চাই। দু'দশ টাকা দিতে তিনি মুঠাবোধ করেন না।

লেখা এবং সংসার দু'দিক রক্ষা করতে গিয়ে দু'এক জায়গায় চাকরি যে করিনি তাও নয়।

কিন্তু সে চাকরি বড় বলার চাকরি।

'কালি-কলমে'র জন্য একটি গল্প চাইতে গেছি পরশুরামের (রাজশেখর বসু) কাছে।

তিনি বললেন, আপনার লেখা ভাল গল্প আর দেখতে পাচ্ছি না কেন?

বলেছিলাম, একটু সামলে নিই, তারপর ভাল গল্প লিখবো।

—কী সামলাবেন ?

—কালি-কলম কাগজখানা নিজের পায়ে দাঁড়াক্, তারপর—

রাজশেখরবাবু ভালবাসতেন আমাকে, আর ভালবাসতেন আমার লেখাকে তক্ষুনি বলে বসলেন, চাকরি করবেন ?

বললাম, পেলেই করি।

জিজ্ঞাসা করলেন, টাইপ করতে পারেন ?

—পারি। টাইপ্ করতে জানি। শর্টহ্যাণ্ড জানি।

সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল্ বাজিয়ে ডাকলেন তাঁর একজন কর্মচারীকে। জিজ্ঞাসা করলেন, টাইপ্-রাইটার মেসিনখানি আছে ?

তিনি বললেন, আছে।

রাজশেখরবাবু বলে দিলেন, কাল থেকে সেই মেসিনে ইনি কাজ করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হয়ে গেল।

পরের দিন ঠিক দশটার সময় আপিসে যেতেই টাইপরাইটার মেসিনের সামনে সেই ভদ্রলোক আমাকে বসিয়ে দিলেন।

বসে আছি তো বসেই আছি, কিন্তু কাজ কোথায় ?

ইংরেজি একখানা ক্যাটালগের একটি পৃষ্ঠা তিনি আমাকে টাইপ করতে দিয়েছিলেন।

বুঝেছিলাম—কাজ কিছু নেই।

ক্যাটালগের পাতাটা টাইপ করতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। টাইপ-করা কাগজটি নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে ধরে দিয়ে বললুম নিন। এবার কি করবো বলুন।

গম্ভীরমুখে তিনি একখানা সাদা কাগজের প্যাড্ আমার হাতে দিয়ে বললেন, গল্প লিখুন বসে বসে।

হাঁ, গল্প লিখতেই আমি চেয়েছিলাম।

ভেবেছিলাম, অবসর একটু সচ্ছল হলেই মনের আনন্দে গল্প লিখবো।

কিন্তু কোথায় গল্প ? চাকরি পেয়েছি, তবু সাদা কাগজের পাতা সাদাই রইলো। একটা লাইনও লিখতে পারলাম না।

সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম—বড় বিচিত্র এই মানুষের মন। মনের কোন্ অবস্থায় যে মানুষ গল্প লেখে—সে রহস্য বুঝা বড় শক্ত।

রাজশেখরবাবুর কল্যাণে দিন দশ-পনেরো কাটালাম ধানাই-পানাই করে। টাইপ্রাইটারে কাগজ ঢুকিয়ে কতরকমের কত ছেলেমানুষী করলাম। ইংরেজি টাইপে বাংলা গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম—যেমন ধরুন—সেদিন ছিল রবিবার। আপিসের ছুটি। (Sedin chhilo Rabibar apiser chhuti) ইত্যাদি ইত্যাদি।

খানিকটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললাম। আপন মনেই হাসলাম।

কিন্তু এরকম করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

গল্প চাই। কালি-কলমের জন্য ভাল একটি গল্প না হলে চলবে না। গল্পের জন্য বলেছি রাজশেখর-বাবুকে, বলেছি শরৎদাকে (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

রাজশেখরবাবু বলেছেন—আপনার গল্প আগে বেরুবে, তারপর আমার গল্প পাবেন।

প্রেমেনকে গল্পের জন্য বলেছি সে নাকি আরম্ভ করেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য মনের খেলা! একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরেই হোক যেমন খুশি, তেমনি খেয়ালে কাগজ-কলম নিয়ে। একটি গল্পের প্রায় আধখানা লিখে ফেললাম। তিনদিন লাগলো গল্পটি শেষ করতে।

কিন্তু এ গল্প যদি কালি-কলমে দিই, আমার সংসার অচল।

এমন দিনে প্রেমেনের লেখা পেয়ে গেলাম। প্রেমেনের লেখাটি কালি-কলমে দিয়ে আমার লেখাটি পাঠিয়ে দিলাম 'বঙ্গবাণীতে'। 'বঙ্গবাণী' ভাল টাকা দেয়। হাতে হাতে পঁচিশটি টাকা নিয়ে এলাম উমাপ্রসাদের কাছ থেকে। (উমাপ্রসাদ—স্যার আশুতোষের ছোট ছেলে)

নিজের অভাবের জন্য কালি-কলমকে বঞ্চিত করতে হলো।

এদিকে ঠিক এই সময়ে একটি ভারি মজার কাণ্ড ঘটে গেল।

কালি-কলমের জন্য গল্প চেয়েছিলাম শরৎচন্দ্রের কাছে।

শুনলাম আমাদের জন্য তিনি একটি গল্প লিখেছেন।

শোনবামাত্র মুরলীধর আর আমি গল্পটি আনবার জন্য ছুটলাম পাণিত্রাসে।

পাণিত্রাসে গিয়ে শুনলাম শরৎচন্দ্র কলকাতায় চলে গেছেন, ফিরতে রাত্রি হবে।

তাঁর সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই ফিরবো না—প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি কলকাতা থেকে। তখন শরৎকাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখনও ফিরলেন না।

ধানের মাঠের ওপর দিয়ে স্টেশনে যাবার পথ। জল কাদা ভেঙে রাত্রির অন্ধকারে যেউলটি স্টেশনে গিয়ে ট্রেণ ধরা—অসম্ভব। কি করবো তাই ভাবছি—এমন সময় পাল্‌কিতে চড়ে শরৎদা ফিরলেন।

আমাদের দেখে খুব খুশী।

তিনি তো খুশী হলেন, কিন্তু যে-দুঃসংবাদটি তিনি আমাদের দিলেন, তা শুনে আমরা খুশী হতে পারলাম না। কালি-কলমের জন্য যে-গল্পটি তিনি লিখেছিলেন সেটি তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন 'কালি-কলম' আপিসে। আমাদের দেখা না পেয়ে ফেরার পথে গিয়েছিলেন ভবানীপুর—উমাপ্রসাদের কাছে। উমাপ্রসাদ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র—কলকাতায় এসে তার সঙ্গে দেখা না করে ফেরেন না।

শরৎচন্দ্র বললেন, উমাপ্রসাদকে যেই বলেছি গিয়েছিলাম শৈলজার কাছে—তার কালি-কলমের জন্য একটি গল্প নিয়ে। অমনি গল্পটি সে দেখতে চাইলে। দেখতে চেয়ে আর ফেরত দিলে না। জোর করে একরকম কেড়েই নিলে বঙ্গবাণীর জন্যে। বললে, শৈলজাবাবুর জন্যে আর একটি গল্প লিখে দেবেন।

দাতা দেয় তো বিধাতা দেয় না!

কালি-কলমের ইতিহাসে এ ছিল একটি বিরল সৌভাগ্য।

তা থেকেও সে বঞ্চিত হলো।

আমি বললাম, আমি একটি গল্প লিখেছিলাম কালি-কলমের জন্যে। কিন্তু টাকার প্রয়োজন ছিল বলে

গল্পটি আমি বঙ্গবাণীতে দিয়েছি। বঙ্গবাণী যখন আপনার গল্প পেয়ে গেল তখন আমার গল্পটি আমি উমাপ্রসাদের কাছ থেকে চেয়ে এনে কালি-কলমে ছেপে দেবো।

উমাপ্রসাদের কাছে গিয়েছিলাম আমার গল্পটি ফিরিয়ে আনতে। গল্পের জন্যে যে টাকা আমি অগ্রিম নিয়েছি সে টাকা অবশ্য নিয়ে যেতে পারিনি। বলেছিলাম আর একটি গল্প দিয়ে সে টাকা শোধ করে দেবো।

কিন্তু গল্পটি সে ফেরত দেয়নি।

শরৎচন্দ্রের অনুরোধে 'বঙ্গবাণী'র একটি সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের 'সতী' আর আমার 'সমাপ্তি' পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল।

শুধু ছাপা নয়, আমি তখন বীরভূম জেলার রূপসীপুর গ্রামে। হঠাৎ মণিঅর্ডারে তিরিশটি টাকা পেলাম। মণিঅর্ডার গিয়েছিল উমাপ্রসাদের কাছ থেকে। ভেবেছিলাম বুঝি আমার জন্য ভুল করে দু'বার টাকা সে দিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তা নয়, পরে জেনেছিলাম—শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদকে বলেছিলেন, গল্পটি আমার খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া শৈলজার টাকার খুব দরকার। তাকে আরও তিরিশটি টাকা পাঠিয়ে দাও।

কালি-কলমের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না।

এ ইতিহাসের সত্য জানিয়ে রাখা ভাল।

তখনকার দিনে নতুন এবং পুরাতন এমন কোনও লেখক ছিলেন না—যাঁদের লেখা কালি-কলমে প্রকাশিত হয়নি। জীবনানন্দের মত কবিকে প্রথম আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য কালি-কলমের। নজরুল ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতায় অনেকগুলি ছাপা হয়েছে কালি-কলমে।

যতদিন প্রয়োজন ছিল, 'কল্লোল' আর 'কালি-কলম' প্রাণপণে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছে।

• • •

রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা বহুমুখী। দেশপ্রেমিক বীর বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পেয়েই গেয়ে উঠেন :

"সার্থক জনম আমার—জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জীবন মাগো তোমায় ভালবেসে।"

খেলাধূলা

জ্যোতির্ময়

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে খেলাধূলার অগ্রগতি।

স্বাধীনতার আগে এদেশে খেলাধূলার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রধানত ব্যক্তিবিশেষ বা সংগঠন বিশেষের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায়। সেদিন অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই খেলাধূলার ব্যাপারেও ব্রিটিশ সরকার কোন সক্রিয় সহযোগিতা করেনি বরং অনেক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে ভারতীয়রা বাধা পেয়েছে।

কলকাতার তথা ভারতের প্রথম ক্রীড়া সংস্থা ইনডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সেদিন শ্বেতাঙ্গদেরই প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সে সময়ে প্রথম ডিভিসন লীগে কোন ভারতীয় দলকে খেলতে দেওয়া হোত না।

১৯১১ সালে মোহনবাগান শীল্ড জেতার পর ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয়দের কিছু সম্মানের চোখে দেখতে সুরু করলেন শ্বেতাঙ্গ ফুটবল কর্মকর্তারা এবং শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেল। তারপর এরিয়ানস দলও প্রথম ডিভিসনে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিয়ম করা হল যে প্রথম ডিভিসনে দুটির বেশি ভারতীয় দল খেলতে পারে না। এই নিয়মের ফলেই কুমারটুলী ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসনে প্রথম স্থান অধিকার করেও প্রথম ডিভিসনে প্রমোশন পেল না, অনেক আন্দোলনের পর ১৯২৮ সালে কলকাতা ফুটবলের এই কায়দাকানুন বন্ধ হয়। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এইভাবে প্রতি ক্ষেত্রেই অধিকার অর্জনের জন্যে ভারতীয়দের লড়তে হয়েছে। খেলাধূলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

স্বাধীনতার পর খেলাধূলার ব্যাপক প্রসার হয়েছে এবং সরকারও অনেক ক্ষেত্রেই সক্রিয় সাহায্য করছেন। ফলে আজ ভারত খেলাধূলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সরকারের সাহায্যের ফলেই অনেক খেলোয়াড় বিদেশে যাবার সুবিধা পাচ্ছেন। স্বাধীনতার আগে এ উৎসাহ তাঁরা পাননি।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আজো ভারতের সাফল্য বড় নয় তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের চেয়ে আজ ভারতীয় দল বা অ্যাথলীট বা খেলোয়াড় নিজেদের অনেক বেশী তুলে ধরতে পেরেছেন।

স্বাধীনতার পরেই ভারতের চেষ্টাতেই দিল্লীতে প্রথম এশীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই প্রতিযোগিতায় ভারত ফুটবলে স্বর্ণ পদক লাভ করে। এছাড়া ওখানে সাঁতারে শচীন নাগ প্রথম ভারতীয় হিসাবে স্বর্ণ পদকের অধিকারী হন।

হেলসিঙ্কিতে ভারত ১৯৫৮, ৫২, ৫৬ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশীয় ক্রীড়ায় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব লাভ করে।

স্বাধীনতার পর ভারতের খেলাধূলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ক্রিকেট টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের কাছ

থেকে রাবার কেড়ে নেওয়া। স্বাধীনতার পরেই ভারত অস্ট্রেলিয়াকে তিনবার হারিয়েছে এবং নিউজীল্যাণ্ডের কাছ থেকে রাবার জিতেছে।

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল টেনিসে এবং সাঁতারে ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবদা। টেনিসে যেমন রমানাথ কৃষ্ণান সাঁতারে তেমনি মিহির সেন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ক্রিকেটেও ভারতের এমন সব খেলোয়াড় দেখা দিয়েছেন যাঁরা বিশ্ব একাদশে স্থান পাবার যোগ্য। এই সূত্রে বোলিংএ প্রসন্ন এবং বেদীর নাম করা যেতে পারে।

প্রসন্নকে তো মেনেই নেওয়া হয়েছে যে বর্তমানে তাঁর সমকক্ষ স্পিন বোলার জগতে আর কেউ নেই। একদা এই সম্মানের অধিকারী ছিলেন ভারতেরই বিনু মানকড়।

খেলাধূলায় অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতের মান আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছোয় নি বলে বিভিন্ন মহলের যে অভিযোগ তা অসঙ্গত নয়। তবে কি কারণে সেটা ঘটছে তা দেখার প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতির মারপ্যাঁচে অনেক প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে খেলাধূলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যারা শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রে সামাজ অস্ত্রহাতে সমস্ত কিছু বিপর্যস্ত করতে চায়, নিজেদের কায়েমী স্বার্থ আর সস্তা ও প্রাথমিক বজায় রাখাই যাদের একমাত্র কাজ তাদেরই অদৃশ্য হস্তক্ষেপে খেলাধূলার ক্ষেত্রে অনেক সাধু প্রচেষ্টা সুফল লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। খেলাধূলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্নীতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং রাজনীতির খেলা চলেছে সেসব কাটিয়ে উঠতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে, তাতে সন্দেহ নেই।

এক নূতন খেলা।

তার নাম ওরিয়েন্টেশন। কত রকমের দৌড়ের প্রতিযোগিতা আছে; তার মধ্যে ম্যারাথন-ই নাম করেছে সবচেয়ে বেশী। ওরিয়েনটেশনও এক রকম দূর পাল্লার দৌড়-প্রতিযোগিতা। কিন্তু বড় বিচিত্র তার পদ্ধতি আর নিয়ম-কানুন।

রাশিয়ায় এই খেলার প্রচলন খুব বাড়ছে। বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও এই খেলা চালু হয়েছে। তবে এখনো তেমন জনপ্রিয় হয় নি।

এই প্রতিযোগিতায় নামতে হলে শুধু দৌড় বিদ্যা জানলেই চলবে না। ম্যাপ ও কম্পাসের সঙ্গে সম্যক পরিচয় রাখতে হবে। দৌড়ের সঙ্গে ম্যাপ এবং কম্পাস কেন? কেন তাই বলি।

এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীকে এমন একটি পাহাড়ী বা বনজ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে পথঘাট তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেখানে দৌড় সুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে দেওয়া হবে একটি ম্যাপ ও একটি কম্পাস। যে ম্যাপটি তাঁকে দেওয়া হবে তাতে চিহ্নিত থাকবে কয়েকটি চেক পয়েন্ট বা স্থানীয় অঞ্চলের নির্দিষ্ট কয়েকটি বস্তুর অবস্থিতি নির্দেশ করছে।

প্রতিযোগীর কাজ হল, ম্যাপের সঙ্গে মিল রেখে কম্পাসের সাহায্যে প্রথম চেক পয়েন্ট থেকে দৌড়ে যাওয়া। এই পথ, সব কটি চেক পয়েন্ট ধরে, সবচেয়ে কম সময়ে যিনি শেষ করতে পারবেন তিনিই পাবেন বিজয়ীর সম্মান।

এই দৌড়ের বিচিত্র ব্যবস্থা মোটেই সহজ নয়। প্রথমত যে পথে প্রতিযোগীকে যেতে হবে তা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত এবং খেলা সুরু হবার ঠিক আগেই ম্যাপ ও কম্পাস পাওয়ার ফলে চেক-পয়েন্টগুলিও তাঁর অজানা। দ্বিতীয়ত, কি রকম গতিতে এবং কোন পথে যেতে হবে তারও কোন নির্দেশ নেই, নিজের খেয়াল-খুশী মতো পছন্দসই পথে আগে পিছে যেতে পারা যাবে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনা না করে এলোপাথাড়ি দৌড়লে শুধু মূল্যবান সময়ই নষ্ট হবে না, ফলাফলও আশাপ্রদ হবে না। তৃতীয়ত, নিজস্ব বুদ্ধি, শারীরিক ক্ষমতা এবং সহনশীলতার উপর প্রতিযোগীর অগ্রগতি নির্ভরশীল। চতুর্থত, কে আগে পৌঁছোচ্ছে তাও প্রতিযোগিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না, কারণ সকল প্রতিযোগীকে এক সময় ছাড়া হয় না, একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এক একজনকে ছাড়া হয়ে থাকে। পঞ্চমত, সেলার মাঠ বা স্টেডিয়ামের বদলে কয়েকবর্গ মাইল জঙ্গল কিংবা পাহাড়ী জায়গায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বলে যে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়বে সেই যে জিতবে তার মানে নেই। শুধু ভাল দৌড়বাজ হলেই চলবে না। তার সঙ্গে প্রতিযোগীকে মস্তিষ্কের কাজও করতে হবে প্রচুর। অর্থাৎ ম্যাপ দেখে চেক পয়েন্টের অবস্থিতি এবং কম্পাস দেখে দিক নির্ণয়—বুদ্ধি দিয়ে যে প্রতিযোগী এই দুটি কাজ নির্ভুল ভাবে করতে পারবেন তিনিই জয়ী হবেন। খুব জোরে ছুটলেন প্রতিযোগী কিন্তু চেক পয়েন্টের সন্ধান সময় মতো পেলেন না তাহলে তাঁর জোরে ছোটা কোন কাজে লাগল না। কারণ প্রতি চেক পয়েন্টেই কে কত সময়ে পৌঁছোলেন তার হিসাব রাখা হয় এবং সেই হিসাব মিলিয়ে যে প্রতিযোগী সবচেয়ে কম সময়ে চেক পয়েন্টগুলি ছুঁয়ে শেষ সীমায় পৌঁছোন তিনিই বিজয়ী সাব্যস্ত হন।

ভারী মজার দৌড় এই ওরিয়েনটেশন।

একজন প্রতিযোগীকে দৌড় সুরু করার নির্দেশ হল। তিনি দৌড় সুরু করলেন। ম্যাপ দেখছেন। আঁকা বাঁকা লাইনে আঁকা পথের এক স্থানে প্রথম চেক পয়েন্ট! পথ অজানা। কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন। কিন্তু একী, এই খানে এসে তো প্রথম চেক পয়েন্ট পাবার কথা! কিন্তু কোথায় সেই চেক পয়েন্ট? পথ গুলিয়ে ফেলেছেন তিনি। আবার পিছন দিকে ছুটলেন। একটা বাঁকের মুখে গিয়ে ম্যাপ দেখলেন, এই যে এই পথের শেষে প্রথম চেক পয়েন্ট! সেই পথে এগিয়ে গিয়ে পেলেন চেক পয়েন্ট। সেখানে সময় নেওয়া হল। তিনি কখন্ দৌড় সুরু করেছেন তা আগে থাকতেই জানা আছে এখানকার সময়-পরীক্ষকদের। তাঁরা দেখলেন, কত সময় লেগেছে এই প্রতিযোগীর প্রথম পয়েন্টে আসতে। সময় নেওয়া হল, প্রতিযোগী ছুটলেন দ্বিতীয় চেক পয়েন্ট অভিমুখে। তেমনি অজানা পথ। ভরসা ম্যাপ আর কম্পাস। এইভাবে সবগুলি চেক পয়েন্ট পার হয়ে শেষ সীমায় পৌঁছোলেন প্রতিযোগী। এমনি করে একের পর এক প্রতিযোগী দৌড় শেষ করলেন। তারপর বিচারকরা প্রত্যেকের সময় পরীক্ষা করলেন!

একজন প্রতিযোগী হয়ত খুব জোর দৌড়েছেন কিন্তু একাধিকবার পথ হারিয়ে ফেলায় তাঁর সময় লেগেছে বেশি আর একজন হয়ত তত জোর জোরে ছোটেন নি কিন্তু মাথা খাটিয়ে চেক পোয়েন্টগুলির সঠিক পথ নির্ণয় করতে তাঁর আটকায়নি। তাই প্রতি চেক পয়েন্টে পৌঁছোতে তাঁর সময় লেগেছে কম! তাই তিনিই বিজয়ীর সম্মান ও পুরস্কার পেলেন।

বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ

অনুশীলন সমিতির

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর এই সোসাইটি সভ্যদিগের একটি প্রকৃষ্ট মিলন ক্ষেত্রের অবকাশ দিয়াছে। এইরূপ Camouflage অথবা সন্দেহ নিরাকরণে সহায়তা করিয়াছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে সভ্যদিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল, সাধনা সিদ্ধি লাভ করিল—তাহাতে কি উল্লাস! বহু বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর সকলের প্রাণাধিক প্রিয় অনুশীলন সমিতি পুনর্জীবিত হইল ইহাতেই পরম তৃপ্তি ও সন্তোষ। সমিতির পুরাতন সভ্যেরা মিলিত হইতে লাগিলেন এবং ইহার ইতিহাস ও কাহিনী আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করিতে লাগিলেন।

অনুশীলন সমিতির সভ্য যুবকবৃন্দ নানারূপ পরিস্থিতির মধ্যে যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করিত তাহা দুর্লভ। নিঃস্বার্থপরতা, কর্মকুশলতা, দায়িত্বজ্ঞান, স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিপদ্বরণ নির্ভিকতা, উদারতা, দৃঢ়পণ, বিচক্ষণতা, মহানুভবতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, মানবসেবা নিঃস্বার্থ পরোপকার, নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্তি, দেশাত্মবোধ, সঙ্ঘ সংগঠন, ও পরিচালনাশক্তি প্রভৃতি সদ্গুণাবলী সকল সভ্যই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন। সুমহান উদ্দেশ্য সম্মুখে না থাকিলে বা সুকঠিন কর্মে লিপ্ত না থাকিলে প্রতিভার উন্মেষ হয় না। সমিতির মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন যে সকল সভ্য ছিলেন তাঁহাদেরই কার্যকলাপে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনুশীলনী শিক্ষার সার্থকতা অবিসম্বাদী। সমিতির দুচারজন সভ্য সন্ন্যাস অবলম্বন করেন যথা স্বামী বলদেবানন্দ—দেরাদুন কিষণপুর রামকৃষ্ণমিশনের আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক। নেপাল ব্রহ্মচারী, যুক্তপ্রদেশে জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগের চারিত্রিক উৎকর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের বিমল নৈতিক চরিত্র আদর্শ স্থানীয়। ভদ্রতা ও শালীনতা অনুকরণীয়। তাঁহারা সকল ক্ষেত্রেই সংযত ব্যবহার করিতেন। কি পথে, কি বিদ্যালয়ে কি পরিষদ্যে, কি কর্মস্থলে, কি অন্য কোন স্থানে কোনরূপ অশিষ্ট আচরণ করিতেন না। বিশেষতঃ সভাসমিতি বা সাধারণ স্থানে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেন না। সকলকেই স্নেহ করিতেন। ভালবাসিয়া হৃদয় জয় করিতেন। কাহাকেও হেয় জ্ঞান বা ঘৃণা করিতেন না। তাঁহারা স্ত্রী জাতিকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্বদা সংযত ব্যবহার করিতেন। বয়োবৃদ্ধকে ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

সভ্যরা বিশেষ পরোপকারী ছিলেন। বিপন্নদিগকে সকল প্রকারে সাহায্য করিতেন। দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারদিগকে সাহায্যের জন্য প্রতি রবিবার গৃহস্থদিগের নিকট হইতে মুষ্টি ভিক্ষায় চাল সংগ্রহ হইত। সভ্যদিগের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবা করিবার বন্দোবস্ত হইত। সেকালে কোনরূপ সংস্কার সমিতির অস্তিত্ব ছিল না। সমিতির সভ্যেরা সংবাদ পাইলেই বিধাহীন চিত্তে অনতিবিলম্বে মৃতের সৎকার করিতেন। বস্তুতঃ মৃতের সৎকার যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। এক কথায় বলিতে গেলে সমাজের Motto ছিল Love all, hate none. যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগের চরিত্র গঠন করিয়া তাহাদের শক্তি সৎকর্মে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য যথা—Y.M.C.A. Youngmen's Christian Association, Boy Scouts, উহার অনুকরণে আমাদের দেশেও ব্রতচারী সঙ্ঘ, Sevasamiti, Students' Federation প্রভৃতি পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের আদর্শ, গঠন প্রণালী ও কার্যাবলীর সহিত তুলনা করিলে অনুশীলন সমিতির প্রাধান্য উপলব্ধি হইবে। কারণ এই সমিতিতে যুবকদিগের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের প্রয়াস হইয়াছিল। সর্বোপরি এই সমিতিতেই একমাত্র গীতার মহৎ শিক্ষা সম্পূর্ণ অতিশয় নিষ্ঠার সহিত অনুসৃত হইত। বিশেষতঃ গীতার "নিষ্কাম কর্ম" ধ্যান ও ধারণার বস্তু হইয়াছিল। "হন্যাৎ ন্যায়ের যুদ্ধায় নৈব পাপমবাপ্স্যসি" কর্মপ্রেরণা দিয়াছিল। কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নাই কেবল "মরের সাধন, কিবা শরীর পতন।" এই জন্যই অনুশীলন সমিতির সফলতা বিস্ময়কর।

সম্প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যুবকদিগের জন্য বিশেষ করিয়া একটি গঠনমূলক কার্য্য দিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন—তাহাদের দুর্জয় সাহস, বিপুল উদ্যম, অসীম উৎসাহ দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত করিতেছেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যদি অনুশীলন সমিতির আদর্শে ইহা সংগঠিত করেন তবেই এই প্রশংসনীয় উদ্যম ফলপ্রসূ হইবে, মাতৃভূমির মঙ্গল সাধিত হইবে, জন সাধারণ উপকৃত হইবে—নচেৎ ভারতীয় স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা সম্ভব হইবে না।

অনুশীলন সমিতি মনুষ্যত্বলাভের যে উচ্চ আদর্শ স্থাপনা করিয়াছিল সকল যুগেই তাহার আবশ্যকতা আছে। জন্মভূমি শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছে বলিয়া যে এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে তাহা নহে। স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক তৈয়ারি করিবার জন্যও ইহার উপযোগিতা বিদ্যমান। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, দুর্নীতি দমন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তবেই জাতির মঙ্গল। পরাধীন অবস্থায় অনুশীলন সমিতির উপযোগিতা অপেক্ষা এখনকার প্রয়োজনীয়তা শতগুণ অধিক।

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে অনুশীলন সমিতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নিজস্ব চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী পুনঃপ্রবর্তন করিয়া মানুষ তৈয়ারীর কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে।

অধুনা যুবকসম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ ছাত্র সমাজের, মধ্যে নানাপ্রকার দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে কি অভিভাবকবৃন্দ কি শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলী সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। যুবকেরা ক্রীড়াশীল ও আলস্য পরায়ণ হইয়াছে। একটিমাত্র উদাহরণ উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহারা পাঠাভ্যাস অবহেলা করিয়া ক্রিকেট, ফুটবল ও সিনেমার টিকিটের জন্য 'কিউ' লাইনে অথবা সময় অপব্যবহার করে। তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই স্বীকার করিবেন যে ভবিষ্যতের আশাভরসাস্থল যুবকবৃন্দকে আত্মোন্নতির পথে লইয়া যাওয়া আবশ্যক।

অনুশীলন সমিতি সজীবিত থাকিয়া ভারতের যুবকসম্প্রদায়কে যুগে যুগে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করুক, নব নব প্রেরণা দিক—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত মানুষ তৈয়ারী করুক—সমিতির পুরাতন কর্মীবৃন্দের এই প্রার্থনা ফলযুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হউক।

ভক্ত হিন্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ৺সতীশচন্দ্র বসু বাং ১২৮৩ সালে ইং ১৮৭৬ খৃঃ কলিকাতায় মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান কলিকাতা ৯১নং বেচু চাটার্জী ষ্ট্রীট ঠনঠনিয়া কালীতলার পূর্বদিকে। ২৩শে আশ্বিন ১৩৪৪, ইং ৯ই অক্টোবর ১৯৩৮ খৃঃ স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিসমাপ্তির তৃপ্তি লইয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

পরিশিষ্ট (১)

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি—

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বনামধন্য পুরুষ। অগ্রজ স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে তিনিও ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া কারারুদ্ধ ও দ্বীপান্তরিত হন। তাঁহার "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তকে অনুশীলন সমিতি ও বিপ্লবী কর্মীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

পরিশিষ্ট (খ) অনুশীলন সমিতির উৎপত্তি বিষয়ে সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি :—

"আমি আগে ৺নারায়ণচন্দ্র বসাকের আখড়ায় (গৌর মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট) ব্যায়াম করিতাম। এই স্থান হইতে আমি জেনেরাল এসেমব্লী কলেজের মিলনাত্মক ক্লাবে ভর্তি হই। ৺গৌরহরি মুখোপাধ্যায় (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত) এই ক্লাবের দাতার ছিলেন। কলেজের অধ্যাপক Mr. Wann উপরোক্ত ব্যায়াম ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ঐ ক্লাবে লাঠিখেলার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এইজন্য ইহার পর আমরা মিত্র লেনে একটি ছোট লাঠি খেলার ক্লাব স্থাপন করিলাম। আমরা উপদেশ গ্রহণের জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিকট যাইতাম। যথা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দ, Sister Nivedita প্রভৃতি। এই সূত্রে সোদপুর তেঘরার শশীচৌধুরী আমাদিগকে ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে লইয়া যান। আমি শশীবাবুকে বলি আমাদের সভাপতি বা নেতা নাই। চৌধুরী ক্লাবের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই কর্মের উপযুক্ত লোক হইতেছেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। চৌধুরী মিত্রের নামে পত্র দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে সব কথা বলিলে তিনি excited হইয়া আমাকে আপটাইয়া ধরিলেন। পরে তিনি ক্লাবের Commander-in-Chief বা পরিচালক হইলেন। সাতদিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্বপ্রকারের training (সামরিক শিক্ষা) তাহারা দিবে। তাহাদের সহিত তোমাদের amalgamate (সংযোগ) করিতে হইবে।" আমরাও রাজী হইলাম। এই সময়ে উভয় দলে মিল হইয়া গেল। তাহার ফলে যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাস (দেশবন্ধু) ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সঙ্গে দলে আসিলেন, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের মামা) ব্যারিষ্টারদ্বয়। সন্ধ্যের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করার জন্য হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড়া দলকে দান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হইল। বরোদা হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন যখন মিত্র লেনের

আখড়া পৃথক ভাবে থাকুক। আমাদের অল্প বয়সের সভ্যেরা (junior members) মন্ত্র মিত্র লেনের আখড়ায় থাকুক আর বয়স্ক সভ্যরা (senior members) যতীনবাবুর নেতৃত্বে আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করুক।

এই সময়ে অরবিন্দ একবার ছদ্মবেশে মন্ত্র মিত্র লেনের আখড়ায় আসিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয়ের কাছ হইতে শ্রবণ করি।"

পরিশিষ্ট (২)

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী / ১৩৬৩ সাল)

যাদুবাবুর মূল্যবান গ্রন্থ হইতে সমিতির গঠন, লক্ষ্য ও পরিচালন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইল।

অনুশীলন সমিতির জন্ম, উত্থান ও ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ইতিহাস দেশের, বিশেষ করে বাংলা দেশের, নবযুগের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মানুষ হিসাবে যদি আমরা কিছুই না হইতাম তবে উন্নতি, স্বাধীনতা এসব কথা অর্থহীন হয়ে যায়।

এ রকম প্রশ্ন উঠেছিল প্রবর্ত্তকদের মনে। নিউ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটএর হেড মাষ্টার নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সতীশ বসু, পুলিন মুখার্জী প্রভৃতির সঙ্গে চিন্তার মিল পেয়ে প্রথমে তাঁর স্কুলে সমিতির অধিবেশন করেন। দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে তাঁহাদের নজর দিয়েছিল। এই রকম অবস্থায় সমাজের সেবায় তাঁরা মন দেন। আর্ত্তের সেবা, বিপন্নকে সাহায্য ছিল বড় একটা দফা তাঁদের কার্যসূচীতে। বঙ্কিমবাবুর চাদা ছাঁচে তাঁরা নিজেদের গড়তে চাইলেন।

দেশ, দেশ, আমাদের এই দেশ! একেই আমাদের বড় করতে হবে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, সব রকমে একে তুলতে হবে। 'সমিতি' প্রথম দেশপ্রেমের ডাক শুনল—বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট, যোগেন বিদ্যাভূষণের নিকট, এবং সর্বশেষে জীবন্ত, জাগ্রত, তেজোবীর্য্য-সম্পন্ন বিবেকানন্দের কাছে। সেবা-সমিতি প্রেরণার উৎস সন্ধানে গিয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বিবেকানন্দের বাণী—'ওঠো, জাগো, মোর জনের কথা শুনে এগিয়ে চলো'—ভারতের আনাচে কানাচে পৌঁছেছিল। স্বামীজির দেহাবসানের পূর্বে 'সমিতি'র প্রতিষ্ঠা কর্ত্তারা সাক্ষাৎ ভাবে স্বামীজির সঙ্গে যোগাযোগের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন, উপদেশ অনেক নিয়েছিলেন।

অনুশীলন সমিতি প্রকাশ্য কর্মভার নিয়ে চলতে আরম্ভ করে। এর কার্য্যসূচী ও কর্মীদের সেবাকার্য্য দেশের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

অনুশীলন সমিতি সমগ্র বাংলায় একটা ছিল। সঞ্চালক বা নির্দেশক (Director) ছিলেন মিত্তির সাহেব (ব্যারিষ্টার পি. মিত্র)। সমিতির নাম বাজারে, দরবারে ও পাতাবে ছড়িয়ে পড়ল।

সমিতির নির্দেশক দুটী কার্য্যকরী কেন্দ্র বা চক্র গঠন করেন :—

(ক) আভ্যন্তরীণ (Inner Circle)। (খ) বহির্ভাগীয় (Outer Circle)।

আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা গুপ্ত বিভাগের মতোই ছিল। সাধারণ সভ্যেরা এটির সংবাদ জানতেন না। এইখান দিয়ে অরবিন্দ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব), সি. আর. দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন)

সুরেন ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে 'অনুশীলন'এর নির্মলেন্দু মিত্র সাহেবের সঙ্গে যোগ ছিল। সমিতির কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী গঠন কার্য্য কতকটা সাময়িক ঢঙে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গঠন কার্য্য সম্পন্ন হলে বৈদেশিক শাসনযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবেন, এইরূপ ভাববারা কর্তৃপক্ষের মনে ছিল।

বহির্ভাগীয় বিভাগ জনমত গঠন ও গণসংযোগপ্রভৃতি লাভের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করত। সমিতির সভ্যদের মন, মত, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি, সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা হ'ত। প্রচার, আন্দোলন আনুষ্ঠানিক গঠন এদিক দিয়ে চলত। লোক-সংগ্রহ হত এবং এর থেকে লোক বাছাই করা হত। ভবিষ্যত বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। দারা বাংলায় এইভাবে আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চলেছিল।

Criminal Law Amendment Act of 1908 দ্বারা বাংলার অনুশীলন সমিতি ১৯০৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং উঠে যায়। উহার সঙ্গে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি, সুহৃদ-সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতিও বেআইনী ঘোষিত হয়।

'অনুশীলন সমিতি' প্রকাশ্যভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সভ্যদের অনেকের মনে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ জাগে। নরেন ভট্টাচার্য (আধুনিক এম, এন. রায়) জ্ঞান মিত্র, সুধীর রায় চৌধুরী এই অবস্থাটা মেনে নিতে চাইছিলেন না। তাঁরা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) কাছে যাতায়াত বাড়ালেন এবং সরকারকে একটা প্রখর জবাব তখনই দেবার পক্ষপাতী হন। যতীন্দ্রনাথ দেশের অবসাদ ও দুর্দশাকে চুপচাপ মেনে নেয়ার বিরোধী ছিলেন।

যশোহর জেলার মাগুরা অঞ্চলের অনুশীলন-এর নেতা হীরালাল রায় যতীন মুখার্জীকে (বাঘা যতীন) অনুশীলন-এর সঞ্চালক পি. মিত্রের কাছে নিয়ে যান। এর থেকে তিনি প্রধান দল বা অনুশীলন এর সভ্য হন। রাত্রে রাত্রে অনুশীলন সমিতির ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অফিসে আরো কিছু পুরাণো সভ্যের সঙ্গে তিনিও আসতেন। এইজন্য অনুশীলনের ছেলেরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল—যেমন নরেন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী, নীরেন রায়গুপ্ত, জ্ঞান মিত্র, প্রভৃতি।

যুগান্তর

আসল গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে দুটো দল নিয়ে—অনুশীলন ও যুগান্তর। প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে প্রথমে একটা বড় দল ছিল—'অনুশীলন সমিতি'। এরই ভিতর থেকে যুগান্তরের উদ্ভব। কিন্তু যুগান্তরের বিবৃতি হয়েছে অন্যান্য ঝোঁক বা উপদল গুলিকে সঙ্গে নিয়ে। যুগান্তর নাম নিয়ে দল চলে ১৯২০ সালের পর। এই নামের প্রতি সমস্ত অন্তরে নতি জানিয়েছেন বহু তেজোদীপ্ত যুবা, ত্যাগী, তাপস বীর। 'যুগান্তর' নামটারই কেমন যেন একটা মন মাতানো শক্তি ছিল। 'যুগান্তর' কাগজ থেকেই দলের নাম ঐ হয়েছিল। (পত্রিকার জন্ম মার্চ ১৯০৬ সালে)

[ক্রমশঃ

[* শ্রীজীবনতারা হালদার প্রণীত "বাংলার প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত।]

এই প্রথম

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সবত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেন না তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে দেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

গোপীবল্লভপুরের তরুবালা

শৈলজা চৌধুরী

কোনদিন কি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পথে গিয়েছিলাম আমি। কোনদিন কি বৈশাখ মাসের তপ্ত দুপুরে গোপীবল্লভপুর পথযাত্রী-সংঘের বাসে উঠেছিলাম। কিম্বা কোনদিন বুঝ ডাকা ভর বেলায় তন্দ্রার মধ্যে একটা ডাক শুনেছিলাম—ভরু গোপীবল্লভপুর এসেগেল। কে জানে মনেহয় একটী রাঙা ডুরে শাড়ী পরা মেয়ে নেমেছিল সেই বাস থেকে। কিম্বা সবই কল্পনা আমার। হয়তো বা গোপীবল্লভপুরের বৌয়াশীর কাছে শুনেশুনে রচনা করে নিয়েছিলাম তাকে। কিন্তু সেই ভরুবালাটুকু তো স্বপ্ন নয়!

বেশ মনে আছে একটী বারোতেরো বছরের মেয়ে আমাদের পথ আগ্‌লে বলেছিল—তোমরা বুঝি পথ হারিয়েছ?

উপন্যাসের নায়িকা নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা নয়, একেবারে রক্তমাংসে গড়া একটী মেয়ে। ছোট কপালথেকে চুলের রাশ উঁচু করে তোলা, ডুরে শাড়ীটী গাছ কোমর করে বাঁধা, ডাগর-ডাগর দুটো চোখ তুলে প্রশ্নকরে—তোমরা কি পথ হারিয়েছ? বকুলগাছের তলায় অন্ধকার, সাদাফুল, সাদাফুলের আলো এসে পড়েছে পাতার ফাঁকে, সেইখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটী জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবে তোমরা? এ যে রহস্যের পথ।

আমাদের কিন্তু বলবার সুযোগ না দিয়েই বলে—এসো এটী দিয়েই নিয়ে যাবো তোমাদের।

কি চমৎকার চেহারা মেয়েটীর, কাটা-কাটা নাকচোখ যেন একটী সরল প্রতিমা।

জিজ্ঞাসা করি—তোমার নাম কি খুকি?—

ভরু, গোপীবল্লভপুরের ভরু।

এরপর আমাদের সামনে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে। সে যেন একটী হরিণী। এর পর বৌরাণীর কাছে তরুবালার কথা শুনি। বৌরাণীর বয়স হোয়েছে, তিনি অনেক ঘুরেছেন, অনেক দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি বলেন—দেখতো, এই মেয়েটীকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েগেছি। এমন চেহারা, এমন রূপ যে ভয় হয় এখানে রাখতে। অথচ মেয়েটীর কেউ নেই। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসে দিয়ে গেছে দেবসেবায় জন্য। সৎ-ব্রাহ্মণের মেয়ে তরু।

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা হোয়েছিল। বিগ্রহের পাশের শ্বেত চন্দরে বসে তরু মালা গাঁথছিল। মাঝেমাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল। আমরা এসেছি পরেষণার কাজ নিয়ে। মন্দিরের কারুকার্য দেখাই আমাদের কাজ। গোপীবল্লভপুরের মন্দিরের গায়ে অপূর্ব্ব কারুশিল্প দেখছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এমন সরল প্রতিমা দেখব আমরা আশা করিনি। সব ছবিটা এখনও চোখের উপর ভাসে। মন্দিরের পা দিয়ে শ্বেত পাথরের সিঁড়িটী নেমেগেছে দীঘির কালোজলে। মস্ত দীঘি, জল ছলছল করছে। দীঘির পাশে বাগানের ঘন রেখা। মন্দিরের চারধারে বনের স্নিগ্ধতা। ভারি ভাল লাগছিল পরিবেশটী। মাঝেমাঝে চোখ পড়ছিল তরুবালার দিকে। দেখছিলাম মালা গাঁথছে না আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছে। কি সুন্দর ওর আঙুলগুলো। বৌরাণী এক সময় বললেন—তরুকে দেখি আর ভাবি ও যেন দেব সেবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ওর জীবনটাকে এমনভাবে চলতে দিতে পারিনা। বৌরাণী ঘরের মধ্যে থেকেও বাইরের আলো উপভোগ করেছেন। তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন—বিত্ত আছে মন আছে। তিনি তরুবালার জন্যে ভাববেন এ আর আশ্চর্য্য কি!

সেদিন যখন চলে আসি তরুবালা বলেছিল—আমার গোপীবল্লভ সব দেখতে পান। তোমরা আমার ঠাকুরকে প্রণাম করনি।

এবার বিগ্রহের দিকে ভালকরে চেয়ে দেখি। সত্যই ভারি সুন্দর ঠাকুরটী। কষ্টি পাথরের বিগ্রহ, পাশে অষ্টধাতুর রাধা। কিন্তু সবচেয়েও আশ্চর্য জীবন্ত গোপীবল্লভের চোখদুটী। টানাটানা দুটোচোখ। আমরা সবাই প্রণাম করলাম।

তরুবালা প্রণাম এনে আমাদের হাতে দিল।

এখন সে সব কথা স্বপ্নের মত মনে হয়। মনে হয় যেন তন্দ্রার মধ্যে সে সব কথা শুনেছি। মনে হয় ছবির মত দেখেছি। হয়তো বা এমনিই মনে হোত যদি না সিষ্টার মারগারেটের দেখা পেতাম।

পাহাড়ের কোল ঘেঁসে সেই হাসপাতাল। ধপ্‌ধপে সাদা একটি পাখির মত বসেছে একটা পাখির মত। সেইখানেই বকের পালকের মত পোষাক পরে সিষ্টার মারগারেট ঘুরে বেড়ায়। আমার এক সতীর্থের যক্ষা হওয়াতে সেখানে যাওয়া। ট্রেণ থেকে নেমে বাসাকরে যখন এসে পৌছালাম তখন বেলা প্রায় শেষ। হাসপাতালে পৌছাতে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হোয়ে গেল। একদিকে মেঘ ঘন হোয়ে এসেছে পাহাড়ের গায়ে। বৃষ্টি এলো বুঝি। কি করবো ভাবছি এমন সময় শুভ্র পোষাকে একটি সিষ্টার এসে দাঁড়াল। আমাকে দেখে সে হেসে বলে—বৃষ্টি আসছে, উঠে আসুন।

সামান্য কথা, কিন্তু ঐ কথার রেশটুকু যেন মাঝ টেনে নিয়ে গেল অতীতের এক মুহূর্ত্তে একটী সুরের ঝঙ্কার মনে এলো—ভুল পথে এসেছেন, পথ হারিয়েছেন আপনারা। কিন্তু এই সিষ্টারের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। সে একটী বালিকামাত্র তিনি পূর্ণ যুবতী। সে শ্বেতমল্লিকার মত গোপীবল্লভের কণ্ঠলগ্ন

যাবো। আর উনি প্রস্ফুটিত গোলাপের গৌরব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। সিষ্টার বলে—আপনি অনুপম বাবুকে দেখতে এসেছেন? আশ্চর্য ছেলে বলি কি করে জানলেন।

এ কথার উত্তর না দিয়ে সিষ্টার হেসে চলে গেল। নিমেষে আমার মনে আর একটী ছবি বিলিক দিয়ে ওঠে। কে জানে কেন সেই পাহাড়ী সন্ধ্যার সকল ছায়ায় দাঁড়িয়ে গোপীবল্লভপুরের শুকবালার কথা মনে পড়ে গেল। অনুপমের কাছে সিষ্টার মারগারেটের কথা শুনলাম। সিষ্টার মারগারেটের কথা বলতে অনুপম উচ্ছ্বসিত হোয়ে ওঠে। শুধু অনুপম কেন, প্রতিটী রোগীর মুখে একই কথা। তাদের জীবনের খরাদিনে যেন কোথাথেকে একটী অচিন দেশের সবুজ পাখি সজীব কথা এনে দিয়েছে। আশা আনন্দের গান শুনিয়ে সে যেন ওদের কোন সুদূরের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। অনুপমকে জিজ্ঞাসা করি—সিষ্টার মারগারেটের দেশ কোথায় জান?

অনুপম বলে—সিষ্টার সব কথাই হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু একদিন কি জানি কেন পাহাড়ের গায়ে গায়ে জমা মেঘ দেখে সে বলেছিল ধানের ক্ষেতে মেঘের ছায়া দেখেছেন অনুপমবাবু। বলেছিলাম আপনি কেমন করে জানলেন ধানের ক্ষেতের কথা!

বলেছিল—আমরা মিশনারি কত, জায়গায় ঘুরতে হয়।

যে কদিন ছিলাম লক্ষ্য করতাম সিষ্টার মারগারেটকে। কেবলই মনে হোত অতি পরিচিত এক মুখ আছে ওর মধ্যে। অনেকবার ভেবেছি জিজ্ঞাসা করবো তার দেশ কোথায়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা আর হয়নি। এমন কি বিদায় নেবার মুহূর্তে একটা সুযোগ পেয়েও পারিনি।

পাহাড়ের উপর একটি মন্দির দেখে ফিরছিলাম এমন সময় সেই পাহাড়ীপথে দেখা হয়ে গেল সিষ্টার মারগারেটের সঙ্গে।

—এখানে এসেও ভোলেননি নিজের কাজ? অনুপমবাবু বুঝতে পেরেছেন একথা। জানেনতো অসুস্থ মানুষকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

এরপর সে মধুর হাসি হেসে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গিয়েছিল। আর আমি সিষ্টার মারগারেটের কথা ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলাম। কখন যেন গোপীবল্লভপুরের শুকবালা আর সিষ্টার মারগারেটের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছি।

অথচ কেমন করে তা হবে। একজন মালা গাঁথতো—অপর জন থারমোমিটার দেখে। এ প্রশ্নের জবাব আশা করি নি। কিন্তু কে জানতো অবনীশের সঙ্গে আবার দেখা হবে, আবার আমি গোপীবল্লভপুর যাবো। সেবার এসেছিলাম পাশ করে এবার এসেছি ছাত্র নিয়ে। কিন্তু এখন বৌরাণী নেই। নিঃসন্তান বৌরাণীর দলিলপত্র নিয়ে গোলমাল লেগেছিল। সে সব দেখাশোনা করে নায়েবমশাই। অবনীশ সেই নায়েবমশাইয়ের ছেলে। ডাক্তারী পাশ করে বিলেত ঘুরে এসেছে সে। তার চেহারায় সেই উগ্রতার আভাষ নেই একটুও। পরিবর্তে তার তরুণ সুপুরুষ চেহারায় একটী শরতের প্রশান্তি বিরাজ করছে। আমাদের অভ্যর্থনা করবার ভার ওর উপরই ছিল। অবনীশ চট্টোপাধ্যায় হেসে বললে, বাবা আপনাদের দেখাশোনার ভার আমার উপরই দিয়েছেন। মিতহাসি একটুকরো লেগে আছে ওর মুখে। ভারী ভাল লাগলো। অবনীশের সঙ্গে গেলাম গোপীবল্লভের মন্দিরে। মন্দিরের ভগ্ন অবস্থা না হলেও বাগানের আর শ্রী নেই। অযত্নে ঝোপ-জঙ্গলও গজিয়েছে। কিন্তু মন্দিরের সেই কষ্টি পাথরের বিগ্রহ শ্রীরাধাকে নিয়ে একই রকম দাঁড়িয়ে চেয়ে আছেন। সামনের শেওচত্বর—মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগেকার সেই ছবিটা। জিজ্ঞাসা

করলাম অবনীশকে তরুবালার কথা। সে প্রথমটা চুপ করে ছিল তারপর ইতঃস্তত করে বললে—আপনি দেখেছেন তরুবালাকে ?

বলি—শুধু দেখেছি নয়—এত মনে ছাপকেটে গেছে যে ভুলতে পারি নি। এ কথার উত্তর না দিয়ে অবনীশ অন্য কথায় চলে গেল। এরপর একদিন। চৈত্র মাসের তখন শেষ। বেশ বেলা হোয়েছে। হু হু করে হাওয়া বইছে নিমগাছে আম ধরেছে। কোথা থেকে একটা কোকিল ডাকছিল। সব মিলিয়ে কেমন যেন উদাস উদাস ভাব। বসে আছি সুরমা ভাতখণ্ড চিকিৎসালয়ের সামনে। বোরাণীর নামে হাসপাতাল। এর স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে একজন অবনীশ। অবনীশ এখন এখানেই বসে। সামনের একটা বেঞ্চে বসে আমিও অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের বিপরীত দিকে একটা অশথ গাছের তলায় শান বাঁধানো বেদী। সেখানে বসে এক বোষ্টমী গান গাইছিল।—

কহিও কানুরে সই, কহিও কানুরে
একবার প্রিয়া যেন আসে ব্রজপুরে।
রোপিনু যমিকা নিজ করে
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥

বোষ্টমী গান গেয়ে চলে গেল। অবনীশ তখনও বসে।

বললাম—কি হে অবনীশ, আজ উঠবে না ?

অবনীশ আনমনা হোয়ে বলে হ্যাঁ, চলুন।

বলি—আজ তোমায় বড় অন্যমনস্ক দেখছি।

এবার অবনীশ আমার দিকে চেয়ে কি ভাবলে, এরপর বলে চলুন বলি।

বোষ্টমী যেখানে থেকে উঠে গেছে সেখানেই গিয়ে আমরা বসলাম।

অবনীশ বলে—আপনি সেদিন তরুবালার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না ? তার কথাই আজ বলবো। এই বলে সে একখানা খাম থেকে চিঠি দিয়ে বলে—পড়ুন।

একটু ইতঃস্তত করে চিঠিখানা হাতে নিলাম। কিন্তু চিঠির উপরের ঠিকানা দেখে চমকে উঠলাম। এ যে সেই পাহাড়তলির হাসপাতাল। চিঠির কাগজখানাতেও পিটার মারগারেটের ছাপমারা। বলি—এ কার চিঠি ?

অবনীশ হেসে বলে—তরুবালার।

চিঠিখানা আমার কাছে নেই কিন্তু প্রতিটী অক্ষর আমার মনে গেঁথে রয়েছে। সেই চিঠিখানা হোল এই—

"মনে পড়ে কি তরুবালাকে ? গোপীবল্লভপুরের তরুবালাকে ? আমার তো মনে পড়ে সব কথা। পাহাড়ে পাহাড়ে যখন সবুজ ছায়া নামে, যখন মেঘ জড়ো হোতে থাকে তখন আমার মন নীড়হারা পাখির মত উধাও হোয়ে উঠে। দেখতে পাই গোপীবল্লভের মন্দিরের চূড়া—মেঘের ছায়ায় কালো হোয়ে উঠেছে। নিচে দীঘির কাল জল ছলছল করছে। চারদিক অন্ধকারে একাকার। আর সেই অন্ধকারের সিঁড়িগুলো

যুঁইফুলের মালার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নেমে গেছে। আর এরই মধ্যে আমার গোপীবল্লভ টানাটানা চোখ মেলে বাঁকাহাসি হাসছে।

ভাবছ আমি এখন সিষ্টার মারগারেট হয়ে গোপীবল্লভের কথা বলতে কেমন করে ভরসা পেলাম। কিন্তু অবনীশ, আর কেউ যদি ভুল বোঝে বুঝতে দাও, তুমি অন্তত ভুল বুঝো না। আমার এই লাভ সে কি গোপীবল্লভের নির্দেশে নয়? আমার গোপীবল্লভ যদি না অনুমতি দিতেন তবে কি এমন করে এতদূর আসতে পারতাম? এখানে এসে এমন করে কি মানুষের সেবা করতে পারতাম? রোগীরা আমার দিকে আশ্চর্য হোয়ে তাকিয়ে থাকে, ওরা আমায় করুণাময়ী বলে ডাকে। কিন্তু আমি তো জানি, এসব গোপীবল্লভের প্রসাদ। তাঁকে যদি না জানতাম তবে সব মানুষকে এমন করে আপন করতে পারতাম না। সব সময় মনে হয় আমি তাঁরই কাজ করছি। তখন সকাল থেকে চন্দন ঘসতাম, মালা গাঁথতাম এখন থারমোমিটার দেখি, ঔষধ দিই, কপালে তাঁরই স্পর্শ রাখি। যাক্ সেসব কথা। এখন এখানকার কাজও আমার ফুরিয়ে এসেছে। এবারে আবার গোপীবল্লভ ডাক দিয়েছে, তাই যাবার পূর্বে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে যাই। তুমি আমার জন্য ভেবে কষ্ট পেয়োনা। এককালে অভিমান হোয়েছিল বটে, কিন্তু এখন তার এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। বরঞ্চ মনে হয় এই বেশ হোল। আমি ফুরিয়েও ফুরাবো না শেষের দিনেও একেবারে শেষ হোয়ে যাবো না।

আজ ভাবছি জীবনে যত পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম স্নেহ। এই যদি না হোত বৌরাণী আমাকে এমন করে ভালবাসবেন কেন? আর তোমার হাত দিয়ে গোপীবল্লভ তাঁর রঙিন চিঠিখানা আমার হাতে দেবেন কেন? সেই চিঠি কত রঙিন ছিল তা সেদিন আমার মুখচোখ যে দেখেছে সেই বুঝেছে। তাঁর পায়ের চিহ্নের সংকেত তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। তোমার দিকে তাকালে মনে হত—কত সুরের কথা নিয়ে তুমি এসেছ। তোমার চোখে আমার চোখ সেই কথাই খুঁজে পেত। দেখে দেখে মনটা কেমন করে উঠতো। ভাবতাম তোমায় পেলে তাঁকেই পাওয়া যাবে। তোমায় যে কত সুন্দর লাগতো। তুমি কলেজে পড়তে কোলকাতায়; মাঝে মাঝে যখন আসতে আমি মুখ তুলে ভাল করে কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু তুমি ও সব লক্ষ্য করতে না। এমন কি আমায় সুন্দর বলেও ভাল করে চেয়ে দেখনি। আমি বুঝতাম ঐ না-চাওয়ার মধ্যে অনেক না-পাওয়া আমার পাওনা হোয়ে আছে। মনে পড়ছে কি—বৌরাণী তোমার বাবার কাছে আমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন আর সেই কারণেই আমাকে দেবসেবা থেকে নিয়ে এসেছিলেন মিশনারী কনভেন্টে পড়াতে। কিন্তু গোপীবল্লভের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বুঝলাম সেই দোলপূর্ণিমার রাতে। সে রাত ছিল গোপীবল্লভের রাত। প্রণাম দিতে গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ীতে। বাগানের পথ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম তোমার মা তোমার বাবাকে বলছেন—বৌরাণী কি মনে করছেন? পথে-কুড়ানো মেয়েকে আমার ঘরের বৌ করে আনতে হবে? তোমার বাবা কি বলেছিলেন আর শুনতে পাই নি। আমার হাত থেকে প্রণামের থালা পড়ে গিয়েছিল। তুমি কোথায় ছিলে জানি না হঠাৎ ছুটে এসে থালাখানা কুড়িয়ে নিয়ে বলে—গোপীবল্লভের প্রসাদ ফেলে দিলে পাপ, এত অভিমান।

এরপর চকিতে তুমি কাছে এলে। চকিতেই এক মধুরের স্পর্শ আমার কপালে এঁকে দিলে। মন বললে এইতো পেলাম, আর নয়। এরপর তো আর মিশনারিদের সঙ্গে চলে গেলাম কনভেন্ট থেকে। বৌরাণী দুঃখ পেয়েছিলেন। আমার চিঠির উত্তর দেননি তিনি। কিন্তু কি করি বল। গোপীবল্লভ যে আমায় ঘরে

থাকতে দিলেন না। গোপীবল্লভ জানেন সেদিন সারারাত জেগে বসেছিলাম। গোপীবল্লভ সারারাত বাঁশী বাজিয়েছেন, আর মিটিমিটি হেসেছেন। সেই রাতেই আমার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছি। আবার গোপীবল্লভের বাঁশি আমি শুনতে পেয়েছি। পাহাড়ী বরণার সেই সুর আমায় আকুল করেছে। কেবলই মনে হয় আর নয়, আর নয়। এবার এখানকার পালা উঠলো।

এখানকার পাহাড়ী গাঁয়ে মাঝে মাঝে আমি যেতাম। সেখানকার মানুষদের আমার বড় ভাল লাগতো। একবার তাদের মধ্যে মহিলার ছড়িয়ে পড়লো। আমি সেখানে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। এতে কর্তৃপক্ষ আমার উপর বিমুখ হোয়েছেন। তাই ভাবছি আর নয় এবার আমার যাবার পালা হোল।

প্রথমে যাবো পাহাড়ী গাঁয়ে তারপর যে কোথায় গোপীবল্লভ নির্দেশ দেবেন বলতে পারছিনা। কিন্তু যেখানেই যাই আমার শেষের সময়ের আগে একবার গোপীবল্লভের পায়ে শেষ নিবেদন করতে যাবো। তখন যদি আমার প্রয়োজন হয় তোমার সুরম্য ভাস্কর্য চিকিৎসালয়ে একটু ঠাঁই দেবে না?

আমি একবার অন্ততঃ ফিরে যাবো। একবার অন্ততঃ সেই গোপীবল্লভপুরের গাছের ছায়ায় ঘুরবো। একবার দীঘির জলে স্নান করবো। একবার গোপীবল্লভপুরের ধূলোয় মাখা ঠেকাবো। আমি যে গোপীবল্লভপুরেরই ভরদ্বাজ। তার মাটিতেই যে আমি বেড়ে উঠেছি। সেই আকাশ, সেই আলো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমি কি তাকে ভুলতে পারি?

অবনীশ তুমি বীর, আমার গোপীবল্লভ তাঁর কৃপা দিয়ে পাঠিয়েছেন তোমায়। জানি তুমি আমায় রক্ষা করতে পারবে, সুরম্য ভাস্কর্য চিকিৎসালয় থেকে কেবলই মনে হয়েছে তুমি আছ-তুমি আছ। আছ-ই তো! না হোলে আমার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এমন রঙিন করে রেখে কে? অবনীশ প্রিয়তম! আমার শেষের সেদিন তোমার কাছে বাঁধা রইলো।"

—"ভরদ্বাজ"

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অফিসের গেটের কাছে একদিন বিকেলে অমরেশের সঙ্গে দেখা। হঠাৎ নয়, পরীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই সে তার স্টুডিবেকার নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছে।

না দেখার ভাব করে পরীক্ষিৎ ফুটপাত ধরে চলেই যাচ্ছিল, অমরেশ ছুটে এসে তাকে ধরল।

"আরে। পালাচ্ছ কোথায়?"

মনটা ভেঙে গুঁড়ো হয়েই ছিল, ওর কথাতে পরীক্ষিতের মেজাজটা চড়ে গেল।

"এখন যাচ্ছি বাড়ীতে। সেখানে খেয়েদেয়ে, ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যাব হরিদাবের ওখানে। ওর মেয়ে সুবর্ণার সঙ্গে একটা appointment আছে আজ।"

"সাহিত্য-চর্চা—?"

"অনেকটা সেই গোছের।"

"সর্বোনাশ! তাহলে তালই কাটছে বল!"

"মোটামুটি মন্দ নয়—ভালই—ভালই বলতে হবে।"

"সুমিত্রা এদিকে একটা কাণ্ড করে বসেছে। শুনেছ?"

"কাণ্ড? —না, কাণ্ড শোনবার সময় কোথায় আমার? বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাই যা করতে পারছি কৈ? —কি কাণ্ড করেছে সুমিত্রা?"

"রেজিষ্ট্রি হয়নি। —পালিয়ে গেছে,—সুমিত্রা পালিয়ে গেছে বিয়ে না করেই।"

"বাঃ! বাঃ! adventurous মেয়ে তো তোমার বোন! সাবাস!"

"তোমরাই বুঝি কান-মন্ত্র দিয়েছ? সুমিত্রা তো ওরকম মেয়ে ছিল না।"

"প্রতিভা কি বেঁধে বলেছে নাকি?"

"বাজে কথা ছাড়ো পরীক্ষিৎ! শৈবাল একেবারে ক্ষেপে গেছে। ও নাকি বোম্বেতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছে—সত্যি? কোথায় গিয়েছে তোমাদের কিছু বলে গিয়েছে? —যেখানেই যাক,—সুধীনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার হেতু? সুধীনেরও কিছু মতলব আছে নাকি মাথায়?"

"সুধীন? —সুধীনের সঙ্গে গিয়েছে না কি?"

শুধু আশ্চর্য নয়, পরীক্ষিতের চোখের মণি কে যেন ডুবিয়ে নিল সেই মুহূর্তে। শুধু অন্ধ নয়, বাইরের জগৎ থেকে ওর দৃষ্টি সরে গিয়ে যেন তা ওর ভেতরকার একটি আহত ও ব্যথিত মনকে দেখতে লাগল।

"ওর বাড়ীর লোক অবিশ্যি বলে সুধীন ব্যবসার কাজে সেখানে গেছে খুব অসম্ভব নয়। কিন্তু শৈবাল তো আর তা জানবে না। সুধীন কি এ-সম্বন্ধে বলেছে কিছু?"

পরীক্ষিৎ অন্য কথা ভাবছিল। অমরেশের কথা শুনে সে তার দিকে ফিরে তাকাল।

"এই কথাই জানতে এসেছ নাকি?"

"তুমি রাগ করছ—আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছ না।"

"বুঝতে পারছি ঠিকই—তোমাদের মনের অবস্থা একটু স্বার্থপর হয়ে পড়েছে বলেই বুঝতে পারতে থাকে ভালবাসা যায় না তাকে বিয়ে করা কত কঠিন,—আমার মত বা সুধীনের মতপার্থক্য হয়তো খুব বেশী,—এ-ক্ষেত্রে হয়েছে বলেও মনে করতে পারছি না।

—তার ইচ্ছে মতই চলতে দেওনা তোমরা! তোমাদের ইচ্ছেটা ওর ঘাড়ে চাপাচ্ছো কেন?"

"মেয়ে আর মা—জেদাজেদি চলছে তাদের মধ্যেই; আমি কিংবা বাবা এ-দলের মধ্যে নেই। আমার একটি মাত্র আপত্তি—সুধীনের সঙ্গে না গেলেই ভাল হ'ত। আমাকে কিছু বলে যায়নি,—মাকে কিছু বলেনি,—বাবাকে তো বলবেই না—কেবল সাধনাকে বলে গেছে। তোমাকে তো বলতে পারতো?"

"আমাকে? আমাকে বলতে যাবে কেন?"

"একজন কাউকে তো প্রাণখুলে মন খুলে বলবে?"

"আমি কি সুমিত্রার প্রাণ-মন খুলে বলবার মানুষ?"

"—অসম্ভব কি!—"

অমরেশের সন্দেহের ইঙ্গিত কাকে নির্দেশ করছে তা বুঝতে পরীক্ষিতের খুব বেশী কষ্ট হলনা। বিরাম নিয়ে সে তার স্টুডিওকামরে গিয়ে উঠল কিন্তু পরীক্ষিৎকে তার গাড়ী করে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার সৌজন্য বোধ করল না সেদিন। কিন্তু দিন পনেরোপরে এই অমরেশই পরীক্ষিতের অফিসের ছুটির পরে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ময়দানের কাছে গিয়ে নামল। অমরেশ আর সে অমরেশ নেই, সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কেবল সেদিনের সঙ্কোচটা যদি কেটে আলাদা করে দেখ তাহলে সেদিনের অমরেশকেও আলাদা মানুষ বলে মনে হবে। সে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মানুষ বটে কিন্তু আজ কোন আঘাত, অপমান, স্নেহ কিংবা অবহেলা তাকে কিছুতেই তাড়িয়ে তুলতে পারবে না। ওর বেখাপ্পা বেটপ, বেকায়দার কথা বলার ভঙ্গী এখন সুসংযত, ভদ্র ও মার্জিত। ও নিজের কথাই বলতে এসেছে যদিও, তবু কান পেতে তোমার কথাও কিছু কিছু শুনবে। তুমি যদি সাহিত্যের আওতার মানুষ হও তাহলে ও নিজের গণ্ডীর বাইরে গিয়েও সে বিষয়ে দু-চারটা বং বং বলে তোমার সাংস্কৃতিক মনকে খুশী করবার চেষ্টা করবে।

মাঠের একধারে মিরিবিলিতে গিয়ে অমরেশ ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

"গুরুতর পরিস্থিতি—।"

পরীক্ষিৎ লক্ষ্য করল ওর চোখ দুটো যেন হঠাৎ ধোঁয়াটে আর ঘোলাটে হয়ে উঠল। অমরেশের চোয়াড়ে মুখের চোয়ালের দাঁতের পাটি যেন জোর করে পিষে ফেলতে চাইল একটি অসহনীয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কষ্ট।

অমরেশ বলতে লাগল,—

"সৈবাল সুমিত্রাকে বিয়ে করবে না।" বলতে বলতে হঠাৎ রেগে উঠল অমরেশ। আর রাগ করে উঠল যেন পরীক্ষিতেরই ওপর,—"কি করে তুমি ভাবতে পারো সে তোমাকে বিয়ে করবে?"

"ঠিকই করেছে—সৈবাল তো আর অবুঝিমান নয়! বুঝেছে ঠিকই—আমি হলেও সৈবালের মতই করতাম।"

"আমি হলে করতাম না। অন্ততঃ বুঝিয়ে বলতে,—কখনই না! একটা চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গেছে,—সে কথা কিছুতেই বুঝবে না! ধরে নিয়েছে ও সুধীনের সঙ্গে ফূর্তি করতে গেছে দিল্লীতে।"

"দিল্লীতে?"

"এমন শয়তান মেয়ে! সাধনাকে বলে গেছে বোম্বেতে যাচ্ছি—গিয়েছে দিল্লীতে!"

"সুধীনও কি শেষ পর্যন্ত দিল্লীতেই কারবারটা চড়ালো?"

"মানে—?"

"সুধীনও কি ওর বাড়ীর লোকের কাছে তাঁওতা দিয়েছে?"

"এই পয়েন্টেই তো ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে—জটিলও করে ফেলেছে ওরা। লোকে কি ভাববে? সৈবালের চটে যাওয়া আশ্চর্য নয় কিছু! তোমার কি দশা হবে ভেবে দেখেছ?"

"সুধীনকেই বিয়ে করুক না! যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে তো আর ফেলে দিতে পারবে না! তার অর্থও হয় না।"

"ওকে বিয়ে করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর কথা আদায় করত—পারবেনা। সুমিত্রা নিজে বলেছে,—নিজের মুখে।—এখন বোঝ!"

"বোধহয় শৈবালের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে দিতে চায়। সুমিত্রা।"

"ভেঙেই তো গেছে—।"

"তাহলে এর মধ্যে problem কি আছে? চাকরি করবে হয়ত সারাজীবন! বিয়ে করুক কি না করুক তাতে কি এসে যায়? স্বাধীনভাবে উপার্জন করে স্বাধীনভাবে থাকতে চায় বোধহয়—মন্দ কি! পুরুষের দাপটের চাপে ও হয়তো নাক গলাতে চায় না। আজকাল তো অনেক মেয়েছেলের এ-মনোভাব হয়েছে। পুরুষমানুষের জবরদস্তি চাওয়া অনেক মেয়েই বরদাস্ত করতে পারে না।—করবে কি—?"

"ও মনোভাব থাকলে আর দুশ্চিন্তা থাকতো না কারো! কিন্তু তা বলছে না ও!"

"কি বলছে?"

"সুবিধে হলেই বিয়ে সে করবে। বিশেষ জেরাও করতে হয়নি এ-কথা বের করবার জন্যে। আমার মুখের ওপরেই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বসলো।"

"তাতেই বা তোমাদের চিন্তা কেন?"

"তোমার মত বুদ্ধিমান মানুষও যদি ওকে এভাবে প্রশ্রয় দেয়, তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই।—পুরুষ হলে আলাদা। মেয়েছেলের তা চলে না—তার ভবিষ্যৎ আছে। কাকে ঘরে আনবে কে জানে? প্রেমের ব্যাপার তো! বাপমায়ের সমর্থনও দরকার মেয়েদের পক্ষে। নইলে নিজে তো মুস্কিলে পড়বেই—পাঁচজনকেও মুস্কিলে ফেলবে।"

"এই তেপান্তরের মাঠে আমাকে ধরে এনে এসব কথা আমাকে বলার কোন মানে আমি ধরতে পারছিনা।"

"তোমাকে বলার উদ্দেশ্য—আমাদের ধারণা হয়েছে সুমিত্রা নিশ্চয়ই কাউকে মনে মনে ভালবাসে এবং সেইজন্যেই তাকে এমন একটা কাজ করতে হয়েছে যাতে শৈবালের সঙ্গে ওর বিয়েটা ভেঙে যায়। তুমি হয়তো প্রশ্ন করবে,—ওর পছন্দের মানুষটি সুমিত্রার কলঙ্কের জীবন কি মেনে নিতে পারবে? পারবে না হয়তো—তাই বলে ওর ভালবাসাও মিথ্যে হয়ে যাবে না। ওর দিকটাও একটু ভাববার আছে বৈ কি! পথ আছে অনেক অনেক কিছু করতে পারতো—অনেক কিছু হতে পারতো এত কেলেঙ্কারির দরকার হতো না। তবু কেন সে এই কলঙ্কের পথ বেছে নিলো? যাকেই সে ভালবাসুক—সে মানুষটির সম্বন্ধে সুমিত্রা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। নইলে অনায়াসেই এখানে বসে রেজিষ্ট্রি করে তাকে বিয়ে করতে পারতো—এত হাঙ্গামার দরকার হত না কিছু। তোমাকে বলার উদ্দেশ্য তোমাকে ওরা দুজন, সুমিত্রা তো বটেই, সাধনাও—খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে—কথাটা বোধহয় ঠিক হল না!—তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না হয়তো।"

"না-না, তুমি চমৎকার বোঝাতে পারছ—একটা অলি-গলি দিয়ে আসছো অবিশ্যি কিন্তু বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।"

"তুমি সাহিত্যিক মানুষ—সেজন্যে এদের ভক্তি আছে খুব আর তা ছাড়া তোমার কথার গাঁথুনি আমাদের মত নয়—সুন্দরভাবে তোমার মত কে বোঝাতে পারবে না। ও কাকে চায় তা তুমি এক চেষ্টা করলেই জানতে পারবে। আর কারো ওপর সে-বিশ্বাস আমাদের নেই—তোমার ওপরেই আছে এই অদ্ভুত অনুরোধের জন্যে তুমি আশ্চর্য হবে তা জা কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যদি কেউ জানতে পারে তুমি! ও যাকে ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসবো তার বিরু হয়ে দাঁড়াবো না বরং সাহায্য করবো আমাদের যা-কিছু করবার, করবো,—যতটুকু স আমাদের পক্ষে। সুমিত্রার পছন্দের মানুষটি নিশ্চ ঈশ্বর নয়—অন্তর্যামী পুরুষ নয় সে সুমিত্রার সম্বন্ধে ে ভুল বুঝতে পারে। সুমিত্রার জীবন সার্থক করতে ও ওর ভালবাসার মানুষটিকে জানতে হবে আমাদে —জানতে হবে তার মন। সে-মানুষটি কি সুমিত্রার ভালবাসার দাম দিতে পারবে? আমার তো হয় না!"

অমরেশের এই নতুন বক্তৃতা শুনতে আর ইচ্ছে হলনা তার। সুমিত্রার কীর্তি-কলাপের কোন ব্যাখ্যাও তার আর শুনতে ভাল লাগল না। কেবল এখন, এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে সুমিত্রাকে দেখতে ইচ্ছে হল। সুমিত্রা এখন কি করছে জানতে পারলে, কি অবস্থায় আছে দেখতে পারলে, সুমিত্রার ঘামুতে অস্থিরতার অপ্রকাশিত ছবিখানি পরীক্ষিৎ হয়তো খানিকটা অনুধাবন করতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয়, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়ে পড়বে। প্রবলতম ইচ্ছে হলেও সে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারল না।

ঘাসের ওপর আস্ত হয়ে শুয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে অমরেশ। এখন আর তার কথা একবিন্দুও শুনতে পারছে না পরীক্ষিৎ। নির্বাক একটা ছবি হয়ে গিয়েছে সব,—মাঠের মাঠ, লোকজন, মোটর-ট্রাম, ফেরিওয়ালা আর অমরেশ।

কেবল চোখে পড়ল ওদের গতির চিত্র।

অমরেশ উঠে বসল, উত্তেজিত হয়ে উঠল ওর মুখ, নাকের ডাঁসা ফুলে একটু লাল হয়ে উঠল। অমরেশ আগাগোড়া যেন একটা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। কখনো মোটা কাজের পাঁজা কপালে শূন্য হাওয়ায়, কখন হাত মুঠো করে ঘুসি মারল নরম ঘাসে গলার শির ফুলিয়ে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

মাঠের মধ্যে অন্ধকারের ছায়া এল ঘনিয়ে। আর অমরেশ সন্ধ্যার এই ছায়ান্ধকারে আরো গভীরতর কালো ছায়া হয়ে একটা কালো ছবির মত নিশ্চল হয়ে গেল। সূর্যাস্তের দিক থেকে যে সোনালি রোদ সোনার পাখীর মত ডানা মেলে ওদের সামনের লাল-ফুলে-ভরা কৃষ্ণচূড়ার ডালে এসে বসেছিল, তা আরো উঁচু শাখাতে গিয়ে পাখা মেলল। পরীক্ষিতও কি ওদের মতই শাখান্তরে চলে গেল? কেন ওর মনের কথা উল্লাসটা হিসাব হারিয়ে ফেলে মোমের মত নরম হয়ে গেল? সে কি দেখল এই সন্ধ্যার অন্ধকারে, কি বুঝল, কেন আর টিটকারী দিয়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না, কেন তার গলা ধরে এল দুঃখে, কষ্টে, বেদনায়? বলতে পারেনা পরীক্ষিৎ—কিন্তু বুঝতে পারে এ এক অলৌকিক রহস্য যার কাছে মানুষের সমস্ত সত্তা আত্মসাৎ হয়ে যায়। বোধহয় সুমিত্রারও এমনই একটি কাল মুহূর্ত এসেছিল—এসেছিল দুর্বার শক্তি নিয়ে যখন ভালবাসার পটচ্ছায়াতে ফুলের কালো কাজলের কলঙ্ক রেখা রহস্যময় হয়ে উঠেছিল।

সুমিত্রাদের টালীগঞ্জের বাড়ীর একটা ঘরের কোণে পরীক্ষিৎ ও সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল। ও বলেছিল,—"সব তো জানেন, তা হলে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন?" কার ওপরে ওর মন পড়ে আছে—এই সামান্য উত্তরটাও অসামান্য রহস্যে ভরে উঠেছিল তখন। সুমিত্রার চারপাশে অনেকগুলো পুরুষ-চরিত্র ঘোরাফেরা করছে। অনবরত চক্র, বৈঠক, আড্ডা, পিকনিক আর টেনিস টুর্নামেন্ট চলছে তাদেরকে নিয়ে। এদের মধ্যে কাউকেই পরীক্ষিৎ নিশ্চিত ভাবে নির্দেশ করতে পারছে না। একটি দুরতিক্রমনীয় বাধা এসে ওর সাহসী জিজ্ঞাসাকেও শঙ্কিত করে তুলছে। পরীক্ষিৎ যেন একটি অবোধ্য সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে একটি অসত্য পৃথিবীর মধ্যে বাস করতে চায়।

নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে প্রায় প্রত্যেকদিনই তার অন্যরকম ধারণা জন্মে। হয়তো সুমিত্রার মেয়েলি সংস্কার নির্লজ্জের মত নিজের মনের কথাকে প্রণয়ীর সামনে উচ্চারণ করতে পারছে না। নইলে তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুমিত্রা অনায়াসেই তার নির্বাচিত মানুষটির নাম জানাতে পারত। সুমিত্রার মেয়েলি সঙ্কোচের বাধা ওর মনের অন্তরঙ্গতাকে যেন নিঃশব্দে পরীক্ষিতের কাছেই পৌঁছে দিয়ে গেছে।

ওর যে ঠোঁট জমে গিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে তা একটি যাদুকরীর স্পর্শে গলে গিয়ে তার সঙ্কোচিত মনের দরজাগুলো কপাট কি খুলে দিয়ে যাবে না?

আরেকদিন ওদের বাড়ীতেই সে সুমিত্রাকে বলেছিল,

"তোমার দাদার বন্ধুদের ভিড় তো কমছে না মোটেই, —একটা কিছু কর, নইলে ভিড় তো বেড়েই যাবে।"

"আমার কি করবার আছে—?"

"তুমিই তো নায়িকা। ভিড় তো তোমার জন্যেই।"

"সে ভিন্নের মানুষ তো আপনিও।"

"আমি তো অস্বীকার করিনি একবারও।"

"তাহলে আপনিই একটা ব্যবস্থা করুন! বলুন কি করতে হবে।"

"আমার ব্যবস্থা কি যেনে নিতে পারবে?"

"যদি ভাল হয়,—কেন যেনে নেবো না?"

"যাকে তোমার ভাল লাগে তাকেই বেছে নাও না কেন? যদি মনে করে থাকো কাউকে—বলতে আপত্তি কি তোমার? বাপমায়ের মনের অবস্থাও তো ভাবতে হয়? দুঃখ তো কেবল তুমিই পাচ্ছ না! দুঃখ তো তাঁরাও পাচ্ছেন।"

"সত্যি আমি খুব খারাপ মেয়ে,—এত খারাপ মেয়েকে কে বিয়ে করতে চাইবে?"

সুমিত্রার মুখের দিকে পরীক্ষিৎ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। দেখতে দেখতে সুমিত্রার চোখ দুটো যেন কালো কুচকুচে হয়ে আরো সুন্দর ও গভীর হয়ে উঠল। সুমিত্রার কালো দুটি মণি নিস্তব্ধতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একটি আশার প্রার্থনা করবার জন্যে শান্ত ও স্থির হয়ে রইল।

"সত্যিই খুব খারাপ মেয়ে। এসব মেয়েকে খারাপ লোকই চায়—খারাপ লোকের দরকার আছে কিনা জানি না—কিন্তু কোটে এসে তারাই।"

"তাইতো দেখতে পাচ্ছি—।" পরীক্ষিৎ সুমিত্রার কথায় সায় দিল তৎক্ষণাৎ।

"কি দেখছেন?"

"খারাপ লোক এসে জুটেছে তোমার ভাগ্যে।"

"ঠিকই বলেছেন—আমারও তাই মনে হয়।"

"একটি অন্তত:—একটিকেই আমি চিনি।"

"কে বলুন তো—?"

"নিজকে ছাড়া মানুষ আর কাকে বেশী চেনে? খারাপ মেয়ের দরকার আমারও,—নইলে কে খারাপ মানুষকে বিয়ে করবে, বল—? ঠিক বলিনি?"

উঠে দাঁড়াল সুমিত্রা।

হ'ব?"

বাগানের সরু রাস্তার দুধারে রজনীগন্ধার ঝাড়। সেই সরু রাস্তা দিয়ে দুজনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। দুজনের মধ্যে কেউ আর কথা বলল না। নীরব জ্যোৎস্না উঠেছে আকাশে, মৃদু ফুলের গন্ধে ভরে গেছে বাতাস। বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছে ওরা। নির্জন আউট হাউসের বারান্দায় তারা উঠে দাঁড়াল। চারদিকে স্তব্ধতা গাঢ় মেশায় [illegible] অসংলগ্ন ও অধীর। বারান্দার একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল ওরা দুজন। সুমিত্রাদের এ্যালসেশিয়ান জাকি ছুটে ছুটে এল ওদের কাছে। ওদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল সে, মনিব কন্যাকে চিনতে পেরে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর অবাক হয়ে যেন চলে গেল। গুহ্য অন্ধকার থেকে থালী বের হয়ে এল হঠাৎ। বেঞ্চের পাশে গোটা কয়েক লাল গোলাপ রেখে সে নীরবে সেখান থেকে ফিরে চলে গেল। অশ্রুচ্ছন্ন দুটি আঙুল দিয়ে একটি ফুল তুলে পরীক্ষিৎ সুমিত্রার খোঁপায় গুঁজে দিল ধীরে ধীরে। গোলাপের গন্ধের চেয়েও মধুর হয়ে ওর নাকে এল স্নিগ্ধ মেয়েলি চুলের ঘ্রাণ। দীর্ঘ অপেক্ষমাণ কামনা অধীরতায় অস্থির হয়ে উঠল। একটি চপল মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন, কিন্তু তা সে কোনরকমেই গ্রহণ দিতে পারল না—গ্রহণ দিতে কষ্ট হল তার,—বুঝি বা ভয়ও।

জীবনের যে সঙ্গিনী বৈধ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে তাকে অবৈধভাবে একটি লালসার সামগ্রী করে তুলতে কষ্ট হল তার।

ভয় হল তার ভয়ানক। ভয়ের কারণ অবিশ্যি অন্য পরীক্ষিৎ সুমিত্রাকে এমন কোন সুযোগ দেবে না যে সুযোগের কাছে ওর অটুট সংযম হেরে গিয়ে ওর কাছে সুমিত্রা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ও যদি রুখে ওঠে তাহলেও সে আর সুমিত্রার জীবনের মধ্যে আসবে না, যদি মেনে নেয় তাহলেও পরীক্ষিৎ সুমিত্রার জীবন থেকে সরে দাঁড়াবে।

ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে পরীক্ষিৎ চলে গেল। সুমিত্রাকে ভাববার সময় দিয়ে বেশ কিছুদিন পরেই সে ওদের বাড়ীতে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন বিকেলে ওদের বাড়ীতে গিয়ে তার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে সুমিত্রাকে ভাববার সময় দেওয়া তার উচিত হয়নি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষের রীতি পরীক্ষিতের রাস্তা ধরে চলে না।

টেনিস টুর্ণামেণ্ট হচ্ছে।

একদিকে শৈবাল ও সুমিত্রা পার্টনার হয়ে খেলছে, অন্যদিকে নতুন একটি মানুষ আর সাধনা। অনেক বন্ধু-বান্ধব টেনিস কোর্টের একপাশে চেয়ার পেতে বসে খেলা দেখছে। খেলাটা যেন একটি উৎসবের অভিনবত্বে মেতে উঠেছে। টেনিস কোর্টের অন্যধারে মেমসাহেবটিও স্বতন্ত্র সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে একটি চেয়ারে বসে আছেন। তার পাশের চেয়ারখানি খালি পড়ে আছে আর তার ওপরে মেয়েদের লং ওভার-কোট, জ্যাকেট আরো সব টুকিটাকি রাখা হয়েছে। যার জন্যে চেয়ার-খানি রাখা হয়েছিল এবং রাখা কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল তিনি ছোট্ট চুরুট মুখে করে ছাদের ওপর ঘোড়ার মত পায়চারী করে পত্নীর রক্ষা করছেন। ছাদের ওপরে অনন্ত জানোয়ারের দ্রুত ঘটাঘট্ শব্দের দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করে মৃদুভাবে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও মেমসাহেবের মুখ কিন্তু আগাগোড়াই খুসী খুসী লাগছিল। এই ধার্মী স্ত্রীলোকটি বেশ ভাল করেই জানেন কি করে চতুরতায় ও কৌশলে নিজের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয় আর জিতে ফিরতে হয়।

পরীক্ষিৎকে কেউ লক্ষ্য করেনি খেলোয়াড় আর দর্শকরা তখন খেলাতেই ব্যস্ত। কিন্তু তবু যেন পরীক্ষিতের মনে হল, মেমসাহেবটি তাকে দেখতে পেয়েছেন এবং কেবল দেখাই নয়,—যেন তাকে এসময়ে দেখে তিনি খুব বেশী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মত খুব সাবধানে চকিতে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেছেন বলে মনে হল তার।

একটা খালি চেয়ার টেনে পরীক্ষিৎ অলক্ষিতে বসে পড়ল। আর আশ্চর্য হল যখন দেখতে পেল তার পাশের চেয়ারে সুষীম সুহাসীন হয়ে বসে আছে। ওকে এ-বাড়ীতে আশা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন ব্যাপারে। ওর সমস্ত দোষ যে-উপলক্ষে ক্ষমার চোখে প্রশ্রয় পেয়ে গেল সে-উপলক্ষটি নিতান্ত বিশেষত্বহীন উৎসব নয় কোন মতেই। সুষীমও তন্ময় হয়ে খেলা দেখছে।

হাত দিয়ে সুষীমকে একটু ছুঁতেই ওর দেহ-পিণ্ডটা জেলীর মত থল থল করে উঠল।

"তুমি?"

"আমিই তো!—কেন? অন্যায় করেছি এসে?"

"বুঝে উঠতে পারছিনা ঠিক এখনও।"

"কেন?"

"অনেক কিছুই তো দেখলাম পিকনিকে—তাই বলছি।"

"পিকনিক?"

"পিকনিকে গিয়েছিলাম সবাই মিলে—আমি,—যে-আমি সুকর্ম করে ফিরযাগ,—আমি পর্যন্ত বাদ যাইনি এই বৃহৎ যজ্ঞে। মিসেস্ নিজে গিয়েছিলেন আমার বাড়ীতে আমাকে নেমন্তন্ন করবার জন্যে। ভাবতে পারো—?"

"তুমি তাহলে ভাগ্যবান ব্যক্তি।"

"শৈবালের মত নয়।"

"তাই নাকি?"

"খুব ভোরে বেরিয়েছিলাম। ভায়মণ্ডহারবার মন্দ লাগেনি নেহাৎ। ভালই কেটেছে দিনটা। ফিরেছি বেলা আড়াইটা। মিসেস্ না থাকলে আরো ভাল লাগতো। শৈবালের গাড়ীতে সুমিত্রা,—ওদের মনের মিলের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—আর কেউ না ও-গাড়ীতে—স্রেফ ওরা দুজন। আর আমার গাড়ী চড়লেন মিসেস স্বয়ং,—স্রেফ আমরা দুজন,—আর কেউ না। কি! ভাগ্যবান মনে হচ্ছে?"

"খারাপ আর কি। ভালোই তো!"

"খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করতে লাগলেন সারা রাস্তা

ত্রিপটি যাইল, শুধু উত্তর দিয়েছি আর খেয়েছি। কি করেছি—কোন হোটেলে উঠেছি,—একঘরেই ছিলাম কিনা—এক কামরাতেই আমরা দুজন একা একা ট্রেভেল করেছি কি না—বোম্বেতে না গিয়ে দিল্লীতে কেন গেলাম,—হেনো তেনো।"

"কি বললে?"

সত্যি কথাই বলাম। সুমিত্রার মাসতুতো বোনের বাড়ী খুঁজে সেখানে ওকে রেখে সেইদিনই রাত্রের ট্রেন ধরে বোম্বে চলে গিয়েছি। ইচ্ছে ছিল তাঁওতা দিয়ে ওকে একটু ঘাবড়ে দিই।—কিন্তু আমি তো ওর কাছে নিজে—আমার সাধ্য কি।—ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বোতল খালি করে ছেড়েছেন। এখনও আমার মাথা ঘুরছে!—বাপ্‌স্—।"

"এতকাণ্ড করে তাহলে ঘরনায় ছড়াতে গেলে কেন বাবাকে?"

"মাদক দ্রব্য খেয়েছ কখনো পরীক্ষিৎ?"

"না—। কেন?"

"খেলে বুঝতে পারতে সুন্দরী মেয়ের অনুরোধ না রাখা কত কঠিন!"

"শৈবালের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে গেল! তা তোমার জন্যেই তো ভালো!"

"তাহলে মন্দ কি হতো! সুমিত্রাও তো তাই চায়। কিন্তু ওর মা বিয়েটা ভাঙতে দেবে না বোধ হয়। খুব সহজে নয়, নিশ্চয়ই। উনি বড় অবরদস্ত মহিলা। ওর সামনে ছেলেমেয়েরা কাঁপতে থাকে। যা কিছু করেছে উল্টো পাল্টা—সব প্রাণের দায়ে। মরিয়া হয়ে উঠেছিলো সুমিত্রা।"

"শৈবাল রাজী হয়েছে?"

"আমার অবাবদ্ধি হল কের আরেকবার। খুব privately—আমি, শৈবাল আর মিসেস্।—রূপে গাড়ীতে দিল্লীতে যাইনি, এখানেও আসিনি—কার্টকাস গাড়ীতে আরো পাঁচজন ছিল। যাওয়ার সময়েও ছিল, আসবার সময়েও ছিল। শৈবালের মন—মেজাজ তাইতেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

"আর সুমিত্রা! সুমিত্রা রাজী হয়েছে?"

"খুব কঠিন বোঝা। মেয়েদের চরিত্র খুব কঠিন।—তবে একটু ধীরে সুস্থে তোয়াজ করলে মেয়েদের মন নরম হয় শুনেছি—খপ্ করে গিলে ফেলতে গেলেই বিপদ। সুমিত্রার মা ও-সব বিষয়ে খুব ওয়াকিবহাল নয় বোধহয়। অমিতি তার মেয়েকে তিনি নিশ্চয়ই বেশী বোঝেন—অন্ততঃ অন্য সবাইয়ের চাইতে।"

"যথা—?"

"যথা?—এর বেলাতে অন্য রকমই দেখলাম অবশ্যি কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিন্তু এমন জোর জবরদস্তি চলে না। অথচ যেহেতু তিনি মা, তিনি ভাবেন মেয়ের উপর জোর-জবরদস্তি খাটাবার তার পুরো অধিকার আছে। জামাতও হারবারে,—পরস্ত্রী মেয়েকে ঘরে বেঁধে পাঠালেন শৈবালের সঙ্গে একা নৌকোয় হাওয়া খেতে!"

"ওরা দুজনে?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই! না হলে মজা হবে কেন?"

"আমাকে কেউ নেমন্তন্ন করেনি তা বোধহয় তুমি জানো না? থাকলে এই মজার দৃশ্যটা দেখতে পেতাম।"

"করেনি নাকি? তা তো জানতাম না! অমরেশ তো অন্ততঃ জানাতে পারতো! একটু আশ্চর্য ঠেকছে কিন্তু পরীক্ষিৎ। খুবই অদ্ভুত লাগছে। তবে আ নিশ্চয়ই আছে একটা কোন কারণ ওরা অর্থ ছাড় করে না।"

"মজার দৃশ্যটি না দেখে লোকসান হয় নি কিছু।"

"তোমাদের মত মানুষেরই তো দেখা দরকার,—সাহিত্যে-গল্পে কাজে লাগাতে পারতে। মানব-চরিত্রে এমন বিরাট মিছিল সচরাচর চোখে দেখা যায় না মেয়ের দলও কম ছিল না, ছেলের সংখ্যাও কম নয় তালগোল পাকিয়ে ছিটকিয়ে পড়বার ভিড়ে থাকতে হল! আমি তো দেখে তাজ্জব বনে গেছি। তুমি থাকলে রসদ হত বেশ—অমতো আরো—।"

সুনীল! সাহিত্যিকও একজন রক্তমাংসের মানুষ-তারও কিছু কিছু সুখ দুঃখ আছে। তার জীবনেও মা মাঝে ক্ষতির সম্ভাবনা আসে।"

"তাই নাকি? তোমার—? তোমার কোন ক্ষতি হয়েছে নাকি?"

"আমার কথা শুনে তোমার লাভ কি হবে?"

"অর্থাৎ—? ব্যাস্! আর বলতে হবে না। আমি বুঝে নিয়েছি!"

"অত সহজে সব জিনিস বুঝতে যেয়ো না! ঠকবে।"

"এখন আর তুমি আমাকে ভাঁওতা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারবে না। যা বুঝবার আমি বুঝে নিয়েছি। এখন বুঝলাম কেন ওরা তোমাকে পার্টিতে ডাকে নি—।"

"ভাবো তাহলে—! যত ইচ্ছে ভাবো।"

"তুমি সুমিত্রার প্রেমে পড়েছে?—পড়েছ নাকি? পড়ে থাকলে খুলে বল—আমি হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমার হাতে অস্ত্র আছে—। কিন্তু তবু বলছি—এবং তোমার ভালোর জন্যেই বলছি—একটু ভেবে চিন্তে নিও তার আগে।"

"না। সেরকম কিছু নয় হয়তো।"

"বাক! বাঁচালে!—কারণ, ওরা যখন বল্টা দুই মৌ-বিলাস করে পাড়ে এসে নামলো তখন সুমিত্রার চোখ দেখে আমার একটা কথা মনে হয়েছিলো কিন্তু।"

"কি কথা?"

"ওর চোখ যেন বলছে, I am satisfied, thank you—"

"অসম্ভব।"

হঠাৎ পরীক্ষিৎ উঠে দাঁড়াল। এই লম্বা মানুষটির একটা ছায়া নরম ঘাসে আরো দীর্ঘতর হয়ে উঠল। একটি আক্রোশে ছুটে যাওয়ার জন্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে সেই অপরাহ্নের দীর্ঘ ছায়া। স্প্রাটল্ কর্কের মত সুমিত্রার ছোটাছুটিও সেই মুহূর্তে কেমন যেন ছটফট করে উঠল। ওর অর্দ্ধসুপ্ত অস্পষ্ট ও হাল্কা শরীর যেন গতির বেগ হারিয়ে ফেলেছে ক্রমশ। একটি অনাবৃত, অনিয়ন্ত্রিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষ ধীরে ধীরে চলে গিয়েছে গেট পর্যন্ত। পরীক্ষিতের দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অপমান করেছে এ-বাড়ীর আনন্দ আর এখন সেই আনন্দ ভেঙে গেছে, বেঁকে গেছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে সুমিত্রার চোখের অপরাহ্নের আলোতে। সুধীন কিছুতেই ভেবে পেল না হঠাৎ সুমিত্রার নেমো হাত থেকে কেন টেনিস র‍্যাকেটটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল, কেন এ-ভাবে সুমিত্রা খেলার মাঝখানে দৌড়ে ছুটে চলে গেল গেটের দিকে।

"আপনি চলে যাচ্ছেন?"

পরীক্ষিৎ ফিরে তাকাল। সুমিত্রার চোখের দিকে তাকাল শুধু। আর কিছু না। আর কিছু দেখতে পায়নি সে। একটি অবিশ্বাসী ঘোড়া স্থির সুন্দর চোখের ভঙ্গিতাকে লক্ষ্য করল শুধু।

"একটা কথা আছে পরীক্ষিৎবাবু—।"

"কথা?—"

"হ্যাঁ। একটা কথা আছে আমার।"

"আমার কোন কথা নেই। তোমার কোন কথাই শোনবার ইচ্ছে নেই আর। সব কথাই শুনেছি।"

সুমিত্রা চুপ করে গেল সেই মুহূর্তে। কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে মুখ মুছল সে। বাতাসে চুল উড়ে এল কপালে। হাত দিয়ে সরিয়ে সে মিশিয়ে দিল মাথার অন্য চুলের সঙ্গে। কালো ব্রাসের মত চোখের পাতা আকাশি রঙের চোখের ওপর নেমে এল।

সুমিত্রা মাথা নেড়ে বলল,—

"আচ্ছা—।"

পরীক্ষিৎ সুমিত্রাকে একটি স্তব্ধ বিস্ময়ের মধ্যে রেখে রাস্তা দিয়ে হন হন করে চলে গেল। নিজের ঘরে ফিরে এসে হঠাৎ কেমন যেন কাঁপুনির মত হতে লাগল। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল সারা শরীর। এ আবার কি হল? কিসের লক্ষণ এসব? অবাধ্য শরীরের রকম দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে গেল? এমন আশ্চর্য হয়নি কখনো। এ যেন ওর শরীর নয়, অন্যের শরীর। একে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন শক্তি নেই যেন তার। ওর এই বিদঘুটে কাঁপুনি দেখে একা ঘরে নিজেরই হাসি পেল, হাসতে লাগল একা একা। পাগলের মত। সিগারেট ধরাল কাঁপা হাতে, ধোঁয়া ছাড়তে লাগল অনেকবার। আরাম লাগল, সুখ বোধ করতে লাগল, স্বাভাবিক হল।

সুমিত্রার এই অসভ্য ব্যবহারের জন্যে ওকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। সেদিন বিকেলে তার নাটকীয় কায়দাজিতে মেয়সাহেবের পরিকল্পনাটি এমন ভাবে নষ্ট হওয়াতে তিনি মেয়ের ওপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন। সুমিত্রার ব্যবহারে ও অব্যাহতিতে তিনি যে পরিমাণে অপমানিত হয়েছেন তাতে অন্য কোন মা হলে হাতার দিয়ে পিটিয়ে সোজা করে দিত। তবে তিনি সোজাসুজি স্পষ্টভাবেই তাকে বলে দিয়েছেন যে যে এ-বাড়ীতে তার স্থান হবে না। যে এ-বাড়ীর মান-সম্ভ্রম ও কৃষ্টি রক্ষা করতে জানে না তাকে তিনি এ-বাড়ীর উপযুক্ত মেয়ে বলে স্বীকার করতে রাজী নন। সুমিত্রার রক্তের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ কিছু কম ছিল না। এবং তা প্রকাশ করবার সুবিধে ও সুযোগ এসে উপস্থিত হল অকস্মাৎ। দিল্লী থেকে তার এ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার এসে গেছে। সুমিত্রা কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ী ছেড়ে দিল্লীতে চলে যাচ্ছে।

সময় মত একদিন সুধীনই এ-সব খবর পরিবেশন করে গেছে পরীক্ষিতের কাছে। তবু মধুচক্রের মক্ষিরাণীর প্রতি পরীক্ষিতের মন কোনমতেই নরম এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে উঠল না।

সুধীন এসেছিল আরেকদিন। সাদা চামড়ার গণেশ গণেশ মার্কা সুধীনের ঘুঁদে ঘুঁদে চতুর চোখ,—গভীর জলের মাছের মত ও গভীর প্রদেশে চলাফেরা করে, বোঝা খুব কঠিন তবু পরীক্ষিতের কাছে সুধীন যেন ক্রমশই স্পষ্টতর হচ্ছে। স্পষ্ট হচ্ছে ও, আর আমা যাচ্ছে ওকে। ও পরীক্ষিতের কাছে কি চায় আর কেনই বা সুমিত্রার খবরাখবর নিয়ে এত ঘন ঘন সে তার কাছে আসছে তা বুঝতে পরীক্ষিতের খুব অসুবিধা হল না। শৈবাল বাতিল হয়েছে সুমিত্রার নিজের অনিচ্ছার জন্যে, তেমনি পরীক্ষিতের মন বিগড়ে গেলে সে-ও কি সুমিত্রাকে বাতিল না করে ছাড়বে? তখন অজ্ঞাতবাসের হঠকারিতায় যে মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেল সে-মেয়ের ভবিষ্যতকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করতে হলে তো একমাত্র সুধীনকেই ত্রাণকর্তার মত এগিয়ে আসতে হয়। এই রুচি বাচ্চা মেয়েকে সে হাতের মুঠোয় পেয়েছে, তাকে একটু না খেটে সে ছাড়বে না।

পরীক্ষিতও সুধীনের অনেক দিনের বন্ধু। সে পরীক্ষিতকে বেশ ভাল করেই চেনে। সুধীন জানে পরীক্ষিৎ কোন বিষয়েই নীচু হতে পারে না, কোন ব্যাপারেই সে কারো চেয়ে ছোট হতে জানে না। তার এই অহমিকাকে সুধীন অতি সূক্ষ্মভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আরো বড় করে দেখাবার চেষ্টা করছে। এই অহমিকাকে বাড়িয়ে তুলতে পারলেই সহজে একটি সুন্দর পৃথিবী সুধীনের হাতের মুঠোয় এসে পড়বে। মানুষের অহমিকাকে ঠিকমত তোয়াজ করতে পারলে সে বিশ্বাবিকশূন্য হয়ে নিজের আবের খোয়াতেও দ্বিধা বোধ করে না।

সুধীন সেদিন ঘাঁকিয়ে বসল। পরীক্ষিতের মনোগত ভাবকে কায়দা করে জেনে নিতে হবে।

বলল—"তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি,—ও বোধহয় তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। ঠিক বলিনি?"

"আমাকে আগে কবে বলেছ মনে নেই, তবে ঠিক বলেছ কিনা তা আমি নিজেই আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।"

"সুমিত্রা কিছু বলেনি?"

"বোধহয় না।"

"তুমি?"

"না—।"

"তবে আর বলবে কবে? সুমিত্রা তো আজ চলে যাচ্ছে! সাতটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনে দিল্লী যাচ্ছে।"

"সে দিল্লীতে যাক্ কি লণ্ডনে যাক্—তা আমি কি করবো? আমার কি বলবার আছে তাকে? আমা। কথাতে তার যাওয়াও ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না।"

"পারতে হবে। বিয়ে করলেই ঠেকিয়ে রাখা যেতে বোধ হয়। বিয়ে ছাড়া গত্যন্তর নেই আপাতত কিন্তু ওকে কি শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারবে তুমি। দেখে তো খুব সাধাসিধে ঝাঁঝহীন মেয়ে বলে মনে হয় না! এ-সব মেয়ে তোমাদের বাড়ীতে মানিয়ে নিয়ে

পারবে? ওকে স্ত্রী করে নিতে খুব কষ্টিন হবে না হয়তো —অন্তত তোমার ক্ষেত্রে। কিন্তু ও কি পোষ মানবে? ও কি পোষ-মানা জাতের মেয়ে?"

"তবে? এই পচা মালকে পাচার করবার জন্যে তা হলে তুমি এত উঠে পড়ে লেগেছ কেন? পচা আর নষ্ট মালের খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না নাকি?"

"হুঁ! বুঝলাম। ঘোষটা সেষকালে আমার ওপরেই পড়বে বুঝতে পারছি। তোমাদের সকলের সন্ধা কোথায় তা-ও কিছু কিছু আন্দাজ করেছি। তবু জেনে রাখবে পরীক্ষিৎ—ও মেয়েকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। ও নিজে নষ্ট হতে না চাইলে কেউ ওকে নষ্ট করতে পারবে না।"

"যাক্! একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একটু আশাপ্রদ হওয়া যায় তাহলে? কি বল?"

"তা হলে বিয়ে করতে আপত্তি কি তোমার? লাগিয়ে যাও। তোমারও একটা গতি হোক—ওরও। ভাবসাব যদি করতে হয় তাহলে তোমাকেই একটু নীচু হয়ে নামতে হবে পরীক্ষিৎ। মাথা খাড়া করে ও জাতের মেয়েকে পাওয়া যায় না।"

"তুমি নিজেই কর না! মাথা নীচু-টিচু করে তুমিই ভাবসাব করে ফেল না!"

"এই নিয়েই তো পড়েছি গোলমালে—ভাল মানুষ হলে যে দশা হয়।— শেষকালে ঘাড়ে না পড়লেই বাঁচি!"

"তোমার দশা দেখে আমি রীতিমত ভাবিত হয়েছি — একটা কিছু গতি হলে সত্যই হ'ব আমি।"

"তুমি তো হবে জানি। কিন্তু কন্যা স্বয়ং হবেন কিনা সন্দেহ। ওর যে কি মতলব বুঝি না! দিল্লীর কোথাও ওর মন পড়ে আছে কি না কে জানে। না হলে একবার অন্তত: তোমাকে টেলিফোনেও তো খবর দিতে পারতো —সে আজ চলে যাচ্ছে?—বুঝি না এদের মত মেয়েকে —মাথায় তোকে না।"

"স্টেশনে তুলে দিতে যাবে না?"

"সম্ভব নয়—সম্ভবত না।"

"কেন? সম্ভব নয় কেন?"

"আমার ওপর মুখিয়ে আছে ওদের বাড়ীর লোকজন। আমিই সুমিত্রার জীবনটা সর্বনাশ করে দিয়েছি না কি! আর তোমার ওপরে যে ওরা কেউ সন্তুষ্ট নয় তা বোধহয় বুঝতেই পারছো।"

"আমার অপরাধ—?"

"তুমি নাকি ওর মন ভাঙিয়েছ—নইলে তোমাকে স্টেশনে যেতে বলতাম। কিন্তু এ অবস্থায় খুব সমীচীন বোধ হচ্ছে না তোমার যাওয়া। ইচ্ছে হলে যেতে পারো —কিন্তু আমি সাহস পাচ্ছি না।"

"কেন? সেখানে গেলে মারপিট করে বসবে নাকি?"

"না—না। তোমার চেহারা দেখে অতখানি সাহস করে উঠতে পারবে না। তবে—তবে মুখের ওপর ওরা যা তা বলে বসতে পারে।"

"তাই মনে হচ্ছে না কি তোমার?"

"মনে হওয়া টওয়ার কিছু নেই—সেলেই টের পাবে।"

"তবে তো যাওয়াই দরকার—শুনে আসি কি বলে। তুমি কি বল?—যাব?"

"যেতে চাও—যাও। কিন্তু ওদের কথা শুনে রেগে যেও না। রেগে গেলে তোমার মুখে কিছু আটকায় না। স্টেশনের জনতার মধ্যে মুখ হাসিয়ে লাভ কি তোমার?

সেদিন ছুটি ছিল। অফিসে যাওয়ার কোন তাড়া ছিল না। বাড়ীতেও মন টিকছিল না। সারা দুপুরটা ছটফট করে কাটিয়েছে। কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে সে। শীতের দুপুরটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সুমিত্রার মুখের মত। অসহায়, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত একটি মানুষের জন্যের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর খোলা জানালার শুষ্ক রৌদ্র। আর সেই জানালা দিয়ে একটু হাল্কা নীল আকাশ নীল-কান্নার চোখের মত যেন ছল ছল করে উঠছে বারে বারে। তোমার কি জ্বর হয়েছে?··· দূরে একটি অজানা পাখীর শব্দ ভেসে আকাশে।···না তো। কেন?··· বিছানাতে আধশোয়া হয়ে মাথার পেছনে দুহাত রেখে হেলান দিয়ে বসে আছে পরীক্ষিৎ। জ্বরের মত ছল ছল করছে তোমার চোখ।···পায়ের ওপরে একটা চাদর টেনে

দিল সে।·· এই রকমই আমার চোখ। এই জন্যেই তাল লাগে তোমার চোখ। বড় সুন্দর চোখ।··তোমার কাছে সুন্দর বলেই আমি সুন্দর। পরীক্ষিতের নিঃসঙ্গতা যেন বহুদিনের দুর্গম যাত্রার পরে একটি মধুর আকর্ষণীয় স্থানে এসে পৌছল। আজ যেন সে পৃথিবীর প্রথম একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেল। কান পেতে শুনতে লাগল রূপসী পৃথিবীর তপ্ত আর স্নিগ্ধ বিচিত্র কথা। এখানে,—এই ঘরে পরীক্ষিৎ যেন আর একা নয়। সে যেন এখন কথা বলতে পারে অপর একজনের সঙ্গে,—শুনতে পারে তার কথা। সমস্ত বাতাস যেন পরিপূর্ণ জীবনে পূর্ণ হয়ে গেছে। সমস্ত ঘরটাই যেন জীবন্ত মানুষের মত নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে।

ধীরে ধীরে একটি আবিষ্ট সন্ধ্যার ছায়া ছড়িয়ে পড়ল ওর ঘরে। আর তখনই একটি মিনতির সুর অনাঘ্রাত বেদনার মত বেজে উঠল, পরীক্ষিতের মনে। কে যেন অসম্ভব ভয় পেয়েছে আজ আর ভয় পেয়ে সে যেন ভয়কেই আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তেই পরীক্ষিতের মনে একটি ভয়ের ভবিষ্যৎ শরীর এসে প্রবেশ করল যেন।

হাওড়া স্টেশনে পৌছে পরীক্ষিৎ নিজের এই কাজের জন্যে নিজের ওপরেই অবাক হয়ে গেল। গাড়ী ছাড়বার আগে স্টেশনে সোরগোল পড়ে গেছে। এই ভিড়ের কোলাহলের মধ্যে সে অকস্মাৎ অনুভব করল তাকে অপদস্থ করবার জন্যে একটি দুর্বিসহ অপমান অপেক্ষা করে আছে। ভীরু এবং দুর্বল মানুষের মত সে কি পিছিয়ে আসবে? সে কি পালিয়ে যাবে? শঙ্কিত জীবনও তো যৌবনের রক্তে অপরাজেয়ের বলে অভিষিক্ত হয়। তার যৌবনের রক্ত কি সঙ্কটের দিনে হিমশীতল অপ্রতিরোধের শক্তির মারকতায় অপ্রকৃতস্থ হয়ে উঠেছে?

ফার্স্টক্লাসের কোন কামরাতেই সুমিত্রাকে খুঁজে পেল না সে। প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলে সবগুলো কামরাই দেখতে দেখতে পরীক্ষিৎ এঞ্জিন পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ঘণ্টা বেজে উঠল—গাড়ী ছাড়তে আর দশ মিনিট বাকী আছে মোটর। এঞ্জিনের কালো ধোঁয়া গন গন করে বা'র হতে দেখে পরীক্ষিৎ দ্রুত ফিরে চলল। সময়ের বুকে চঞ্চিতের দ্রুত পদ শুনতে পেল সে।

"এই যে—এদিকে—।"

সুমিত্রার ডাক। সুমিত্রার মত গলার আওয়াজ নিশ্চয়ই। সব মেয়ের গলাই তো একরকম। তবু শব্দ লক্ষ্য করে ফিরে তাকাল সে।

সুমিত্রা।

একটা ফার্স্টক্লাস কুপে কম্পার্টমেন্টে সুমিত্রা একা বসে আছে। গাড়ীর বাইরে অথবা ভেতরে ওদের বাড়ীর একজন লোককেও সে দেখতে পেল না। বুঝতে পারল ওকে ত্যাগ করেছে সবাই—এমন কি বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত। তার এই নতুন চিন্তা কেন যেন নতুন আনন্দের ঢেউ এনে দিল ওর মনে। তারই ঢেউয়ে সে যেন ভেসে এগিয়ে চলল তারই দিকে।

তবু মাঝে মাঝে দ্বিধায় আড়ষ্ট হল দুখানি পা। সুমিত্রা কি ওকেই ডাকছে? আর কোন প্রেয়াস্পদ নীহারিকার ছায়াপথে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে না তো? হঠাৎ সে প্রবলভাবে দ্রুত এগিয়ে গেল। দরজার হাতলে ঘেচকা টান দিয়ে খুলে ফেলে কামরায় লাফিয়ে উঠল।

"আমাকে না জানিয়ে—জিজ্ঞাসা না করে চলে যাচ্ছ যে?"

"আমাকে যে পরশু চাকরিতে জয়েন করতে হবে!"

"চাকরি? কি চাকরি? দেখি তোমার এপোয়েন্টমেন্ট লেটার?"

সুমিত্রা ভোলানো ব্যাগের ফাস্নার খুলতে লাগল পরীক্ষিৎ চারিদিকে আর একবার তাকিয়ে দেখে সুমিত্রাকে প্রশ্ন করল,—

"তোমাদের বাড়ীর কেউ উঠিয়ে দিতে আসেনি?"

"না—।"

"ভালই হয়েছে—না এসে ভালই করেছে ওরা।"

চিঠিটা পড়ে পরীক্ষিৎ তা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এত তাড়াতাড়ি এক নিমেষের মধ্যে যে কাণ্ড ঘটে গেল তা প্রথমটা বুঝতেও সুমিত্রার একটু দেরী হল

যখন ঘুরল তওক্ষণে একরাশ কাগজের ছোট ছোট ছেঁড়া টুকরো গাড়ীর জানালার কাছে সাদা সাদা ছেঁড়া পাপড়ীর মত স্তূপীকৃত হয়ে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঝরে পড়তে লাগল। সুমিত্রা ছুটে গেল জানালার ধারে, —দুহাত বাড়িয়ে যে যতখানি কুড়াতে পারল মুঠো ভরে তুলে নিয়ে ফিরে তাকাল পরীক্ষিতের দিকে। চোখ ভরে ঝাঁকালো জল এসে পড়েছে ওর। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে একটু একটু। চোখের দুটো কালো ভ্রূর চারপাশে রক্তের আভাতে রাঙা হয়ে উঠেছে। কানের ধার ঘেঁষে তার দুটি গালে রক্ত যেন হঠাৎ জমে গেছে। তাকিয়ে দেখল এরই মধ্যে পরীক্ষিৎ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সুমিত্রার বরম মসৃণ আর গরম দেহের উত্তাপে ভরা ওভার কোটখানা। প্ল্যাটফর্মের লোকজনের ভিড়টা যেন এই কামরার জানালার দিকেই একটু বেশী। একটু একটু উৎসুক্য এদিক সেদিক থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে চেষ্টা করছে। একটা রগড় দেখবার জন্যে ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভিড়। কিন্তু সেদিকে পরীক্ষিৎ কিংবা সুমিত্রার কোন লক্ষ্য নেই।

সুমিত্রার হাত চেপে ধরে পরীক্ষিৎ প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করল তারা। এরই মধ্যে একটি যুবক ছোকরা তার বন্ধুকে এই রগড়ের রহস্যটি বুঝিয়ে বলতে শুনল তারা।

'স্ত্রীটি যাচ্ছিল পালিয়ে,—স্বামী এসে ধরে ফেলেছে···।'

'বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা ধোলাই দেবে আজ—ঠিক হয়েছে!'

সুমিত্রা পরীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বলল,—

"শুনতে পাচ্ছেন কথাগুলো?"

"ঠিক কথাই বলেছে—।"

ট্যাক্সিতে উঠে সুমিত্রা বলল,—

"আমার টিকিটের টাকাটা মিছিমিছি নষ্ট তো হল! অন্যায় করলেন আপনি।"

"ভালবাসাও তো অন্যায়। অন্যায় ও সহিত।"

হঠাৎ সুমিত্রা তার মুখখানা দুহাতে ঢেকে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। গঙ্গার ওপর দিয়ে হাওড়ার ব্রীজ দিয়ে ট্যাক্সিটা আস্তে আস্তে সারিবদ্ধী গাড়ীগুলোর পেছনে চলছে।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করল,—

"কথার উত্তর দিচ্ছ না যে?"

সুমিত্রার পিঠ জুড়ে গাঢ় হয়ে নেমে এল একটি বলিষ্ঠ হাত। তারই নির্ভরযোগ্য হাতের আবেষ্টনের মধ্যে কাঁপতে লাগল লঘু একখানি শরীর। একরাশ ফুলের মত গড়িয়ে পড়ল পরীক্ষিতের বুকে আর তখনই বাইরের পৃথিবীর সমস্ত উত্তাপ যেন একটু একটু করে জুড়িয়ে যেতে লাগল।

সুমিত্রার কোঁপানির কান্না শুনতে পেল সে। শুনল ওর কথা,—সুমিত্রার ভাঙা ভাঙা, আধখানা আধখানা কথা,—

"আমি ভাবিনি,—আমি ভাবতে পারিনি, ভাবিনি কখনো—"

[ক্রমশঃ

মহাপোল্লাস

স্বামী ভত্বানন্দ

অমাবস্যা তিথি, রাত্রি গভীর অন্ধকারে আবৃত। মেঘমুক্ত আকাশে অগণিত উজ্জ্বল তারা দেখা দিয়াছে। প্রকৃতি নীরব, মৃদু-মন্দ বাতাসে গাছের পাতাগুলি হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। মাঝে মাঝে দূর হইতে শিবা-ধ্বনি শুনা যাইতেছে। স্থান—দেবীর মন্দির, অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত দেবীর পূজার আয়োজন চলিতেছে। পূজা মণ্ডপে মহা হৈ-চৈ। পূজারী মহাশয়ে পূজা আরম্ভ এবং শেষ যাহাতে হয় তাহার জন্য বার বার তাগাদা দিতেছে, সকলেই ব্যস্ত। অনেক শ্বেত-চন্দন এবং রক্ত-চন্দনের প্রয়োজন, তাই অনেকে চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রচুর ফুল আসিয়াছে। জবা, করবী, অপরাজিতা, পদ্ম, গোলাপ, জুই, বেলী, সেফালী আরও কত দুষ্প্রাপ্য সুন্দর সুগন্ধ ফুল সংগ্রহ হইয়াছে, কেহ পুষ্পপাত্র সাজাইতেছে, কেহ মালা গাঁথিতেছে। কেহ বিল্বপত্র বাছিয়া দুইয়া হোমের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখিতেছে, কেহ ফল ছাড়াইতেছে। কেহ নৈবেদ্য সাজাইতেছে। কেহ হোমকুণ্ডে বালি চালিতেছে। নিকটেই বেল কাঠ স্তূপীকৃত আছে। পূজা মণ্ডপের ন্যায় রান্নাঘরেও মহা হৈ-চৈ। বিশেষ পূজার বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে, রকমারি রান্না, পরিমাণও যথেষ্ট, এই জন্য বহু পাচক নিযুক্ত হইয়াছে, চাকরেরা যোগান দিতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ মসলা পিষিতেছে, কেহ তরকারি কুটিতেছে, কেহ ধুইতেছে। এই বিশেষ পূজা উপলক্ষে ঢাক ঢোল কাঁসর সানাই ইত্যাদি নানা রকম বাজনার আয়োজন হইয়াছে। ঢাকীরা কখনও নৃত্য, কখনও মাথা নাড়িয়া নানা রকম কসরত দেখাইতেছে। ঝাড়বাতি, আতস, রাধাচক্র রকমারি বাজী পোড়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। দর্শকদের আনন্দ দান করিবার জন্য নৃত্য, গীত, বাদ্য, যাত্রা, থিয়েটারের আয়োজন হইয়াছে। স্থানে স্থানে তোরণ নির্মিত হইয়াছে। তার উপরে রং বেরঙের নিশানা উড়িতেছে। দেবীর মন্দির সুন্দর ভাবে সাজানো হইয়াছে। দেবীর গলায় বেনারসী চেলি, গলায় গোলাপ, জুই বেলী, অপরাজিতা, জবা, লালপদ্ম ও বিল্বপত্রের মালা শোভা পাইতেছে। ধূপ, দীপ জ্বলিতেছে, অগুরু, কস্তুরীর গন্ধে চারিদিক আমোদিত। সামনে মঙ্গল ঘট বসিয়াছে, বিশেষ পূজা উপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আপ্যায়নেরও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণের অভ্যর্থনাও ত্রুটি নাই, মেয়েদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা হইয়াছে, কাজকর্মের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। উপযুক্ত লোকের উপর ভারিত্ব দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং কোথাও ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। উৎসব দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে বহু লোক আসিয়াছে, অন্ন, বস্ত্রাদির আশায় অনেক গরীব দুঃস্থও আসিয়াছে। দেবীর বিশেষ পূজা উপলক্ষে শত শত ছাগবলির ব্যবস্থা হইয়াছে। নিকটে হাড়ি-কাঠ পোতা রহিয়াছে। জবা, বিল্বপত্রের মালা এবং রক্ত-চন্দন দ্বারা উহা চিহ্নিত করা হইয়াছে, ছাগশিশুদিগকে স্নান করাইয়া ফুলের মালা ও চন্দনাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া গলায় দড়ি দিয়া পারিবন্ধভাবে নিকটে এক কাঠের সঙ্গে বাঁধা হইয়াছে। বলি দর্শন করিবার জন্য কাতারে

কাতারে লোক আসিয়াছে। তাহাদের আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু ছাগশিশুগুলির কি অবস্থা তাহা ভাবিবার অবসর নাই। কিছুক্ষণের মধ্যে যে খাড়কের খড়্গে দেহ হইতে শির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং রক্তের ধারা বহিবে ইহা হয়ত ছাগশিশুগুলি ভাবিতেই পারে না। তথাপি ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কায় তাহাদের বুক দুরু দুরু করিতেছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহাদের মৃত্যুতে দর্শকদের আনন্দ। কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস ইহাই জগতের নিয়ম। উৎসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় যাহা ছিল তাহা নরবলি। এই জন্য সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত এক বালককে আনা হইয়াছে। সে দেখিতে সুন্দর, বয়স অল্প, আন্দাজ দশ হইবে, রং ফর্সা; সুস্থ সবল দেহ, সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কোন পিতামাতাকে চোখের জলে ভাসাইয়াছে কে জানে, তাহাকে দেখিয়া অনেকে চোখের জল ফেলিতেছে। দেবীর বিশেষ পূজা উপলক্ষে তাহাকে বলি দেওয়া হইবে। বালককে পশুর পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে, ছাগশিশুগুলির যে দশা হইবে তাহারও তাহাই হইবে, বালক পশুদের দুঃখের ভাগী হইবে, তাহাদের ন্যায় তাহাকেও স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া গলায় জবা ফুলের মালা এবং কপালে রক্ত-চন্দনের টিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহার জন্য যে পৃথক্ হাড়িকাঠ পোতা হইয়াছে তাহাও বিল্বের মালা এবং রক্ত-চন্দন দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। নিকটে খাড়কের খড়্গ জল্ জল্ করিতেছে।

এই যে এত সমারোহ করিয়া দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার একটা ইতিহাস আছে। বিনা কারণে হয় নাই। রাজার মঙ্গলের জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজা ধার্মিক, ন্যায় পরায়ণ, প্রজাবৎসল, রাজ্য পালনে দক্ষ, তাঁহার রাজ্যে শান্তি বিরাজমান, আইন শৃঙ্খলার অবস্থা ভাল, প্রজাগণ নিজ নিজ কর্তব্য পালনে তৎপর, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র পাঠ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ধ্যান ধারণায় সময় অতিবাহিত করেন, ক্ষত্রিয়েরা পৌরুষবীর্য্যের পরিচয় দিয়া যশস্বী হন। বৈশ্যেরা ধন উপার্জন এবং বৃদ্ধি করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলেন। সমাজের সকল স্তরে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন। রাজা শক্তিশালী, যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ, নিজে বিদ্বান্ এবং বিদ্যায় উৎসাহ দাতা। তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়াছে। তাঁহার মধ্যে বহু গুণ আছে বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। ধন দৌলতাদি কোন জিনিষের অভাব নাই। তথাপি তাঁহার মনে শান্তি নাই। জীবনের মাধুর্য্য হারাইয়াছেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নয়। শরীর ভাল না থাকিলে ধন দৌলত মান সম্মান সবই বৃথা। রোগ হঠাৎ কঠিন রূপ ধারণ করিয়াছে, বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, কিছুতেই রোগের উপশম হইতেছে না, তাঁহার অর্থের অভাব নাই, খরচেও কার্পণ্য নাই। বিশিষ্ট ডাক্তার কবিরাজদের ডাকা হইল, চিকিৎসা শাস্ত্রে যত রকমের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারে সবই হইল। সেবা শুশ্রূষায় কোন দিকে ত্রুটী নাই। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার দুঃখ ঘুচিল না। রোগের বিন্দুমাত্র উপশম হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, ডাক্তার কবিরাজ হতাশ হইলেন। তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইল। কিন্তু রাজার জীবন অমূল্য। তাঁহার উপর অগণ্য প্রজার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যে কোন মূল্যে তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে হইবে। যদি চিকিৎসায় কোন ফল না হয় শেষ সম্বল দৈবের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, পরিবার বর্গ, আত্মীয়-স্বজন সকলে দৈবের কৃপা লাভের জন্য পরামর্শ দিলেন। এই জন্য বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ডাকা হইল। নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা বুঝাইলেন দেবীর কোপে এই সর্বনাশা অসুখ হইয়াছে। একমাত্র দৈবের অনুগ্রহে ইহার উপশম হইতে পারে, তা ছাড়া অন্য উপায় নাই। দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে তাঁহার বিশেষ পূজা, ভোগ রাগ ও বলির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহাদের ব্যবস্থার মধ্যে

ছাগ বলির সঙ্গে নরবলির ব্যবস্থাও যুক্ত হইল। যে কোন মানুষকে ধরিয়া বলি দিলে চলিবেনা। সব সুলক্ষণ যুক্ত বালককে দেবীর সম্মুখে বলি দিতে হইবে, ইহাই বিধানের বৈশিষ্ট হইয়া উঠিল। ইহাতেই দেবীর কোপ নিবারিত হইবে। তিনি প্রসন্না হইবেন। তাঁহার কৃপায় রাজা রোগ মুক্ত হইবেন।

নরবলি বিধানে অনেকে মর্মাহত হইলেন আরও অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিন্তু কেহ এই বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, তখন সমাজে ব্রাহ্মণের একছত্র আধিপত্য। দেশের প্রচলিত আইনে ব্রাহ্মণের আধিপত্য অক্ষুন্ন থাকে। তা ছাড়া এই বিশেষ-ক্ষেত্রে রাজার নিজের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা জড়িত তাঁহার উপর রাজ্যের নিরাপত্তা নির্ভর করে। সুতরাং নরবলি বিশেষত বালক বলি বীভৎস বলিয়া বিবেচিত হইলেও কেহ কোন প্রকার প্রতিবাদ করিল না বরং রাজা এবং রাজ্যের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত বিধান বলিয়া মানিয়া নিল। যদিও বা কেহ কেহ এই বিধান অন্যায় বলিয়া অন্তরে ধারণা করিল, রাজার শাসন এবং পুরোহিতের অভিশাপের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না।

সিদ্ধান্ত স্থির হইল, সর্ব সুলক্ষণযুক্ত বালক সংগ্রহ করিবার জন্য চারিদিকে রাজকর্মচারী ছুটিলেন। রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইল। এই রকম সুলক্ষণযুক্ত বালক পাওয়া কঠিন। কেহ পুত্র সন্তান বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নয়। এমন কি দরিদ্র পিতা মাতাও পেটের দায়ে সন্তান বিক্রয়ে অনিচ্ছুক। একটা প্রবাদ আছে ছেলে কোলে মরে তবুও পোষ মেয়ে না। এই প্রবাদ বাক্য সত্য হইলেও কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অসম্ভব সম্ভব হয়। দারিদ্র্য বহ দোষের আকর, অন্তরের সদ্‌গুণ শুকাইয়া দেয়। ইহার পেষণে মানুষ বিবেচনাশূন্য হয়। ন্যায় অন্যায় বোধ চলিয়া যায়। স্নেহ মমতা বিসর্জন দেয়।

বহু জায়গায় বহু অন্বেষণের পর সুলক্ষণযুক্ত বালক পাওয়া গেল পিতামাতাকে বহু অর্থ দিয়া তাহাকে কেনা হইয়াছে। বালক পাওয়া গেল বটে কিন্তু আর এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। দেশের প্রচলিত আইনে নরবলি নিষিদ্ধ, যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে উহার বিধান আছে তথাপি বলি দেওয়ার পূর্বে সিটি-জজের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি মিলিলে বিধান কার্যকরী হয়। নইলে কার্য স্থগিত রাখিতে হয় সাধারণ ক্ষেত্রে এই প্রকার অনুমতি কখনও দেওয়া হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইহার অনুমতি মিলিল, কারণ ইহার মধ্যে রাজার স্বার্থ জড়িত। তাঁহার স্বাস্থ্য লাভের জন্যই এই বিধান দেওয়া হইয়াছে। রাজার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে অগণিত প্রজার স্বার্থ জড়িত বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার বিধান আছে। সুতরাং নরবলির অনুমতি সাধারণভাবে আইন বিরুদ্ধ হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া হইল।

পূর্বে যে অমাবস্যা রাত্রে দেবীর বিশেষ পূজা ভোগরাগের কথা বলা হইয়াছে তাহার উপলক্ষ ছিল রাজার কল্যাণ, সুলক্ষণ যুক্ত বালকের রক্তে দেবীর কোপ নিবারণ এবং তাঁহার কৃপায় রাজার স্বাস্থ্য উদ্ধার এবং প্রজার হিতসাধন। তাই দেশ দেশান্তর হইতে কাতারে কাতারে লোক দেবীর বিশেষ পূজার উৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছে। মহা সমারোহে যথাবিধি দেবীর পূজা হইয়া গিয়াছে। বহু ছাগ শিশু বলি হইয়াছে। হাড়িকাঠ রক্তময় হইয়াছে। উজ্জ্বল খড়্গ রক্ত রঞ্জিত হইয়াছে। চারিদিকে রক্ত-গঙ্গা বহিয়াছে। এবার সেই বালকের পালা। সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে। বালক তাহার জন্য নির্দিষ্ট পৃথক হাড়িকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। শাণিত খড়্গ হাতে ঘাতক প্রস্তুত। পুরোহিতের ইঙ্গিত পাইলেই কর্তব্য শেষ করিবে। যাঁহার কল্যাণার্থে এত সমারোহের সহিত দেবীর বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, এবং বলি বিশেষতঃ নরবলির আয়োজন হইয়াছে সেই রাজাও উপস্থিত আছেন। তাঁহার মন দ্বিধাগ্রস্ত, কখন

নিজের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার কথা ভাবিতেছেন। কখন তাঁহার স্বার্থের খাতিরে নিরপরাধ বালকের অমূল্য জীবন বিসর্জন এবং পরিণতির কথা ভাবিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি বালকের দিকে। পুরোহিতের ইঙ্গিতে বালককে হাড়ি কাঠের আরও নিকটে আনা হইল। বালক এতগুলি ছাগ শিশুর জীবন নাশ দেখিয়াছে। জীবনের আরম্ভ, স্থিতি এবং পরিণতি বুঝিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রাজার ইচ্ছায়, পুরোহিতের ইঙ্গিতে এবং ঘাতকের উজ্জ্বল খড়্গে তাহার দেহ মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। দেহ পড়িয়া থাকিবে। পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী সব পরিত্যাগ করিয়া সে চলিয়া যাইবে। তখন তাহার মনে কি হইতেছে বুঝা কঠিন। একমাত্র সেই জানে, অন্য কাহারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অন্তর্যামী হয়ত জানিতে পারেন। কিন্তু বালকের মুখ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল। মুখে বিষাদের রেখা মাত্র নাই, তাহার মন স্থির। মৃত্যুভয়ে তার মনে কোন বিকারের লক্ষণ নাই, হাড়িকাঠ, ঘাতক, শাণিত খড়্গ দেখিয়াও বিন্দুমাত্র ভীত হয় নাই। আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে তাহার মন মগ্ন কিনা কে বলিতে পারে। সাধারণ বালকের মধ্যে এই ভাব দেখা যায় না। বালকের প্রশান্ত বদনে কিঞ্চিৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাড়িকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ অতি উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল উপরি উপরি চারিবার হাসিল। তাহার অট্টহাস্যে চারিদিক্ মুখরিত হইল। মুখমণ্ডলে যেন একটা জ্যোতির প্রভা দেখা গেল। সকলে স্তম্ভিত হইল। মৃত্যু উপস্থিত জানিয়াও এরূপ অট্টহাস্য করিতে পারে ইহা অবিশ্বাস্য। মৃত্যুর ভয়ে ভীত নয় এমন কেহ পৃথিবীতে আছে বিশ্বাস করা যায় না, মৃত্যুর খবর শুনিলেই অনেকের শরীর অবশ হইয়া পড়ে। কারও কারও প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। জীবনে নির্ভিক হওয়া অত্যন্ত কঠিন। একমাত্র ভগবৎ দর্শনে মানুষ নির্ভিক হইতে পারে তার পূর্বে নয়। ভগবৎ দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য সত্য, কিন্তু উহা সুকঠিন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁহাকে লাভ করিয়া নির্ভিক হইতে পারে। তবে কি এই সুকোমল বালকের মধ্যে ভগবানের আবেশ হইয়াছে? তাঁহার কৃপাতেই বালক মরণজয়ী হইয়াছে? ময়ূরোল্লাস করিতেছে? বালকের অট্টহাস্য সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছে। সকলের চেয়ে বেশী আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন রাজা স্বয়ং। তিনি ভাবিলেন এরূপ দৃশ্য জীবনে কখনও দেখি নাই এরূপ ঘটনার কথাও কখন শুনি নাই। ঘাতকের উজ্জ্বল খড়্গ দেখিয়াও বালক ভীত নয়, বরং অট্টহাস্য করিয়া মরণকে তুচ্ছ করে। এই হাসি কি ভয়ের কিম্বা মৃত্যুকে জয় করার বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই ইহার কোন তাৎপর্য্য আছে।

তারপর বালককে সম্বোধন করিয়া রাজা বলিলেন, 'বালক, তোমার এই হাসির তাৎপর্য্য কি? ইহা কি ভয়ের কিম্বা নৈরাশ্যের! আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। ইহার তাৎপর্য্য জানিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, আমার কৌতূহল নিবারণ কর মনের বিষাদভাব দূর কর।'

বালক স্থির, শান্ত। তাহার মুখে ভয়ের কিম্বা নৈরাশ্যের কোন চিহ্ন নাই। তাহার প্রশান্ত বদন দেখিলে মনে হয় সে যেন এই বয়সেই বিজ্ঞ হইয়াছে। বালক বলিতে লাগিল 'মহারাজ, আপনি পূজ্য। আপনাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিতেছি। আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি, আমি মৃত্যুভয়ে ভীত নই। আমার হাসির অন্য তাৎপর্য্য আছে। পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত চারিটী আইনের বিধানই আমার হাসির কারণ। আপনি জানেন ভালবাসা হৃদয়ের মূল বৃত্তি। ইহার প্রভাব জীবনে অত্যন্ত বেশী। অন্তরের টান হইতে সমুদয় কর্মের প্রেরণা আসে। ভালবাসাই মানুষকে মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত করে, দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা যোগায়। ভগবানের পথে এগিয়ে দেয়। ভালবাসাই দুঃসাহসিকতার উৎস, চরিত্র নিরূপণের

মাপকাঠি, ভালবাসার স্পর্শে বিশ্ব নূতন রূপ ধারণ করে, জীবন সরল ও মধুময় হয়। ভালবাসার অভাবে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা মনে প্রবল হয়। যে ভালবাসা জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় বাস্তবক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনি জানেন সংসারে পিতামাতার চেয়ে আপন কেহ নাই। সর্বস্ব খোয়াইয়া এমন কি নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও তাঁহারা সন্তানকে পালন করেন। স্নেহ যারা পুষ্ট করেন, স্নেহ মমতা শুধু যে মানুষের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নয়। প্রাণ বিসর্জন দিয়াও পশুপক্ষী শাবকদের মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করে কিন্তু আমার অদৃষ্ট এমন যে আমি সেই ভালবাসার প্রভাব অনুভব করিবার সুযোগ পাইলাম না। আমি অতি গরীব গৃহস্থের ঘরে জন্ম নিয়াছি। অর্থের লোভে পিতা মাতা আমায় বিক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা লোভের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। স্নেহ মমতা তাঁহাদিগকে লোভের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। হৃদয়ের মূল বৃত্তি যে ভালবাসা তাহার যথাযথ প্রয়োগ তাঁহাদের কার্যে প্রকাশ পাওয়ার কথা সেখানে যদি উহার অভাব দেখা যায় তবে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। সংসারে ইহার চেয়ে আর কিছু আশ্চর্যের বিষয় হইতে পারে? আপনি হয়তো লক্ষ্য করিয়াছেন আমি চারবার অট্টহাস্য করিয়াছি। পিতামাতার আচরণ এবং ভালবাসার অপ্রয়োগ আমার প্রথমবারের হাসির কারণ। যখন মরিতেই হইবে তখন দুঃখ করিয়া লাভ কি। তার চেয়ে মরণোল্লাস করিয়া সংসার হইতে বিদায় নেওয়া ভাল।

বালক বলিতে লাগিল, মহারাজ আমার দ্বিতীয়বার হাসির ও তাৎপর্য আছে, দেশে ন্যায় বিচারের দুরবস্থা দেখিয়া সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, বিচারক যখন বিচার কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করিবেন, সকলে যাতে ন্যায় বিচার পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন, তাঁহার বিচারের উপর বাদী এবং বিবাদীর জীবন নির্ভর করে, পক্ষপাতিত্ব দোষ ন্যায়ের মূলে কুঠারাঘাত করে। বিচারক যদি পক্ষপাতিত্ব দোষ মুক্ত হন তবে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা পায়। নইলে অনেক নিরপরাধীর অমূল্য জীবন নষ্ট হয়। কিন্তু আমার বিষয় বিবেচনা করিবার ভার যখন তাঁহার হাতে গেল তিনি ন্যায়ের সম্মান রাখেন নাই, সম্ভবতঃ স্বার্থের বশবর্তী হইয়া তিনি যথাযথ কর্তব্য পালন করেন নাই, উপরিওয়ালাকে খুশী করিয়া আপনার চাকরী বজায় রাখিবার জন্যই হয়ত পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, দেবীর সম্মুখে বলি দিবার বিধান সমর্থন করিয়াছেন এবং ছাগলের বদলে প্রাণ নাশের অনুমতি দিয়াছেন; তিনি হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে প্রত্যেকেরই ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। ন্যায়দণ্ড রাজদণ্ডের উর্দ্ধে। ন্যায়ের বিধান ভগবানেরই বিধান যাহা ন্যায় তাহা সত্য। প্রয়োজন হইলে ন্যায়ের সম্মান রক্ষার্থে রাজারও প্রতিকূলাচরণ করা উচিত। সত্য ও ন্যায়কে ভালবাসা হৃদয়ের মূল বৃত্তি, বাস্তব জগতে বিচারের ক্ষেত্রেও ইহার অপপ্রয়োগ দেখিয়া অতি বিস্মিত হইয়াছি, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়।

বালক আরও বলিল, 'রাজন্, আমার তৃতীয়বারের হাসিরও তাৎপর্য আছে। আপনি রাজার কর্তব্য কি তাহা ভালভাবে জানেন, এই বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে অর্বাচীনতা প্রকাশ পায়, প্রজা-রঞ্জন করেন বলিয়াই রাজা আপদে বিপদে সকল সময়ে তিনি প্রজাদের রক্ষা করেন, তিনি সকলের আশ্রয়। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রজারা ধর্ম আচরণ করে, বিদ্যার্জন করে, সংসারে সুখলাভ করে। তিনি আইন শৃঙ্খলার রক্ষক, ধর্মের বাহক বিদ্যার উৎসাহদাতা, প্রজার পিতা, মাতা, আশ্রয়দাতা, পালক, মানুষ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, রাজাকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রদ্ধা করে। তিনি যদি প্রজাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হন তবেই প্রজারা তাঁহাকে পিতৃতুল্য মনে করে, আর যদি উদাসীন থাকেন তবে রাজার সম্মান দাবী করিতে পারেন

না, তাঁহার দায়িত্ব অনেক। কিন্তু আমার বেলায় দেখা গেল তিনি দায়িত্ব পালন করেন নাই সুবিচার দেখাইতে পারেন নাই, কর্ত্তব্য ভ্রষ্টের আচরণ দেখাইয়াছেন, তাঁহার আচরণ আমার মর্মে আঘাত করিয়াছে। আমি কি তাঁহার প্রজা নই? প্রজা হিসাবে আমি কি ন্যায় বিচারের আশা করিতে পারি না? আমাকে রক্ষা করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য নয়? আমি দরিদ্রের ঘরে জন্ম নিয়াছি বলিয়া কি আমার জীবনের কোন মূল্য নাই? ধনীর জীবনের যদি মূল্য থাকে তবে নির্ধনীরও জীবনের মূল্য থাকা উচিত। জীবন অমূল্য, ইহাতে ধনী নির্ধনীর প্রশ্ন আসে না। দারিদ্রাই কি আমার একমাত্র অপরাধ যাহার জন্য তিনি আমাকে জীবনের কিছুমাত্র মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বরং নিজের স্বার্থ এবং জীবন রক্ষার জন্য তিনি আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। পুরোহিতের অন্যায় বিধান সমর্থন করিয়াছেন, বিচারকের অন্যায় বিচারে প্রশ্রয় দিয়াছেন। ঘাতকের খড়্গে আমার প্রাণ দেওয়া অনুমোদন করিয়াছেন। আমাকে দেবীর সম্মুখে বলি দিলে তাঁহার কোপ নিবারিত হইবে ইহা তিনি কি করিয়া জানিলেন? এ বিষয়ে তিনি কি দেবীর নিকট হইতে কোন প্রকার আদেশ পাইয়াছেন? আমাকে বলি দিলে তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিবেন ইহারাই বা নিশ্চয়তা কোথায়? যদিও ধরিয়া নেওয়া যায় যে তিনি আপাততঃ স্বাস্থ্যলাভ করিবেন তাহা হইলেও প্রশ্ন আসে ঐ স্বাস্থ্য কি অটুট থাকিবে? তিনি কি অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিবেন? তিনি কি মনে করেন যম তাঁহাকে চিরকাল ভুলিয়া থাকিবেন? এই সব দেখিয়া মনে হয় তিনি দেহ সর্বস্ব, দেহের চেয়ে যে দেহীর মূল্য অধিক ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়?'

বালকের বলা শেষ হয় নাই। সে বলিতে লাগিল, 'মহারাজ, আমার চতুর্থ বারের হাসির তাৎপর্য্য আছে সকলেই জানে দেবী বিশ্বজননী সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাধকেরা তাঁহাকে শক্তিরূপে আরাধনা করেন। তিনিই ইষ্ট, তিনিই মাতা, তাঁহার আদি নাই, অন্তও নাই, তিনি সনাতনী, অনন্ত, সর্বব্যাপিনী, চৈতন্যময়ী, লীলাময়ী, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তাঁহার খেলা তিনি ত্রিগুণময়ী সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটি বিভিন্নরূপে তিনি অভিব্যক্ত, সমস্ত নাম ও রূপের ভিতর দিয়া তিনিই মূর্ত হইয়াছেন তিনি অন্তর্যামী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা সকলে তাঁহারই নির্দ্দেশে চলে, বিশ্ববাসী তাঁহার সন্তান, মাতার স্নেহ মমতাতেই সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তিনি কৃপা না করিলে সন্তান এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা। বিশ্ববাসী হিসাবে আমিও তাঁহার সন্তান। কৃতী সন্তান না হইতে পারি। অকৃতী হইলে কি আমাকে মায়ের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে? স্নেহ মমতা যাহা সন্তানের ন্যায্য প্রাপ্য সন্তান হিসাবে আমিও তাহার অংশীদার, কিন্তু কার্য্য কালে দেখি তিনি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু কেন? আমার কি অপরাধ? কি অপরাধে আমাকে তাঁহারই মন্দিরের সম্মুখে ঘাতকের খড়্গে প্রাণ দিতে হইবে? বিশ্বজননীর যদি এরূপ আচরণ তবে সাধারণ মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? কোথায় আশ্রয় পাইবে? তিনি কি আশ্রয় দিতে অপারগ কিম্বা অনিচ্ছুক? যদি তাহাই হয় তবে কি হিসাবে তিনি বিশ্বজননী! সন্তানের ক্ষেত্রেও যদি বিশ্বজননীর এরূপ আচরণ হয় কিম্বা স্নেহ ভালবাসার অপপ্রয়োগ হয় তবে কোথায় ইহার ন্যায্য প্রয়োগ হইবে? জগতের এই বিসদৃশ আচরণ দেখিয়া যদি সচকিত না হই তবে পরিণাম কোথায় কি আকার ধারণ করিবে তাহা বুঝিতে পারিনা। জগৎ কি তাহা বুঝিয়াছি, ইহা যে পরিণামী, বিনাশশীল এই বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ থাকিতে পারেনা। এক প্রান্তে জীবন অন্য প্রান্তে মৃত্যু দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী সীমিত এই মানব জীবন, সংসারে ন্যায় বিচার লোপ পাইয়াছে। হৃদয়ের মূল বৃত্তি ভালবাসা শুকাইয়া গিয়াছে। জীবনের রহস্য কি তাহা জানিয়াছি। অতি জীবনের সন্ধান জানিয়াছি।

সুতরাং দুঃখ করিয়া লাভ কি। তার চেয়ে সংসার হইতে যাইবার পূর্বে শেষ হাসি হাসিয়া যাই। আশা করি আমার অট্টহাসির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।"

বালকের কথা শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন, সারা জীবন অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়াছেন। বালকের কথায় তাঁহার পথের অন্ধকার ঘুচিয়া গেল, তিনি নূতন আলোর সন্ধান পাইলেন। তিনি জীবন রহস্য ভেদ করিলেন নূতন তত্ত্বের মর্ম বুঝিলেন, তিনি বুঝিলেন বালক মরণজয়ী বীর! মৃত্যুভয়কে পরাজিত করিবার সাহস রাখে, তাই তাহার পক্ষে মরণোল্লাস সম্ভব। তাঁহার মনে হইল বিশ্বজননী কৃপা করিয়া বালকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছেন এবং তাঁহাকে অন্ধকার হইতে আলোতে টানিয়া আনিয়াছেন।

ইহার পর ঘাতককে সম্বোধন করিয়া রাজা বলিলেন, 'বালকের বন্ধন খুলিয়া দাও, তাহার রক্তে দেবী মন্দির কলুষিত করিবার প্রয়োজন নাই।' পরে বালককে ডাকিয়া বলিলেন, 'বালক, আজ আমার জীবনে সাধনের শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে তোমারই মধ্য দিয়া দেবীর ইচ্ছা জানিলাম, বুঝিলাম দেবী সন্তানের রক্ত চান না, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে বলির প্রয়োজন নাই শ্রদ্ধা ভক্তিতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আজ তুমি আমায় নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছ তুমি ধন্য। তুমি মুক্ত। পিতামাতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর।'

অপ্রত্যাশিত উপায়ে বালকের প্রাণ রক্ষা পাইল। চারিদিকে যে হতাশার ছায়া দেখা দিয়েছিল তাহা দূরীভূত হইল, ইহার পরে বহু মূল্যবান উপহার দিয়া তাহাকে পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দিলে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে রাজা সম্পূর্ণরূপে—রোগ মুক্ত হইলেন। ইহা বালকের মধ্য দিয়া দেবীর প্রকাশ হইয়াছে কিম্বা দেবীর কৃপায় হইয়াছে কিম্বা কর্মফল ক্ষয় হইয়াছে কে বলিবে। পাঠক ইহা বি করিবেন। যদি দেবীর কৃপায় হইয়া থাকে তবে কর্মফল দাতা একজন আছেন ইহা সত্য তিনি অখ পরীয়সী, তাঁহার কৃপায় সব হইতে পারে। অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

২৬ বর্ষে

গল্প-ভারতী

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পঁচিশ বছরের পূর্বে শরৎমুখর আষাঢ়ের এমনি এক পুণ্যাহদিনে গল্প ভারতী তার যাত্রা সুরু করেছিল।
সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে বাংলা সাহিত্যে তার অনুপম সেবার ইতিহাস অবিস্মরণীয়।

এবার সে তার পূর্ব গৌরবকে আরও বেশি সমুজ্জ্বল করে এক অভিনব
সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

নববর্ষ (আষাঢ় '৭৭)

এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য :

রবীন্দ্র জীবনীকার
প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ
॥ ফিরে ফিরে চাই ॥

সর্বভারতীয় গল্প-লেখক
নিখিল মিত্রের
॥ একটি ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
॥ ধারাবাহিক উপন্যাস "বন্যাকন্যা" ॥

জেলখানার বিচিত্র কাহিনী
বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়ের
॥ আবার সেই জেল ॥

যে কাহিনী চিরকালের
॥ আনন্দ মঠ ॥
ডঃ হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়ের
বিশ্ব ভাষা থেকে অনূদিত বিচিত্র কাহিনী
॥ ফতুয়া ॥

শৈলজানন্দের
কাহিনী রসসমৃদ্ধ
॥ স্মৃতিকথা ॥

অপরূপ এক অলিখিত কাহিনী
॥ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ॥

প্রখ্যাত কথাশিল্পীদের বিভিন্ন স্বাদের ও রসের আটটি গল্প
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
॥ জীবন যেমন ॥

গল্প-ভারতীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

॥ মেয়েদের অঙ্গসজ্জা ॥
ও নানা রংয়ের ও রূপের বহু নতুন ফিচার, কার্টুন ইত্যাদি।
আষাঢ়ের মাঝামাঝি বেরুবে
মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই

২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৬ ফোন : ৪৪-৩২৯৪ এবং ৪৪-১৩৫৫

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

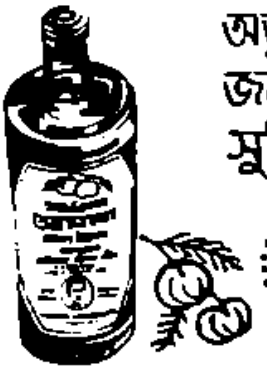

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল দৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্কতা রোধ করে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা কলিকাতা।

৬৮

SA-2/69

Regd. No. C3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

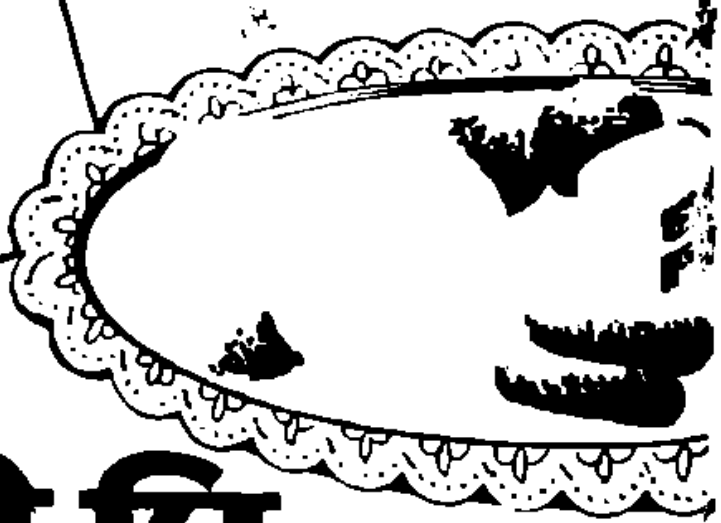

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

9 JUL 1970